জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ১৯৯৬ শিক্ষাবর্ষ
থেকে নবম-দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

মাধ্যমিক ভূগোল

নবম-দশম শ্রেণী

রচনা
ড. শামসুল আলম
কাজী আবদুর রউফ
সেলিনা শাহজাহান

সম্পাদনা
এম আমিনুল ইসলাম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯–৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রথম মুদ্রণ : মার্চ, ১৯৯৬
সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০০
পরিমার্জিত সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৮
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০০৯

কম্পিউটার কম্পোজ
লেজার স্ক্যান লিমিটেড

প্রচ্ছদ
সেলিম আহ্‌মেদ

মানচিত্রাঙ্কন
গ্রাফোসম্যান

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য।

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ কথা

শিক্ষার উন্নয়ন ব্যতীত জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারায় জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আর্থ–সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহ যাতে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিফলিত হয়, সেই লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়ন কমিটির সুপারিশক্রমে আশির দশকের প্রারম্ভে প্রবর্তিত হয় নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন পাঠ্যপুস্তক। দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এই পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রচলিত ছিল।

উন্নয়নের ধারায় ১৯৯৪ সালে নিম্ন মাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম সংস্কার, পরিমার্জন ও বাস্তবায়নের জন্য 'শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স' গঠিত হয়। ১৯৯৫ সালে নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সময়ের সাথে সাথে দেশ ও সমাজের চাহিদা পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ২০০০ সালে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের প্রায় সকল পাঠ্যপুস্তক উচ্চ পর্যায়ের বিশেষজ্ঞদের দ্বারা যৌক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে পুনরায় সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। ২০০৮ সালে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত শিক্ষাবিষয়ক টাস্কফোর্সের সুপারিশে প্রচ্ছদ প্রণয়ন, বানান ও তথ্যগত বিষয় সংশোধনসহ পাঠ্যপুস্তক আকর্ষণীয় করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে করে পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর নিকট আরো গ্রহণযোগ্য ও সময়োপযোগী বলে বিবেচিত হবে।

শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরো ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। প্রত্যাশা করা যায়, এতে শিক্ষার্থীর মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং শিক্ষার্থী তার অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে বা যে কোনো বিষয়কে বিচার–বিশ্লেষণ অথবা মূল্যায়ন করতে পারবে।

মাধ্যমিক স্তরের পরিমার্জিত ও নবায়নকৃত শিক্ষাক্রমে ভূগোল বিষয়ের মূল বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং শ্রেণীতে–শ্রেণীতে অপ্রয়োজনীয় পুনরাবৃত্তি পরিহার করে প্রতিটি স্তরের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে কিছু নতুন অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। এ বইটিতে ব্যবহারিক বিষয় চালু করার লক্ষ্যে মানচিত্র গঠন, পঠন ও ব্যবহারের সুযোগ রাখা হয়েছে। বিষয়বস্তু সহজ ও আকর্ষণীয় করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় চিত্র ও মানচিত্র সন্নিবেশ করা হয়েছে।

আমরা জানি, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। কাজেই পাঠ্যপুস্তকের আরো উন্নয়নের জন্য যে কোনো গঠনমূলক ও যুক্তিসংগত পরামর্শ গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হবে। ২০২১ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে প্রত্যাশিত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান সংস্করণে কিছু পরিমার্জন করা হয়েছে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে পরিমার্জিত পাঠ্যপুস্তকগুলো প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যেতে পারে। পরবর্তী সংস্করণে পাঠ্যপুস্তকগুলো আরো সুন্দর, শোভন ও ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

যাঁরা এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, যৌক্তিক মূল্যায়ন, সৃজনশীল প্রশ্ন প্রণয়ন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। যাদের জন্য পাঠ্যপুস্তকটি প্রণীত হল, আশা করি তারা উপকৃত হবে।

প্রফেসর মো: মোস্তফা কামালউদ্দিন
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

সূচিপত্র

অবতরণিকা

ভূগোল ও ভূগোল পাঠ

মানুষ ও পৃথিবী হল ভূগোলের প্রধান উপাদান। মানুষের আবাসভূমি হিসেবে পৃথিবীর বর্ণনাই ভূগোল। 'Geography' এর বাংলা প্রতিশব্দ 'ভূগোল'। প্রাচীন গ্রিস দেশীয় ভূগোলবিদ ইরাটসথেনিস 'Geography' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। 'Geo' শব্দের অর্থ পৃথিবী এবং 'graphy' শব্দের অর্থ বর্ণনা। সুতরাং পৃথিবীর বর্ণনা বা বিবরণ হল ভূগোল। রিচার্ড হার্টশোন ১৯৫৯ সালে তাঁর 'পারসপেকটিভস অন দ্য নেচার অব জিওগ্রাফি' গ্রন্থে বলেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের যথাযথ যুক্তিসংগত ও সুবিন্যস্ত বিবরণ প্রদানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয় হল ভূগোল। অধ্যাপক ম্যাকনি ১৯৬২ সালে বলেছেন যে, মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত ভৌত ও সামাজিক পরিবেশে মানুষের কর্মকাণ্ড ও জীবনধারা নিয়ে যে বিষয় আলোচনা করে তাই ভূগোল। অধ্যাপক ডাডলি স্টাম্প বলেছেন, পৃথিবীর ও এর অধিবাসীদের বর্ণনাই হল ভূগোল। আরো অনেকে বিভিন্ন আঙ্গিকে ভূগোলের সংজ্ঞা দিয়েছেন। উচ্চতর শ্রেণীতে তোমরা তা জানতে পারবে।

ভূগোল পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ভূগোল একটি পৃথক বিষয় হিসেবে মাধ্যমিক শ্রেণীতে পাঠদানের অন্যতম কারণ হচ্ছে যে প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে মানুষ এই পৃথিবীতে বাঁচতে পারে না। আর ভূগোল হল সব প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের জননী। পৃথিবীর কোন স্থানে কোথায় কোন পাহাড়, পর্বত, নদী, মরুভূমি, সমভূমি, মালভূমি অবস্থান করছে, এদের গঠনের কারণ এবং গঠন বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করতে হলে ভূগোল পাঠ করা প্রয়োজন।

ভূগোল শাস্ত্রটি এত ব্যাপক যে, শুধু প্রাকৃতিক বিষয় এর আওতায় পড়ে না। প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে কীভাবে মানুষের অর্থনৈতিক জীবন গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কেও ভূগোল আলোচনা করে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কৃষিকাজের পদ্ধতি ও শস্যের প্রকার, শিল্প, বাণিজ্যের অবস্থা, যানবাহনের সুয়োগ সুবিধা ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে হলে ভূগোল পাঠ করা প্রয়োজন। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যও ভূগোলের জ্ঞান প্রয়োজন। ভূগোলকে বিভিন্ন শাখায় ভাগ করা হয়েছে।

ভূগোলের বিভিন্ন শাখা হল :

১। প্রাকৃতিক ভূগোল (Physical geography)
২। অর্থনৈতিক ভূগোল (Economic geography)
৩। রাজনৈতিক ভূগোল (Political geography)
৪। গাণিতিক ভূগোল (Mathematical geography)
৫। মানবিক ভূগোল (Human geography)
৬। আঞ্চলিক ভূগোল (Regional geography)
৭। ঐতিহাসিক ভূগোল (Historical geography)
৮। উদ্ভিদ ভূগোল (Plant geography)
৯। প্রাণী ভূগোল (Zoo geography)

মাধ্যমিক স্তরে ভূগোলের যে তিনটি শাখা পড়ানো হয় তা হল– গাণিতিক ভূগোল, প্রাকৃতিক ভূগোল ও আঞ্চলিক ভূগোল। ভূগোলের এ তিনটি শাখা সম্বন্ধে যথাক্রমে বর্ণনা করা হল।

প্রথম খণ্ড

গাণিতিক ভূগোল

প্রথম অধ্যায়

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ও সৌরজগৎ

LUMINARIES AND SOLAR SYSTEM

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী

আমাদের বাসভূমি পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে রয়েছে অসীম আকাশ। আদি অন্তহীন এ আকাশকে মহাকাশ বলা হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু ও শক্তি যে অঞ্চলে ভাসমান অবস্থায় বিন্যস্ত তার নাম মহাকাশ। মহাকাশের শুরু বা শেষ নেই। মহাকাশে অসংখ্য জ্যোতিষ্ক রয়েছে। এই অসীম মহাকাশের দিকে তাকালে দিনে সূর্য এবং রাতে চাঁদসহ অসংখ্য আলোক বিন্দু চোখে পড়ে। এগুলো সুশৃঙ্খলভাবে নিজস্ব কক্ষপথে নির্দিষ্ট গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সূর্য একটি নক্ষত্র এবং চাঁদ একটি উপগ্রহ। এসব নক্ষত্র এবং এদের গ্রহ ও উপগ্রহকে জ্যোতিষ্ক বলে। কিন্তু বর্তমানে মহাকাশে অনেক বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, যারা কোনো আলো দেয় না। এ মহাকাশে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, ছায়াপথ, উল্কা ছাড়াও অনুজ্জ্বল নীহারিকা, পালসার, কৃষ্ণবামন (Black Dwarf), কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole) রয়েছে। এগুলোকে জ্যোতিষ্ক বলে। এসব জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নিয়ে মহাবিশ্ব গঠিত হয়েছে।

নক্ষত্র (Stars): রাত্রিবেলা মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে অনেক আলোক বিন্দু মিটমিট করে জ্বলতে দেখা যায়। এদের নক্ষত্র বলে (চিত্র ১)। খালি চোখে আমরা মাত্র কয়েক হাজার নক্ষত্র দেখতে পাই। পৃথিবী থেকে শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিজ্ঞানীগণ ১০০ কোটিরও অধিক নক্ষত্রের সন্ধান লাভ করেছেন। নক্ষত্রগুলো প্রকৃতপক্ষে জ্বলন্ত বাষ্পপিণ্ড। নক্ষত্রের নিজস্ব আলো ও উত্তাপ আছে।

পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয় নক্ষত্রগুলো যেন একই সমতলে অবস্থান করছে। পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলোর দূরত্ব আলোর গতির সাহায্যে পরিমাপ করা হয়। নক্ষত্র থেকে নক্ষত্র এবং পৃথিবী থেকে নক্ষত্রের দূরত্ব মাপতে যে একক ব্যবহার করা হয় তাকে আলোক বর্ষ বলে। সূর্য পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।

সূর্যের নিকটতম নক্ষত্র প্রক্সিমা সেন্টারাই (Proxima Centauri)। পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৩৮ লক্ষ কোটি কিলোমিটার। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে নক্ষত্র সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য জানা সম্ভব হয়েছে। কোনো কোনো নক্ষত্রের আকার গোল, কোনোটি সর্পিল বা রৈখিক, আবার কোনোটি অবয়বহীন।
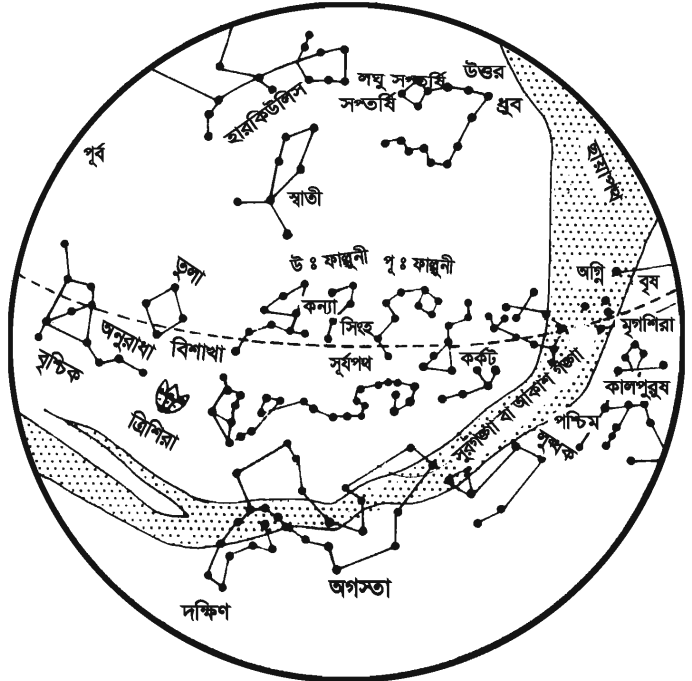
চিত্র ১ : বিভিন্ন নক্ষত্রের অবস্থান

কৃষ্ণগহ্বর ও কৃষ্ণবামনের ঘনত্ব খুব বেশি বলে এদের মহাকর্ষ বল অত্যন্ত বেশি।

নক্ষত্রমণ্ডলী (Constellation): মেঘমুক্ত অন্ধকার রাতে আকাশের দিকে তাকালে মনে হয় কতকগুলো নক্ষত্র মিলে জোট বেঁধেছে। এরূপ নক্ষত্র দলকে নক্ষত্রমণ্ডলী বলে। প্রাচীনকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এক একটি নক্ষত্র দলকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যুক্ত করে বিভিন্ন আকৃতি কল্পনা করে এগুলোর বিভিন্ন নাম দিয়েছেন। এর মধ্যে সপ্তর্ষিমণ্ডল (Great Bear), কালপুরুষ (Orion) বা আদমসুরত, ক্যাসিওপিয়া (Cassiopeia), লঘুসপ্তর্ষি (Little Bear), বৃহৎ কুক্কুরমণ্ডল (Canis Major), এরিডানাস (Eridanus) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

গ্যালাক্সি (Galaxy): মহাকাশে কোটি কোটি নক্ষত্র, ধূলিকণা এবং বিশাল বাষ্পকুণ্ড নিয়ে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর যে দল সৃষ্টি হয়েছে তাকে গ্যালাক্সি বা নক্ষত্র জগৎ বলে। মহাকাশে অসংখ্য গ্যালাক্সি রয়েছে। গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর ব্যাপক ব্যবধানে অবস্থিত। কোনো একটি গ্যালাক্সির ক্ষুদ্র অংশকে ছায়াপথ বলে।

ছায়াপথ (Milky Way): রাতের অন্ধকার আকাশে উত্তর–দক্ষিণে উজ্জ্বল দীপ্ত দীর্ঘপথের মতো যে তারকারাশি দেখা যায় তাকে ছায়াপথ বলে। একটি ছায়াপথ লক্ষ কোটি নক্ষত্রের সমষ্টি। বিজ্ঞানীরা একে বিরাট চক্রাকার মণ্ডল বলে অনুমান করেন। প্রকৃতপক্ষে ছায়াপথ গ্যালাক্সির একটি অংশবিশেষ। কোটি কোটি নক্ষত্রের মাঝে সূর্যও এই ছায়াপথে অবস্থান করছে।

নীহারিকা (Nebula): মহাকাশে স্বল্পালোকিত তারকারাজির আস্তরণকে নীহারিকা বলে। নীহারিকাসমূহ গ্যাসীয় পদার্থে পূর্ণ। এদের আকার বিচিত্র। এক একটি নীহারিকার মাঝে কোটি কোটি নক্ষত্র থাকতে পারে। এরা পৃথিবী থেকে কোটি কোটি আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত। ছায়াপথ নীহারিকার সমতলে অবস্থান করে।

উল্কা (Meteor): রাতের মেঘমুক্ত আকাশে অনেক সময় মনে হয় যেন নক্ষত্র ছুটে চলেছে বা কোনো নক্ষত্র যেন এই মাত্র খসে পড়ল। এই ঘটনাকে নক্ষত্রপতন বলে। এরা কিন্তু আসলে কোনো নক্ষত্র নয়, এগুলোকে উল্কা বলে। মহাশূন্যে অজস্র জড়পিণ্ড ভেসে বেড়ায়। এই জড়পিণ্ডগুলো মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ বলের আকর্ষণে প্রচণ্ড গতিতে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসে। বায়ুর সংস্পর্শে এসে বায়ুর সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এরা জ্বলে ওঠে। উল্কাকে ইংরেজিতে মেটিওর (Meteor) বা ছুটন্ত তারা বলে। বেশিরভাগ উল্কাপিণ্ডই আকারে বেশ ক্ষুদ্র।

ধূমকেতু (Comet): মহাকাশে মাঝে মাঝে একপ্রকার জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে। এসব জ্যোতিষ্ক কিছু দিনের জন্য উদয় হয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। এসব জ্যোতিষ্ককে ধূমকেতু বলা হয়। ধূমকেতুর ইংরেজি নাম কমেট (Comet)। এটি গ্রিক শব্দ komet থেকে এসেছে। এর অর্থ হল এলোকেশী। ধূমকেতু আকাশের এক অতি বিস্ময়কর জ্যোতিষ্ক। নক্ষত্রের চারদিকে দীর্ঘপথে এগুলো পরিক্রমণ করে। সূর্যের নিকটবর্তী হলে প্রথমে অস্পষ্ট মেঘের আকারে দেখা যায়। ক্রমশ এগুলোর উজ্জ্বল কেন্দ্রবিন্দু এবং কুয়াশার আবরণে আচ্ছাদিত কেশের ন্যায় বস্তু দৃষ্টিগোচর হয়। এই কেন্দ্র থেকে বের হয়ে আসে উজ্জ্বল ঝাঁটার ন্যায় দীর্ঘ বাষ্পময় পুচ্ছ। জ্যোতির্বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি লক্ষ করেন মহাকাশে ধূমকেতু অভিকর্ষের নিয়ম মেনে চলে। তিনি যে ধূমকেতু আবিষ্কার করেন তা হ্যালির ধূমকেতু নামে পরিচিত। হ্যালির ধূমকেতু প্রায় ৭৫ বছর পরপর দেখা যায়। ১৭৫৯, ১৮৩৫, ১৯১০ ও ১৯৮৬ সালে হ্যালির ধূমকেতু দেখা গেছে।

গ্রহ (Planet): মহাকর্ষ বলের প্রভাবে মহাকাশে কতকগুলো জ্যোতিষ্ক সূর্যের চারদিকে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে পরিক্রমণ করে। এদের নিজেদের কোনো আলো বা তাপ নেই। এরা সূর্য থেকে আলো ও তাপ পায়। এই তাপেই উত্তপ্ত হয়। এরা তারার মতো মিটমিট করে জ্বলে না। এসব জ্যোতিষ্ককে গ্রহ বলে। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো আমাদের সৌরজগতের নয়টি গ্রহ।

উপগ্রহ (Satellite): মহাকর্ষ বলের প্রভাবে কিছু কিছু জ্যোতিষ্ক গ্রহকে ঘিরে আবর্তিত হয়। এদের উপগ্রহ বলে। এদের নিজস্ব আলো ও তাপ নেই। এরা সূর্য বা নক্ষত্র থেকে আলো ও তাপ পায়। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। সব গ্রহের উপগ্রহ নাও থাকতে পারে। বুধ ও শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই। শনির উপগ্রহ সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি।

সৌরজগৎ

পৃথিবীর চারদিকে অসীম মহাকাশ বিস্তৃত। এই মহাকাশ এত বিশাল যে আমাদের পক্ষে এর সম্পর্কে ধারণা করা বেশ কষ্টসাধ্য। মহাকাশে রয়েছে নক্ষত্র, ধূমকেতু, গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা ও অন্যান্য জ্যোতিষ্ক। মহাকাশের এই অসংখ্য জ্যোতিষ্ক নিয়ে যে জগতের সৃষ্টি হয়েছে তাকে বিশ্বজগৎ বলা হয়। সূর্য এই বিশ্বজগতের একটি নক্ষত্র। সূর্য এবং এর গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, অসংখ্য ধূমকেতু ও অগণিত উল্কা নিয়ে সৌরজগৎ বা সৌরপরিবার গঠিত হয়েছে (চিত্র ২)। সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। সৌরজগতের সকল গ্রহ ও উপগ্রহের নিয়ন্ত্রক হল সূর্য। গ্রহ ও উপগ্রহসমূহ সূর্য এবং নিজেদের পারস্পরিক মহাকর্ষণ শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পথে সূর্যের চারদিকে পরিক্রমণ করছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালতার মধ্যে সৌরজগৎ নিতান্তই ছোট। পৃথিবী আরো ক্ষুদ্র। আয়তনে সৌরজগৎ পৃথিবী থেকে কোটি কোটি গুণ বড়।
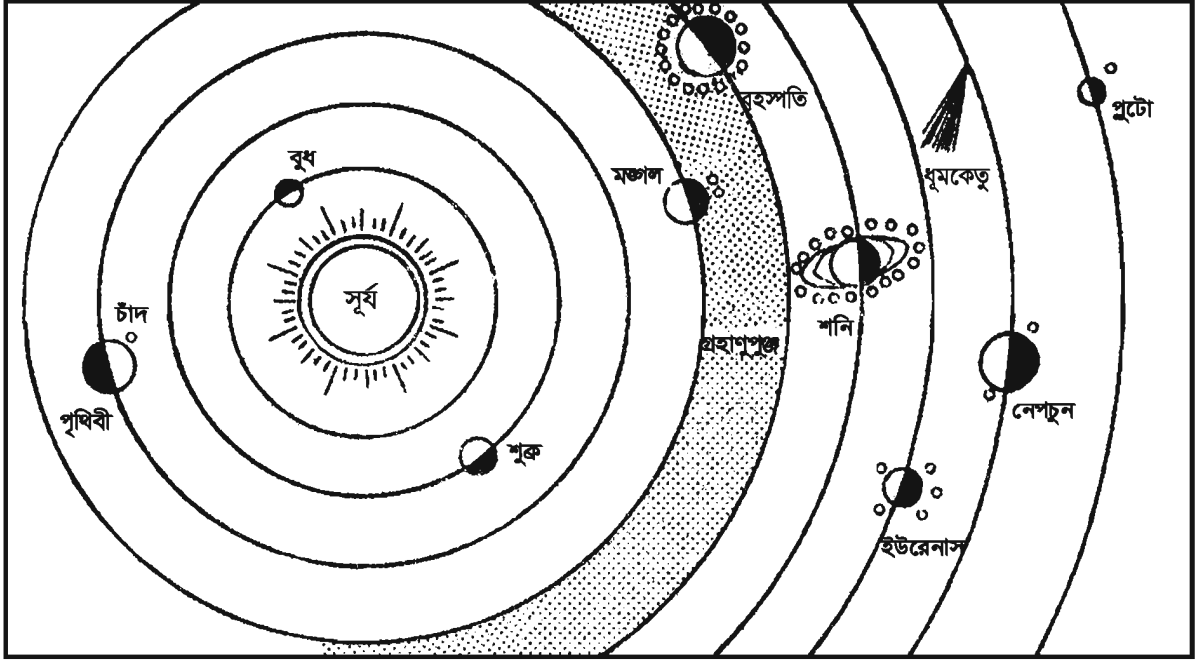
চিত্র ২ : সৌরজগৎ

সূর্য (Sun): সৌরজগতের কেন্দ্রীয় বস্তুপিণ্ড সূর্য একটি নক্ষত্র। 'ছায়াপথ' নামক নীহারিকাটির কোটি কোটি নক্ষত্রের মধ্যে একটি মাঝারি আকারের হলুদ বর্ণের নক্ষত্র হল সূর্য। সূর্যের ব্যাস প্রায় ১৩ লক্ষ ৮৪ হাজার কিলোমিটার এবং ভর (Mass) প্রায় ১.৯৯ X ১০^{৩৩} কিলোগ্রাম। সৌরজগতের সমস্ত জ্যোতিষ্কের মধ্যে সূর্যের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সূর্যের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সূর্য প্রচণ্ড রকম উত্তপ্ত এক নক্ষত্র। এর কেন্দ্রভাগের উত্তাপ প্রায় ১৫০,০০০,০০০° সেলসিয়াস এবং পৃষ্ঠভাগের তাপ আনুমানিক ৬,০০০° সেলসিয়াস। সূর্য শুধু আমাদের পৃথিবীরই নয়, অন্যান্য গ্রহ ও উপগ্রহেরও তাপ ও আলোর মূল উৎস। সূর্যের আলো ছাড়া পৃথিবী চিরঅন্ধকার থাকত। পৃথিবীতে প্রাণের স্পন্দন থাকত না এবং জীবজগৎ, উদ্ভিদ ও প্রাণী কিছুই বাঁচত না।

সূর্য থেকে সৌরজগতের গ্রহগুলোর দূরত্ব অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে অবস্থান করছে বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter), শনি (Saturn), ইউরেনাস (Uranus), নেপচুন (Neptune) এবং প্লুটো (Pluto)। গ্রহগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রহ হচ্ছে বৃহস্পতি এবং সবচেয়ে ছোট গ্রহ বুধ।

সূর্য থেকে দূরত্ব অনুযায়ী গ্রহগুলো যেভাবে সাজানো রয়েছে সেগুলোর বর্ণনা নিচে দেওয়া হল।

বুধ (Mercury): বুধ সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম গ্রহ। এ গ্রহ সূর্যের সবচেয়ে নিকটে অবস্থিত। সূর্য থেকে এর গড় দূরত্ব ৫.৮ কোটি কিলোমিটার; এর ব্যাস ৪,৮৫০ কিলোমিটার। সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে আসতে বুধের সময়

লাগে ৮৮ দিন। সুতরাং বুধ গ্রহে ৮৮ দিনে এক বছর হয়। নিজ অক্ষের চারদিকে আবর্তন করতে বুধের সময় লাগে ৫৮ দিন ১৭ ঘণ্টা। সুতরাং বুধের একদিন আমাদের ৫৮ দিন ১৭ ঘণ্টার সমান। সূর্যের খুব কাছের গ্রহ বুধের তাপমাত্রা খুব বেশি। এ তাপে সীসা ও দস্তার মতো ধাতু গলে বাষ্প হয়ে যায়। বুধে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই। নেই মেঘ, বৃষ্টি, বাতাস, পানি। এ গ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। ১৯৭৪ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রেরিত মহাশূন্যযান মেরিনার–১০ বুধের যে ছবি পাঠায় তা থেকে দেখা যায় যে, বুধের উপরিতল একদম চাঁদের মতো। ভূত্বক অসংখ্য গর্তে ভরা ও এবড়ো–থেবড়ো। এখানে আছে অসংখ্য পাহাড় ও সমতল ভূমি। বুধের কোনো উপগ্রহ নেই।

শুক্র (Venus): শুকতারা ও সন্ধ্যাতারার কথা তোমরা শুনে থাকবে। অনেকে দেখেও থাকবে। শুকতারা বা সন্ধ্যাতারা আসলে কোনো তারা নয়। শুক্র গ্রহই ভোরের আকাশে শুকতারা এবং সন্ধ্যার আকাশে সন্ধ্যাতারা। নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে বলেই আমরা একে ভুল করে তারা বলি। শুক্র গ্রহটি ঘন মেঘের অন্তরালে ঢাকা। তাই এর উপরিভাগ থেকে সূর্যকে কখনই দেখা যায় না। সূর্য থেকে শুক্র গ্রহের দূরত্ব ১০.৮ কোটি কিলোমিটার। শুক্র পৃথিবীর নিকটতম গ্রহ। পৃথিবী থেকে শুক্র ৪.৩ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শুক্রে দিন ও রাতের মধ্যে আলোর বিশেষ কোনো তারতম্য হয় না। শুক্রের ঘন মেঘ প্রধানত কার্বন ডাইঅক্সাইডের মেঘ। এখানে এসিড বৃষ্টি হয়। শুক্রের ব্যাস ১২,১০৪ কিলোমিটার। সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করতে শুক্রের সময় লাগে ২২৫ দিন। সুতরাং শুক্রে ২২৫ দিনে এক বছর। শুক্র গ্রহ তার নিজ অক্ষে খুবই ধীর গতিতে ঘোরে। শুক্র গ্রহের আকাশে বছরে সূর্য ওঠে দুই বার এবং অস্ত যায় দুই বার। শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই।

পৃথিবী (Earth): আমাদের পৃথিবী সূর্যের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ। সূর্য থেকে পৃথিবীর গড় দূরত্ব ১৫ কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস প্রায় ১২,৬৬৭ কিলোমিটার। পৃথিবীর নিজ অক্ষে এক বার আবর্তন করতে সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। পৃথিবী এক বার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। তাই এখানে ৩৬৫ দিনে এক বছর। চাঁদ পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। পৃথিবী একমাত্র গ্রহ যার বায়ুমণ্ডলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও তাপমাত্রা রয়েছে যা উদ্ভিদ ও জীবজন্তু বসবাসের উপযোগী। এ জন্য পৃথিবীকে সৌরজগতের গুরুত্বপূর্ণ গ্রহ বলা হয়।

মঙ্গল (Mars): সৌরজগতে পৃথিবীর পরেই মঙ্গল গ্রহের কক্ষপথ। এর ব্যাস ৬,৭৮৭ কিলোমিটার, পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় অর্ধেক। সূর্য থেকে এ গ্রহের গড় দূরত্ব ২২.৮ কোটি কিলোমিটার এবং পৃথিবী থেকে মঙ্গল গ্রহের দূরত্ব ৭.৭ কোটি কিলোমিটার। মঙ্গল গ্রহের দুইটি উপগ্রহ রয়েছে। একটির নাম ফোবোস (Phobos) এবং অপরটির নাম ডিমোস (Deimos)। এই গ্রহে দিনরাত্রির পরিমাণ পৃথিবীর প্রায় সমান। সূর্যের চারদিকে এক বার ঘুরতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন আর মঙ্গলের সময় লাগে ৬৮৭ দিন। নিজ অক্ষে এক বার পাক খেতে মঙ্গল গ্রহের সময় লাগে ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট। মঙ্গল গ্রহের উপরিভাগে রয়েছে গিরিখাত ও আগ্নেয়গিরি। এ গ্রহে অক্সিজেন ও পানির পরিমাণ খুবই কম এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ এত বেশি (শতকরা ৯৯ ভাগ) যে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় অক্সিজেনের সংস্পর্শে এ গ্রহের পাথরগুলো মরচে পড়ে গেছে, তাই মঙ্গল গ্রহ লালচে দেখায়।

গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids): মঙ্গল গ্রহের পর ৫৬.৩১ কোটি কিলোমিটারের মধ্যে কোনো গ্রহ নেই। এই বিস্তীর্ণ মহাশূন্যে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক রয়েছে। ১.৬ কিলোমিটার থেকে ৮০৫ কিলোমিটার ব্যাস সম্পন্ন এসব জ্যোতিষ্ককে গ্রহাণু বলে। বিজ্ঞানীগণ এরূপ সহস্রাধিক গ্রহাণুর কক্ষপথ সুনির্দিষ্ট করেছেন। দলবদ্ধ অবস্থায় রয়েছে বলে এগুলোকে একত্রিতভাবে গ্রহাণুপুঞ্জ বলে।

বৃহস্পতি (Jupiter): বৃহস্পতি সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বলে একে গ্রহরাজ বলা হয়। এর ব্যাস ১,৪২,৮০০ কিলোমিটার। আয়তনে পৃথিবীর চেয়ে প্রায় ১,৩০০ গুণ বড়। বৃহস্পতির ওজন সৌরজগতের অন্য সব গ্রহের ওজনের দ্বিগুণ। এটি সূর্য থেকে প্রায় ৭৭.৮ কোটি কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে। বৃহস্পতির বায়ুমণ্ডলের উপরিভাগের তাপমাত্রা খুবই কম এবং অভ্যন্তরের তাপমাত্রা অধিক। এ গ্রহের গড় উষ্ণতা ১২৫° সেলসিয়াস। সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করতে বৃহস্পতির সময় লাগে প্রায় ১২ বছর। কিন্তু নিজ অক্ষে এক বার আবর্তন করতে সময় লাগে মাত্র ৯ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট। সুতরাং পৃথিবীর একদিনে এখানে দুই বার সূর্য ওঠে, দুই বার অস্ত যায়। এ পর্যন্ত বৃহস্পতির ষোলটি উপগ্রহের

সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলোর মধ্যে লো. ইউরোপা, গ্যানিমেড ও ক্যালিস্টো প্রধান। বৃহস্পতির গভীর বায়ুমণ্ডল আছে বলে বিজ্ঞানীগণ মনে করেন।

শনি (Saturn): শনি সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ১৪৩ কোটি কিলোমিটার। এটি গ্যাসের তৈরি বিশাল এক গোলক। এর ব্যাস ১,২০,০০০ কিলোমিটার। শনি গ্রহের আয়তন পৃথিবীর প্রায় ৭৬০ গুণ বেশি। সূর্যের চারদিকে এক বার ঘুরতে শনির সময় লাগে ২৯ বছর ৫ মাস। কিন্তু নিজ অক্ষে প্রতি ১০ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে এক বার আবর্তন করে। শনিকে ঘিরে রয়েছে হাজার হাজার বলয়। এ বলয়ের এক একটা এক এক রঙের। শনির বাইশটি উপগ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে। সবগুলো শনির বলয়ের বাইরে। এদের মধ্যে টাইটান, হুয়া, ডাইওন, ক্যাপিটাস ও টেথ্রিস প্রধান। শনির ভূত্বক বরফে ঢাকা। এর বায়ুমণ্ডলে আছে হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের মিশ্রণ, মিথেন ও অ্যামোনিয়া গ্যাস।

ইউরেনাস (Uranus): ইউরেনাস সৌরজগতের তৃতীয় বৃহত্তম গ্রহ। সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে এ গ্রহের স্থান সপ্তম। এ গ্রহটি সূর্য থেকে ২৮৭ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছে। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে এ গ্রহের সময় লাগে ৮৪ বছর। নিজ অক্ষে আবর্তন করতে সময় নেয় ১০ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট। এ গ্রহের গড় ব্যাস প্রায় ৪৯,০০০ কিলোমিটার। এ গ্রহটি হালকা পদার্থ দিয়ে গঠিত বলে এর ওজন অত্যন্ত কম। আবহমণ্ডলে মিথেন গ্যাসের পরিমাণ অধিক। এ গ্রহের গড় উষ্ণতা ১৭০° সেলসিয়াস। সাম্প্রতিককালে শনির মতো ইউরেনাসেরও কয়েকটি বলয় আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে শনির বলয়ের ন্যায় এ বলয়গুলো উজ্জ্বল নয়। মিরিন্ডা, এরিয়েল, আম্ব্রিয়েল, টাইটানিয়া ও ওবেরন নামে ইউরেনাসের পাঁচটি উপগ্রহ আছে।

নেপচুন (Neptune): সূর্য থেকে দূরত্ব অনুসারে নেপচুনের স্থান অষ্টম। সূর্য থেকে এর দূরত্ব প্রায় ৪৫০ কোটি কিলোমিটার। এখানে সূর্যের আলো ও তাপ খুব কম। এ গ্রহ আয়তনে প্রায় ৭২টি পৃথিবীর সমান এবং ওজনে ১৭টি পৃথিবীর ওজনের সমান। এর ব্যাস ৪৮,৪০০ কিলোমিটার। মিথেন, অ্যামোনিয়া ও অন্যান্য গ্যাসের সমন্বয়ে এর বায়ুমণ্ডল গঠিত। ১৮৪৬ সালে এ গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়। এর দুইটি উপগ্রহ হচ্ছে ট্রাইটন ও নেরাইড। এ ছাড়া এ গ্রহের দুইটি বলয় আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্লুটো (Pluto): সূর্যের নবম গ্রহ প্লুটো। এর অবস্থান সূর্য থেকে সবচেয়ে দূরে। এ গ্রহ সূর্যের তাপ ও আলো খুব কম পায়। সূর্য থেকে এর দূরত্ব ৫৯১ কোটি কিলোমিটার। এর ব্যাস ৫,৯১০ কিলোমিটার। এ গ্রহ পাথরের তৈরি। এ গ্রহকে পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখা যায় না। সূর্যের চারদিকে এক বার ঘুরে আসতে প্লুটোর সময় লাগে ২৪৮ বছরের কিছু বেশি। প্লুটোর কক্ষপথ অত্যন্ত হেলানো। ১৯৩০ সালে লোয়েল মান মন্দিরের জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইড টমবাউ প্লুটো আবিষ্কার করেন। এর একটি উপগ্রহ রয়েছে যার নাম ক্যারন (Charon)।

জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ও সৌরজগৎ

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

জ্যোতিষ্ক: অসীম মহাকাশে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, ধূমকেতু, ছায়াপথ, উল্কা, পালসার, কৃষ্ণবামন (Black Dwarf), কৃষ্ণগহ্বর (Black Hole) ইত্যাদিকে বলা হয় জ্যোতিষ্ক।

নক্ষত্র: রাত্রিবেলা মেঘমুক্ত আকাশের দিকে তাকালে অনেক আলোক বিন্দু মিটমিট করে জ্বলতে দেখা যায়। এদের নক্ষত্র বলে।

ছায়াপথ: রাতের অন্ধকার আকাশে উত্তর–দক্ষিণে উজ্জ্বল দীপ্ত দীর্ঘপথের মতো যে তারকারাশি দেখা যায় তাকে ছায়াপথ বলে।

নীহারিকা: মহাকাশে স্বল্পালোকিত তারকারাজির আস্তরণকে নীহারিকা বলে।

ধূমকেতু: মহাকাশে মাঝে মাঝে একপ্রকার জ্যোতিষ্কের কিছু দিনের জন্য আবির্ভাব ঘটে। এসব জ্যোতিষ্ক কিছু দিনের জন্য উদয় হয়ে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। এসব জ্যোতিষ্ককে ধূমকেতু বলে। হ্যালির ধূমকেতু প্রায় ৭৫ বছর পরপর দেখা যায়।

গ্রহ: যেসব জ্যোতিষ্কের আলো বা তাপ নেই এবং যারা সূর্যের চারদিকে ঘোরে তাদের বলা হয় গ্রহ। পৃথিবী, বুধ, শনি ইত্যাদি গ্রহ।

উপগ্রহ: যে জ্যোতিষ্ক গ্রহের চারদিকে ঘোরে তাকে বলা হয় উপগ্রহ। চাঁদ, পৃথিবীর একট উপগ্রহ।

সৌরজগৎ: সূর্য এবং এর গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু, উল্কা নিয়ে সূর্যের যে পরিবার তাকে বলা হয় সৌরজগৎ। সৌরজগতের নয়টি গ্রহ। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো সৌরজগতের গ্রহ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সূর্য এবং এর গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ, ধূমকেতু ও উল্কা নিয়ে একত্রে গঠিত–

ক. বিশ্বজগৎ   খ. সৌরজগৎ

গ. জ্যোতিষ্কমণ্ডলী   ঘ. নক্ষত্রমণ্ডলী

২। কেন একমাত্র পৃথিবীই উদ্ভিদ ও জীবজন্তু বসবাসের উপযোগী?

i. বায়ুমণ্ডলে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আছে

ii. বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের তুলনায় নাইট্রোজেন বেশি

iii. পৃথিবীর সবুজ উদ্ভিদ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ত্যাগ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i   খ. ii

গ. iii   ঘ. i, ii এবং iii

নিম্নের প্রদত্ত সারণিটি পর্যবেক্ষণ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

গ্রহসমূহ	সূর্যকে প্রদক্ষিণকাল	নিকটতম গ্রহ দুইটির প্রদক্ষিণকালের পার্থক্য	গ্রহের ব্যাস (কিলোমিটার)
বুধ	৮৮ দিন	–	৪,৮৫০
শুক্র	২২৫ দিন	১১৭ দিন	১২,১০৪
পৃথিবী	৩৬৫ দিন	১৪০ দিন	১২,৬৬৭
মঙ্গল	৬৮৭ দিন	৩২২ দিন	৬,৭৮৭
বৃহস্পতি	১২ বছর	?	১,৪২,৮০০

৩। কোন গ্রহটি আকৃতিতে মধ্যম?

ক. বুধ   খ. পৃথিবী

গ. মঙ্গল   ঘ. শুক্র

৪। **মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের আবর্তনকালের পার্থক্য কত দিন?**

ক. ২,৬৯৩ খ. ৩,৬৯৩

গ. ৪,৬৯৩ ঘ. ৫,৬৯৩

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দিপ্তির মহাকাশ সম্পর্কে অধীর আগ্রহের কারণে নানু তাকে বললেন, মহাকাশ এক বিশাল জগৎ। এই জগতে আছে অনেক নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, উল্কা, নীহারিকা। সূর্যকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে অনেক গ্রহ, উপগ্রহ। এ সমস্ত গ্রহের মধ্যে পৃথিবীতে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বসবাস উপযোগী পরিবেশ বিরাজ করছে।

ক. বলয় দ্বারা বেষ্টিত গ্রহটির নাম কী?

খ. সূর্যকে ঘিরে চতুর্থ গ্রহটিতে প্রাণীর অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয় কেন?

গ. সৌরজগতের চিত্র অঙ্কন করে পৃথিবী এবং এর নিকটবর্তী দুইটি গ্রহ চিহ্নিত কর।

ঘ. 'পৃথিবীই একমাত্র গ্রহ যা প্রাণী ও উদ্ভিদকুলের জন্য বাসযোগ্য'– বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা

LATITUDE AND LONGITUDE

পৃথিবীর মানচিত্রে কোনো স্থান নির্ণয়ের জন্য পূর্ব–পশ্চিমে এবং উত্তর–দক্ষিণে কতকগুলো কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করা হয়। এগুলোকে যথাক্রমে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা বলে। অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা ভূগোলের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কোনো স্থানের অবস্থান অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে জানা যায়। দ্রাঘিমার অবস্থান থেকে কোনো স্থানের সময় জানা যায়। অক্ষরেখার সাহায্যে যেমন নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে অবস্থান জানা যায়, তেমনি মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে অবস্থান জানার জন্য মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমারেখা ব্যবহার করা হয়। অক্ষরেখার অংশকে অক্ষাংশ এবং দ্রাঘিমারেখার অংশকে দ্রাঘিমা বলে।

অক্ষাংশ : অক্ষাংশ কাকে বলে তা জানতে হলে প্রথমে আমাদের জানতে হবে পৃথিবীর মেরুরেখা বা অক্ষ এবং নিরক্ষরেখা ও সমাক্ষরেখা কাকে বলে। পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে উত্তর–দক্ষিণে কল্পিত রেখাকে অক্ষ (Axis) বা মেরুরেখা বলে। এ অক্ষের উত্তর–প্রান্ত বিন্দুকে উত্তর মেরু বা সুমেরু এবং দক্ষিণ–প্রান্ত বিন্দুকে দক্ষিণ মেরু বা কুমেরু বলে। দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব–পশ্চিমে বেষ্টন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এ রেখাকে বলা হয় নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা। পৃথিবীর গোলীয় আকৃতির জন্য এ রেখা বৃত্তাকার, তাই এ রেখাকে নিরক্ষবৃত্তও বলা হয়।

চিত্র ৩ : নিরক্ষরেখা থেকে কৌণিক দূরত্ব

নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুই ভাগে ভাগ করেছে। নিরক্ষরেখার উত্তর দিকের পৃথিবীর অর্ধেককে উত্তর গোলার্ধ এবং নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিকের পৃথিবীর অর্ধেককে দক্ষিণ গোলার্ধ বলা হয়।

নিরক্ষরেখার সাহায্যে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধের কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্ব স্থির করা হয়। এ জন্য পৃথিবীপৃষ্ঠে যে স্থানের কৌণিক দূরত্ব বের করতে হবে তার কোনো বিন্দুকে একটি কাল্পনিক রেখার সাহায্যে পৃথিবীর কেন্দ্রের সঙ্গে যোগ করা হয়। আবার পৃথিবীপৃষ্ঠের ঐ বিন্দুর ওপর দিয়ে প্রসারিত মধ্যরেখা যে স্থানে নিরক্ষরেখাকে ছেদ করে সেই ছেদ বিন্দুটিকে একটি কাল্পনিক সরলরেখার সাহায্যে পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে যোগ করা হয় (চিত্র ৩)।

চিত্র ৪ : নিরক্ষীয় তল, উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর অবস্থান

এ কাল্পনিক রেখা আসলে পৃথিবী গোলকের ব্যাসার্ধ। এ দুই রেখার সাহায্যে পৃথিবীর কেন্দ্রে যে কোণ উৎপন্ন হয় সে কোণই হল ঐ নির্দিষ্ট স্থানটির অক্ষাংশ। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে অবস্থিত কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে (Angular Distance) সেই স্থানের অক্ষাংশ বলে। ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থান থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত যদি কোনো সরলরেখা টানা যায় তা হলে ঐ রেখা নিরক্ষীয় তলের সঙ্গে যে কোণ তৈরি করবে সেই কোণই হবে ঐ স্থানের অক্ষাংশ (চিত্র ৪)। অর্থাৎ ক খ গ হল ক

বিন্দুর অক্ষাংশ। নিরক্ষরেখার উত্তর দিকে অবস্থিত কোনো স্থানের অক্ষাংশকে উত্তর অক্ষাংশ এবং দক্ষিণ দিকে অবস্থিত কোনো স্থানের অক্ষাংশকে দক্ষিণ অক্ষাংশ বলে। পৃথিবীর বৃত্তের কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণ ৩৬০°। এ কোণকে ডিগ্রি (°), মিনিট (′) ও সেকেন্ডে (″) বিভক্ত করা হয়। নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ ০°, উত্তর মেরু বা সুমেরুর অক্ষাংশ ৯০° উত্তর এবং দক্ষিণ মেরু বা কুমেরুর অক্ষাংশ ৯০° দক্ষিণ। কারণ নিরক্ষরেখা থেকে প্রত্যেক মেরুর কৌণিক দূরত্ব ৯০°। এ কোণকে ডিগ্রি ও মিনিটে ভাগ করে নিরক্ষরেখার সমান্তরাল যে রেখা কল্পনা করা হয় তাকে সমাক্ষরেখা বলে। এ সমাক্ষরেখাগুলো পরস্পর সমান্তরাল, প্রত্যেকে একটি পূর্ণবৃত্ত ও অক্ষাংশ বাড়লে সমাক্ষরেখার পরিধি কমে। কয়েকটি সমাক্ষরেখা বা অক্ষরেখা বিখ্যাত। এদের একটি ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ, একে বলা হয় কর্কটক্রান্তি। অপরটি ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ, একে বলা হয় মকরক্রান্তি। ৬৬.৫° উত্তর অক্ষাংশকে বলা হয় সুমেরুবৃত্ত এবং ৬৬.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশকে বলা হয় কুমেরুবৃত্ত (চিত্র ৫)। বিষুবরেখাকে বলা হয় মহাবৃত্ত।

কোনো অক্ষরেখার ওপর অবস্থিত সব স্থানের অক্ষাংশ সমান।

নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী অঞ্চলের অক্ষাংশকে অর্থাৎ ০° থেকে ৩০° পর্যন্ত অক্ষাংশকে নিম্ন অক্ষাংশ, ৩০° থেকে ৬০° পর্যন্ত অক্ষাংশকে মধ্য অক্ষাংশ এবং ৬০° থেকে ৯০° পর্যন্ত অক্ষাংশকে উচ্চ অক্ষাংশ বলে।

চিত্র ৫ : অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা

অক্ষাংশ নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। নিচে দুইটি পদ্ধতি বর্ণনা করা হল।
(ক) ধ্রুবতারার সাহায্যে।
(খ) সেক্সট্যান্ট যন্ত্র ও সূর্যের অবস্থান থেকে।

ধ্রুবতারার সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয়: আমরা জানি আমাদের পৃথিবী দুইটি গোলার্ধে বিভক্ত। উত্তর গোলার্ধ ও দক্ষিণ গোলার্ধ। প্রতি রাতে উত্তর গোলার্ধের যে কোনো স্থান থেকে উত্তর আকাশে একটি নির্দিষ্ট স্থানে ধ্রুবতারাকে দেখা যায়। কিন্তু উত্তর গোলার্ধের সব জায়গা থেকে ধ্রুবতারাকে আকাশে দিগন্ত থেকে সমান উচ্চতায় দেখা যায় না। স্থানভেদে এ উচ্চতার পার্থক্য ঘটে অর্থাৎ বিভিন্ন স্থানের জন্য এ উচ্চতা বিভিন্ন। নিরক্ষরেখা থেকে ধ্রুবতারাকে ঠিক দিগন্তরেখায় দেখা যায়। নিরক্ষরেখায় ধ্রুবতারার উন্নতি ০°। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর মেরুর দিকে প্রতি ১° অগ্রসর হতে থাকলে ধ্রুবতারার উন্নতি ১° করে বাড়তে থাকবে। উত্তর মেরুতে ধ্রুবতারাকে ঠিক শিরোবিন্দুতে অর্থাৎ মাথার ওপরে দেখা যায় অর্থাৎ উত্তর মেরুতে ধ্রুবতারার উন্নতি ৯০° হয়। সুতরাং নিরক্ষরেখার অক্ষাংশ ০° এবং উত্তর মেরুর অক্ষাংশ ৯০°। যতই উত্তরে অগ্রসর হওয়া যায় ততই অক্ষাংশ বাড়তে থাকে। সুতরাং উত্তর গোলার্ধের কোনো স্থানের অক্ষাংশ হয় ধ্রুবতারার উন্নতির সমান। ধ্রুবতারার উন্নতি জানতে পারলে সহজেই অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। ধ্রুবতারার দ্বারা দিনের বেলায় বা দক্ষিণ গোলার্ধে অক্ষাংশ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

সেক্সট্যান্ট (Sextant) যন্ত্রের সাহায্যে অক্ষাংশ নির্ণয়: যে যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের উন্নতি পরিমাপ করা যায় তাকে সেক্সট্যান্ট যন্ত্র বলে। এ সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে মধ্যাহ্নের সূর্যের উন্নতির কোণ নির্ণয় করে অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। অক্ষাংশ নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত সূত্রটি ব্যবহার করা হয়। যথা, কোনো স্থানের অক্ষাংশ = ৯০°− মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি + বিষুবলম্ব।

বিষুবলম্ব: সূর্য যেদিন যে অক্ষাংশের ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় সেটাই সেদিনের সূর্যের বিষুবলম্ব। সূর্যের বিষুবলম্ব ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। কোনো একদিনের দক্ষিণ গোলার্ধে মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি (Altitude of the sun) ৫০° এবং বিষুবলম্ব ১৫° দক্ষিণ হলে সে স্থানের অক্ষাংশ হবে নিম্নরূপ :

অক্ষাংশ = ৯০° – মধ্যাহ্ন সূর্যের উন্নতি – বিষুবলম্ব = ৯০° – ৫০° – ১৫° = ৯০° – ৬৫° = ২৫° দক্ষিণ।

স্থানটি যদি উত্তর গোলার্ধে হয় তবে উত্তর বাচক বিষুবলম্ব যোগ এবং দক্ষিণ বাচক বিষুবলম্ব বিয়োগ করতে হবে। দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ বাচক বিষুবলম্ব যোগ এবং উত্তর বাচক বিষুবলম্ব বিয়োগ করতে হয়।

দ্রাঘিমারেখা (Meridians of Longitude)

নিরক্ষরেখাকে ডিগ্রি, মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করে প্রত্যেক ভাগবিন্দর ওপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে রেখাগুলো কল্পনা করা হয়েছে তাকে দ্রাঘিমারেখা বলে। দ্রাঘিমারেখাকে মধ্যরেখাও বলা হয়। মধ্যরেখাগুলোর যে কোনো একটিকে নির্দিষ্ট মূল মধ্যরেখা ধরে এ রেখা থেকে অন্যান্য মধ্যরেখার কৌণিক দূরত্ব মাপা হয় (চিত্র ৬)।

চিত্র ৬ : দ্রাঘিমা ও কৌণিক দূরত্ব

মূল মধ্যরেখা (Prime Meridian)

যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রীনিচ (Greenwich) মান মন্দিরের ওপর দিয়ে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে। এই রেখার মান ০° ধরা হয়েছে।

মূল মধ্যরেখা থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রে উৎপন্ন কোণের সাহায্যে অপরাপর দ্রাঘিমারেখাগুলো অঙ্কন করা যায়। গ্রীনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে ৪৫° পূর্বে যে মধ্যরেখা বা দ্রাঘিমারেখা তার ওপর সকল স্থানের দ্রাঘিমা ৪৫° পূর্ব দ্রাঘিমা। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, গ্রীনিচের মূল মধ্যরেখা থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে যে কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে সেই স্থানের দ্রাঘিমা বলা হয়। আমরা আরো জানি, গ্রীনিচের দ্রাঘিমা ০°। পৃথিবীর পরিধি দ্বারা উৎপন্ন কোণ ৩৬০°। মূল মধ্যরেখা এ ৩৬০° কে ১° অন্তর অন্তর সমান দুই ভাগে অর্থাৎ ১৮০° পূর্ব ও ১৮০° পশ্চিমে ভাগ করেছে। পৃথিবী গোলাকার বলে ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমা ও ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই মধ্যরেখায় পড়ে। অক্ষাংশের ন্যায় দ্রাঘিমাকেও মিনিট ও সেকেন্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি মিনিট দ্রাঘিমা এক ডিগ্রির $\frac{১}{৬০}$ অংশের সমান। যেখানে নিরক্ষরেখা ও মূল মধ্যরেখা পরস্পরকে লম্বভাবে ছেদ করে সেখানে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা উভয়ই ০°। আর এ স্থানটি হল গিনি উপসাগরের কোনো একটি স্থান।

দ্রাঘিমা নির্ণয়: ভূপৃষ্ঠের কোনো স্থানের দ্রাঘিমা দুইভাবে নির্ণয় করা যায়। এ দুইটি পদ্ধতি হল :
১। স্থানীয় সময়ের পার্থক্য ও
২। গ্রীনিচের সময়ের মাধ্যমে

১। স্থানীয় সময়ের পার্থক্য: আমরা জানি, পৃথিবী গোলাকার এবং পৃথিবী নিজ অক্ষ বা মেরুরেখার চারদিকে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অনবরত আবর্তন করছে। ফলে ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সূর্যের সামনে উপস্থিত হচ্ছে। যে সময়ে কোনো স্থানের মধ্যরেখা সূর্যের ঠিক সামনে আসে অর্থাৎ ঐ স্থানে সূর্যকে ঠিক মাথার ওপর দেখা যায়, তখন ঐ স্থানে মধ্যাহ্ন হয় এবং ঘড়িতে বেলা ১২টা বাজে। মধ্যাহ্ন অনুসারে দিনের অন্যান্য সময় নির্ণয় করা হয়। আমরা জানি ১° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট। এ কথাটিকে ঘুরিয়ে বললে বলা যায় যে, ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্যের জন্য দ্রাঘিমার পার্থক্য ১°। কোনো স্থান বা অঞ্চলে যখন বেলা ১২টা তখন সে স্থান থেকে ৫° পূর্বে অবস্থিত স্থানের সময় হবে ১২টা + (৫° x ৪) মিনিট বা ১২ ঘণ্টা ২০ মিনিট। একই স্থান থেকে ৫° পশ্চিমে অবস্থিত স্থানের সময় হবে ১২টা – (৫° x ৪) মিনিট বা (১২টা – ২০ মিনিট) বা ১১টা ৪০ মিনিট।

২। গ্রীনিচের সময়ের মাধ্যমে: আমরা জানি, গ্রীনিচের দ্রাঘিমা ০°। গ্রীনিচের সঠিক সময় ক্রনোমিটার ঘড়ি থেকে জানা যায়। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যে যে স্থানের দ্রাঘিমা বের করতে হবে ঐ স্থানের আকাশে সূর্যের সর্বোচ্চ অবস্থান দেখে ঐ সময় ঐ স্থানের দুপুর ১২টা ধরা হয়। নির্দিষ্ট সময়ে গ্রীনিচের সময়ও ঐ স্থানের সময়ের পার্থক্য থেকে ঐ

স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করা হয়। কোনো স্থান গ্রীনিচের পূর্বে হলে তার স্থানীয় সময় গ্রীনিচের সময় থেকে বেশি হবে এবং পশ্চিমে হলে স্থানীয় সময় গ্রীনিচের সময় থেকে কম হবে।

সমাক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার পার্থক্য:

১। সমাক্ষরেখাগুলো পরস্পর সমান্তরাল কিন্তু দ্রাঘিমারেখাগুলো সমান্তরাল নয়।
২। সমাক্ষরেখা পূর্ণবৃত্ত, দ্রাঘিমারেখা অর্ধবৃত্ত।
৩। প্রত্যেক দ্রাঘিমারেখার দৈর্ঘ্য সমান কিন্তু সমাক্ষরেখার দৈর্ঘ্য সমান নয়।
৪। সমাক্ষরেখা পূর্ব–পশ্চিমে বিস্তৃত কিন্তু দ্রাঘিমারেখা উত্তর–দক্ষিণে বিস্তৃত।
৫। সর্বোচ্চ অক্ষাংশ ৯০°, সর্বোচ্চ দ্রাঘিমা ১৮০°।

স্থানীয় সময় ও প্রমাণ সময়

স্থানীয় সময় (Local Time): প্রতি দিন পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে তার নিজ মেরুরেখার ওপর আবর্তিত হচ্ছে। ফলে পূর্ব দিকে অবস্থিত স্থানগুলোতে আগে সূর্যোদয় হয়। পৃথিবীর আবর্তনের ফলে কোনো স্থানে সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর আসে বা সর্বোচ্চে অবস্থান করে তখন ঐ স্থানে মধ্যাহ্ন এবং ঐ স্থানের ঘড়িতে তখন বেলা ১২টা ধরা হয়। এ মধ্যাহ্ন সময় থেকে দিনের অন্যান্য সময় স্থির করা হয়। একে ঐ স্থানের স্থানীয় সময় বলা হয়। সেক্সট্যান্ট যন্ত্রের সাহায্যেও স্থানীয় সময় নির্ণয় করা যায়।

পৃথিবীর কেন্দ্রে কোণের পরিমাণ ৩৬০°। এ ৩৬০° কৌণিক দূরত্ব আবর্তন করতে পৃথিবীর ২৪ ঘণ্টা বা (২৪ x ৬০) = ১,৪৪০ মিনিট সময় লাগে। সুতরাং পৃথিবী ১° ঘোরে (১,৪৪০ ÷ ৩৬০) = ৪ মিনিট সময়ে অর্থাৎ প্রতি ১° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় ৪ মিনিট।

প্রমাণ সময় (Standard Time): দ্রাঘিমারেখার ওপর মধ্যাহ্নের সূর্যের অবস্থানের সময়কালকে দুপুর ১২টা ধরে স্থানীয় সময় নির্ণয় করলে একই দেশের মধ্যে সময় গণনার বিভ্রাট হয়। সে জন্য প্রত্যেক দেশের একটি প্রমাণ সময় নির্ণয় করা হয়। প্রত্যেক দেশেই সেই দেশের মধ্যভাগের কোনো স্থানের দ্রাঘিমারেখা অনুযায়ী যে সময় নির্ণয় করা হয় সে সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় বলে।

অনেক বড় দেশ হলে কয়েকটি প্রমাণ সময় থাকে। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে চারটি এবং কানাডাতে পাঁচটি প্রমাণ সময় রয়েছে। সেসব দেশে প্রশাসনিক ও অন্যান্য কাজের সুবিধার জন্য একাধিক প্রমাণ সময় রয়েছে। রেল, ডাক, বেতার, তার প্রভৃতি বিভাগের কাজ চালানোর জন্য সে দেশের প্রমাণ সময় ব্যবহার করা হয়। গ্রীনিচের (০° দ্রাঘিমার) স্থানীয় সময়কে সমগ্র পৃথিবীর প্রমাণ সময় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রমাণ সময় গ্রীনিচের সময় অপেক্ষা ৬ ঘণ্টা অগ্রবর্তী। ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগে অবস্থিত। এ কারণে এ দ্রাঘিমার স্থানীয় সময়কে বাংলাদেশের প্রমাণ সময় ধরে কাজ করা হয়।

প্রতিপাদ স্থান (Antipode): ভূপৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত কোনো বিন্দুর ঠিক বিপরীত বিন্দুকে সেই বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান বলে। প্রতিপাদ স্থান সম্পূর্ণভাবে একে অন্যের বিপরীত দিকে থাকে। প্রতিপাদ স্থান নির্ণয় করার জন্য ভূপৃষ্ঠের কোনো বিন্দু থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে একটি কল্পিত রেখা পৃথিবীর ঠিক বিপরীত দিকে টানা হয়। ঐ কল্পিত রেখা যে বিন্দুতে ভূপৃষ্ঠের বিপরীত পাশে এসে পৌঁছায় সেই বিন্দুই পূর্ব বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান (চিত্র ৭)।

চিত্র ৭ : প্রতিপাদ স্থান

কোনো স্থানের অক্ষাংশ জানা থাকলে তার প্রতিপাদ স্থানেরও অক্ষাংশ নির্ণয় করা যায়। কোনো স্থানের অক্ষাংশ যত ডিগ্রি, এর প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ তত ডিগ্রি হবে। স্থান দুইটি একটি
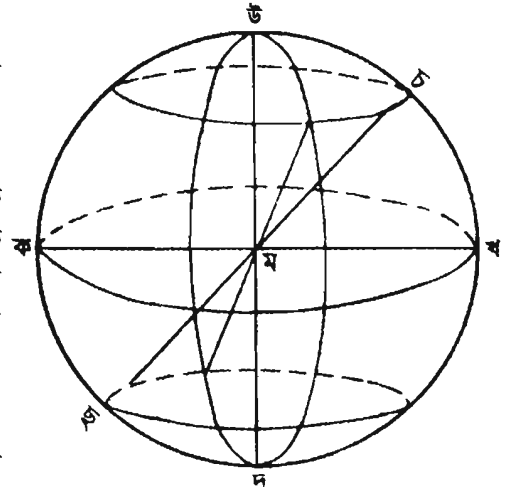
নিরক্ষরেখার উত্তরে ও অপরটি দক্ষিণে অবস্থিত হবে। দুইটি স্থান দুই গোলার্ধে হবে। একটি স্থানের অক্ষাংশ ৭০° উত্তর হলে তার প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ ৭০° দক্ষিণ হবে।

কোনো স্থানের দ্রাঘিমা এবং এর প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা যোগ করলে ১৮০° হবে। সুতরাং ১৮০° থেকে এক স্থানের দ্রাঘিমা বাদ দিলে এর প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা পাওয়া যায়। এক স্থানের দ্রাঘিমা পূর্ব হলে এর প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা পশ্চিমে হবে। যেমন, ৪০° পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত স্থানের প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা হবে ১৮০°−৪০° = ১৪০° পশ্চিম। স্থান দুইটির মধ্যে সময়ের পার্থক্য হবে ১২ ঘণ্টা। চিত্রে চ বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান ছ বিন্দু (চিত্র ৭)।

ঢাকার প্রতিপাদ স্থান দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত চিলির নিকট প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (International Date Line)

কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূর্ব বা পশ্চিমে দীর্ঘপথ ভ্রমণ করার সময় স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহের দিন বা বার নিয়েও গণ্ডগোল বাধে বা গরমিল হয়। কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করলে সমস্যা দেখা দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮০° দ্রাঘিমারেখাকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণভাবে জলভাগের ওপর দিয়ে উত্তর−দক্ষিণে প্রসারিত একটি রেখা কল্পনা করা হয়। এ কল্পিত রেখাটিকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখার প্রয়োজনীয়তা: আমরা জানি, ১° দ্রাঘিমান্তরে ৪ মিনিট সময়ের ব্যবধান হয়। সুতরাং ১৫° দ্রাঘিমান্তরে সময়ের ব্যবধান হবে ১ ঘণ্টা। এভাবে মূল মধ্যরেখা থেকে (গ্রীনিচের দ্রাঘিমা) পূর্ব দিকে অগ্রসর হতে থাকলে ১৮০° দ্রাঘিমায় ১২ ঘণ্টা সময় বেশি হয় এবং পশ্চিম দিকে অগ্রসর হলে ১৮০° দ্রাঘিমায় ১২ ঘণ্টা সময় কম হয়। সুতরাং মূল মধ্যরেখায় যখন সোমবার সকাল ১০টা তখন ১৮০° পূর্ব দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময় সোমবার রাত ১০টা। এভাবে আবার ঠিক পশ্চিম দিক দিয়ে দ্রাঘিমা গণনা করলে ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময় হবে তার পূর্ব দিন অর্থাৎ রবিবার রাত ১০টা। কিন্তু ১৮০° পূর্ব ও ১৮০° পশ্চিম দ্রাঘিমা মূলত একই রেখা। সুতরাং দেখা যায়, একই দ্রাঘিমায় স্থানীয় সময়ের পার্থক্য হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা বা একদিন। একই স্থানে কোথাও রবিবার কোথাও সোমবার। কিন্তু একই দ্রাঘিমারেখায় একই সঙ্গে রবিবার রাত ১০টা ও সোমবার রাত ১০টা হতে পারে না। এ অসুবিধা দূর করার জন্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মাধ্যমে প্রশান্ত মহাসাগরের জলভাগের ওপর মানচিত্রে ১৮০° দ্রাঘিমারেখাকে অবলম্বন করে একটি রেখা কল্পনা করা হয়েছে। এটিই আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা। এ রেখা অতিক্রম করলে দিন এবং তারিখের পরিবর্তন হয় বলে এ রেখাটিকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে (চিত্র ৮)।

চিত্র ৮ : আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা

গ্রীনিচ থেকে পূর্বগামী কোনো জাহাজ বা বিমান এ রেখা অতিক্রম করলে স্থানীয় সময়ের সঙ্গে মিল রাখার জন্য তাদের বর্ধিত সময় থেকে একদিন বিয়োগ করে এবং পশ্চিমগামী জাহাজ বা বিমান তাদের কম সময়ের সঙ্গে একদিন যোগ করে তারিখ গণনা করে থাকে।
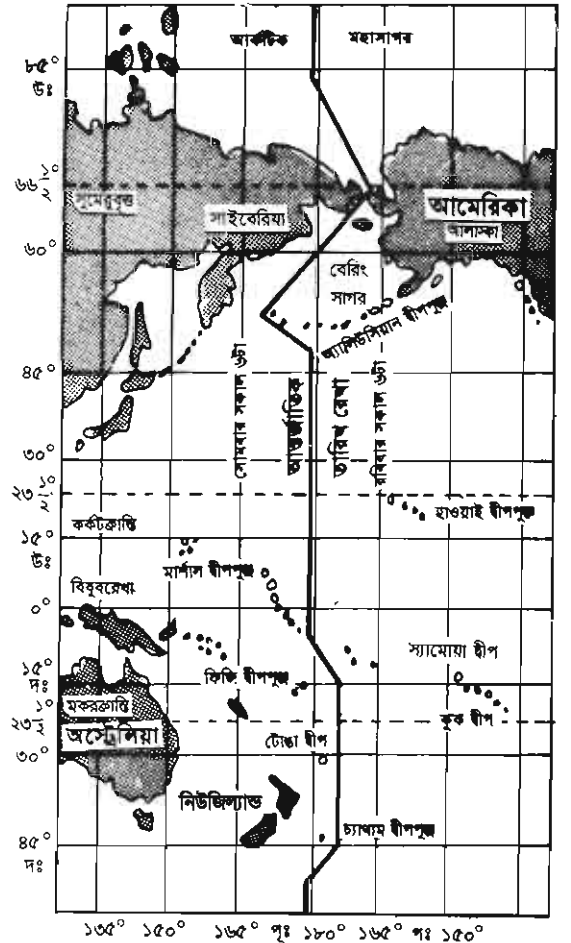
আন্তর্জাতিক তারিখ রেখাটি ১৮০° পূর্ব ও পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা। এটি সাইবেরিয়ার উত্তর–পূর্ব অংশ অ্যালিউসিয়ান, ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের ওপর দিয়ে গেছে। স্থানীয় লোকদের সময়ের হিসেবে অসুবিধা দূর করার জন্য এ রেখা বেরিং প্রণালিতে ১২° পূর্ব, অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছে ৭০° পশ্চিম এবং ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের কাছে ১১° পূর্ব দিকে বেঁকে শুধু জলভাগের ওপর দিয়ে টানা হয়েছে। এ রকমভাবে রেখা টানা না হলে একই দ্বীপের দুই অংশে দুই ধরনের সময় গণনা করতে হবে।

দ্রাঘিমা ও সময় নির্ধারণ

প্রশ্ন ১। ঢাকা থেকে দুইটি স্থানের দ্রাঘিমান্তর যথাক্রমে ৪০°৩০′ পূর্ব এবং ৫০°৩০′ পশ্চিম। ঢাকায় যখন সকাল ৮টা তখন স্থান দুইটির স্থানীয় সময় কত?

সমাধান

ঢাকা ও প্রথম স্থানটির দ্রাঘিমার ব্যবধান ৪০°৩০′
এই ব্যবধানের জন্য সময়ের ব্যবধান (৪০° x ৪) মিনিট + (৩০′ x ৪) সেকেন্ড
= ১৬০ মিনিট + ১২০ সেকেন্ড
= ১৬০ মিনিট + ২ মিনিট = ১৬২ মিনিট
= ২ ঘণ্টা ৪২ মিনিট
প্রথম স্থানটি ঢাকার পূর্বে অবস্থিত। সুতরাং স্থানটির স্থানীয় সময় বেশি হবে। অর্থাৎ ঢাকার সময়ের সঙ্গে ২ ঘণ্টা ৪২ মিনিট যোগ করতে হবে।
∴ সময় = (৮টা ০ মিনিট ০ সেকেন্ড) + (২ ঘণ্টা ৪২ মিনিট ০ সেকেন্ড)
= সকাল ১০টা ৪২ মিনিট

আবার ঢাকা ও দ্বিতীয় স্থানটির দ্রাঘিমার ব্যবধান ৫০°৩০′
∴ সময়ের ব্যবধান = (৫০° x ৪) মিনিট + (৩০′ x ৪) সেকেন্ড
= ২০০ মিনিট + ১২০ সেকেন্ড =২০২ মিনিট
= ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট
দ্বিতীয় স্থানটি ঢাকার পশ্চিমে অবস্থিত। সুতরাং এর স্থানীয় সময় কম হবে অর্থাৎ ঢাকার সময়ের থেকে ৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট বিয়োগ করতে হবে।
সুতরাং স্থানটির স্থানীয় সময় = (৮টা ০ মিনিট ০ সেকেন্ড) – (৩ ঘণ্টা ২২ মিনিট)
= সকাল ৪টা ৩৮ মিনিট
∴ স্থান দুইটির নির্ণেয় স্থানীয় সময় যথাক্রমে সকাল ১০টা ৪২ মিনিট এবং সকাল ৪টা ৩৮ মিনিট।
উত্তর : সকাল ১০টা ৪২ মিনিট এবং সকাল ৪টা ৩৮ মিনিট।

প্রশ্ন ২। ঢাকা ও সিউলের সময়ের পার্থক্য ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট। ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০° পূর্ব এবং স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ৩২ মিনিট হলে সিউলের স্থানীয় সময় ও দ্রাঘিমা নির্ণয় কর।

সমাধান

দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউল। সিউল ঢাকার পূর্বে অবস্থিত। সুতরাং সিউলের স্থানীয় সময় ঢাকার সময়ের চেয়ে বেশি হবে।
ঢাকার স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ৩২ মিনিট
∴ সিউলের স্থানীয় সময় = ৬টা ৩২ মিনিট + ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট
= ৮টা ৬৪ মিনিট
= সকাল ৯টা ৪ মিনিট

আবার ঢাকার ও সিউলের সময়ের পার্থক্য = ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট বা ১৫২ মিনিট

৪ মিনিট সময়ের ব্যবধানের জন্য দ্রাঘিমার পার্থক্য হয় ১°

১ মিনিট সময়ের ব্যবধানের জন্য দ্রাঘিমার পার্থক্য হয় $\left(\frac{১}{৪}\right)^\circ$

∴ ১৫২ মিনিট সময়ের ব্যবধানের জন্য দ্রাঘিমার পার্থক্য হয় $\left(\frac{১ \times ১৫২}{৪}\right)^\circ = ৩৮^\circ$

ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০° পূর্ব। সিউল ঢাকার পূর্বে বলে দ্রাঘিমা বাড়বে।
সুতরাং সিউলের দ্রাঘিমা = ৯০° + ৩৮° = ১২৮° পূর্ব
উত্তর : সিউলের স্থানীয় সময় সকাল ৯টা ৪ মিনিট এবং সিউলের দ্রাঘিমা ১২৮° পূর্ব।

প্রশ্ন ৩। গ্রীনিচের ঘড়ি অনুসারে সকাল ৭টা ২০ মিনিটে যদি কোনো স্থানের মধ্যাহ্ন হয়, তা হলে সেই স্থানের দ্রাঘিমা কত নির্ণয় কর।

সমাধান

গ্রীনিচে যখন সকাল ৭টা ২০ মিনিট তখন নির্দিষ্ট স্থানটির স্থানীয় সময় দুপুর ১২টা। স্থানটির স্থানীয় সময় গ্রীনিচের চেয়ে বেশি। সুতরাং স্থানটি গ্রীনিচের পূর্ব দিকে অবস্থিত, অর্থাৎ এটি পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।
দুইটি স্থানের সময়ের পার্থক্য = (১২টা – ৭টা ২০ মিনিট)
= ৪ ঘণ্টা ৪০ মিনিট = ২৮০ মিনিট
প্রতি ৪ মিনিট সময়ের পার্থক্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য হয় ১°

১ মিনিট সময়ের পার্থক্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য হয় $\left(\frac{১}{৪}\right)^\circ$

∴ ২৮০ মিনিট সময়ের পার্থক্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য হয় $\left(\frac{১ \times ২৮০}{৪}\right)^\circ = ৭০^\circ$

গ্রীনিচ ও ঐ স্থানটির মধ্যে দ্রাঘিমান্তর হবে = ৭০°
আমরা জানি, গ্রীনিচের দ্রাঘিমা ০°। সুতরাং নির্ণেয় স্থানটির দ্রাঘিমা হবে ৭০° পূর্ব।
উত্তর : স্থানটির দ্রাঘিমা ৭০° পূর্ব।

প্রশ্ন ৪। ঢাকা ৯০°২৬′ পূর্ব দ্রাঘিমায় এবং করাচি ৬৭° পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। করাচি শহরের স্থানীয় সময় সকাল ১০টা হলে ঢাকা শহরের স্থানীয় সময় কত?

সমাধান

ঢাকা ও করাচির মধ্যে দ্রাঘিমার পার্থক্য ৯০°২৬′ – ৬৭° পূর্ব = ২৩°২৬′
প্রতি ১° দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য ৪ মিনিট এবং ১′ দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য ৪ সেকেন্ড।
সুতরাং ঢাকা ও করাচির সময়ের পার্থক্য = (২৩° x ৪) মিনিট + (২৬′ x ৪) সেকেন্ড
= ৯২ মিনিট + ১০৪ সেকেন্ড
= ৯২ মিনিট + (১ মিনিট + ৪৪ সেকেন্ড) = ৯৩ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড
= ১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড
ঢাকা করাচির পূর্বে অবস্থিত। সুতরাং ঢাকার স্থানীয় সময় করাচির চেয়ে বেশি হবে।
করাচির স্থানীয় সময় সকাল ১০টা। সুতরাং সকাল ১০টার সঙ্গে ১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড যোগ করতে হবে।

∴ ঢাকার স্থানীয় সময় = ১০টা + ১ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড
= সকাল ১১টা ৩৩ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড
উত্তর : ঢাকার স্থানীয় সময় সকাল ১১টা ৩৩ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড।

প্রশ্ন ৫। একটি স্থানের অক্ষাংশ ৪০° উত্তর এবং দ্রাঘিমা ৫৫° পূর্ব। উক্ত স্থানের প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা নির্ণয় কর।

সমাধান

কোনো স্থানের প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ হয় ঐ স্থানের অক্ষাংশের সমান কিন্তু বিপরীত গোলার্ধে। স্থানটির অক্ষাংশ ৪০° উত্তর, তাই এর প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ হবে ৪০° দক্ষিণ এবং প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা = (১৮০° − ঐ স্থানের দ্রাঘিমা)।
স্থানটির দ্রাঘিমা ৫৫° পূর্ব।
∴ এর প্রতিপাদ স্থানের দ্রাঘিমা হবে (১৮০° − ৫৫°) = ১২৫°
কিন্তু দ্রাঘিমা হবে পশ্চিম।
সুতরাং প্রতিপাদ স্থানটির দ্রাঘিমা হবে ১২৫° পশ্চিম।
উত্তর : স্থানটির প্রতিপাদ স্থানের অক্ষাংশ ৪০° দক্ষিণ এবং দ্রাঘিমা ১২৫° পশ্চিম।

অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম:

নিরক্ষরেখা: দুই মেরু থেকে সমান দূরত্বে পৃথিবীকে পূর্ব–পশ্চিমে বেষ্টন করে যে রেখা কল্পনা করা হয়েছে তাকে নিরক্ষরেখা বলে।

অক্ষাংশ: নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে অবস্থিত কোনো স্থানের কৌণিক দূরত্বকে ঐ স্থানের অক্ষাংশ বলে।

বিষুবলম্ব: সূর্য যেদিন যে অক্ষাংশের ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয় সেটাই সেদিনের সূর্যের বিষুবলম্ব।

দ্রাঘিমারেখা: নিরক্ষরেখাকে ডিগ্রি (°), মিনিট (′) ও সেকেন্ডে (″) ভাগ করে প্রত্যেক ভাগ বিন্দুর ওপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত যে রেখাগুলো কল্পনা করা হয়েছে তাকে দ্রাঘিমারেখা বলে।

মূল মধ্যরেখা: যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে গ্রীনিচ মান মন্দিরের ওপর দিয়ে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে তাকে মূল মধ্যরেখা বলে।

স্থানীয় সময়: পৃথিবীর আবর্তনের ফলে কোনো স্থানে সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর আসে বা সর্বোচ্চে অবস্থান করে তখন ঐ স্থানে মধ্যাহ্ন এবং ঐ স্থানের ঘড়িতে তখন বেলা ১২টা ধরা হয়। একে ঐ স্থানের স্থানীয় সময় বলা হয়। এ মধ্যাহ্ন সময় থেকে দিনের অন্যান্য সময় স্থির করা হয়।

প্রমাণ সময়: প্রত্যেক দেশেই সেই দেশের মধ্যভাগের কোনো স্থানের দ্রাঘিমারেখা অনুযায়ী যে সময় নির্ধারণ করা হয় সেই সময়কে ঐ দেশের প্রমাণ সময় বলে।

প্রতিপাদ স্থান: ভূপৃষ্ঠের ওপর অবস্থিত কোনো বিন্দুর ঠিক বিপরীত বিন্দুকে সেই বিন্দুর প্রতিপাদ স্থান বলে।

আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা: কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ১৮০° দ্রাঘিমারেখা অতিক্রম করলে স্থানীয় সময়ের পার্থক্যের সঙ্গে সঙ্গে সপ্তাহের দিন বা বার নিয়ে গরমিল হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ১৮০° দ্রাঘিমারেখাকে অবলম্বন করে সম্পূর্ণভাবে জলভাগের ওপর দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণে প্রসারিত একটি রেখা কল্পনা করা হয়। এই কল্পিত রেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ঢাকার দ্রাঘিমা ৯০° পূর্ব এবং ব্যাঙ্গালোরের দ্রাঘিমা ৮০° পূর্ব। ঢাকায় যখন দুপুর ১২টা, তখন ব্যাঙ্গালোরের স্থানীয় সময় কত?

ক. সকাল ১১.২০ খ. সকাল ১১.৫০
গ. দুপুর ১২.০০ ঘ. দুপুর ১২.৪০

নিচের চিত্রটি ব্যবহার কর এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
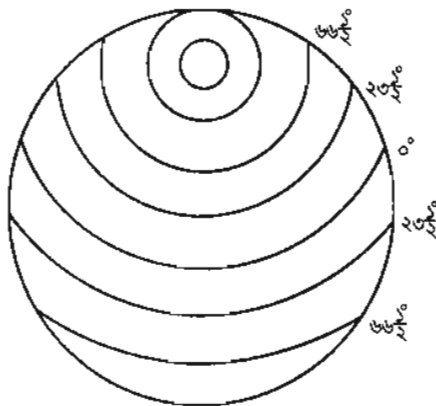
২। ০° তে অবস্থিত রেখাটি হল–

ক. কর্কটক্রান্তি খ. মকরক্রান্তি
গ. মেরুরেখা ঘ. নিরক্ষরেখা

৩। চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে পাই–

i. মেরুরেখা উত্তর ও দক্ষিণ মেরুকে বেষ্টন করেছে
ii. মেরুরেখা বিষুবরেখাকে অতিক্রম করেছে
iii. মেরুরেখা ও বিষুবরেখা পরস্পর সমান্তরাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii খ. ii এবং iii
গ. i এবং iii ঘ. i, ii এবং iii

৪। কল্পিত আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা টানা হয়েছে কোনটির ওপর দিয়ে?

ক. স্থলভাগ খ. জলভাগ
গ. ভূপৃষ্ঠের নিচ দিয়ে ঘ. মহাশূন্য দিয়ে

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ১৪ই মার্চ শুক্রবার সাদিদ লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার জন্য রাত ১১টায় ঢাকা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছে। রাত ১১টায় তাদের বিমান লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। বিমান যখন হিথ্রো বিমানবন্দরে এসে পৌঁছে তখন সাদিদ বিমানবন্দরের ঘড়িতে দেখতে পেল ১টা সকাল শনিবার। কিন্তু সাদিদের হাতে যে ঘড়ি আছে তাতে সময় লেখা ছিল ৭টা সকাল শনিবার।

ক. সময়ের পার্থক্য মূলত কীসের কারণে হয়?

খ. মূল মধ্যরেখার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. ঢাকার সময় যখন রাত ১১টা ১ মিনিট ৪৪ সেকেন্ড তখন লন্ডনের সময় বিকাল ৫টা। লন্ডনের দ্রাঘিমা ০° হলে ঢাকার দ্রাঘিমা কত?

ঘ. 'গ্রীনিচ সময়ের মাধ্যমে আমরা ভূপৃষ্ঠের যে কোনো স্থানের দ্রাঘিমা নির্ণয় করতে পারি'—এ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীর গতি

THE MOTION OF THE EARTH

প্রতি দিন সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এ থেকে প্রাচীনকালে অনেকে ধারণা করতেন যে, সূর্য গতিশীল এবং পৃথিবী স্থির। সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এটি প্রমাণিত হয় যে, সূর্য নিজে গতিশীল ও পৃথিবীও গতিশীল। পরবর্তীতে জানা যায় যে, সূর্য পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে না বরং পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। পৃথিবী শুধু সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে না, নিজ অক্ষ বা মেরুরেখার ওপর আবর্তন করে। পৃথিবীর গতি দুই প্রকার-নিজ অক্ষের ওপর আবর্তন করা এবং কক্ষপথে সূর্যকে পরিক্রমণ করা। পৃথিবীর আবর্তন গতিকে আহ্নিক গতি (Diurnal Motion) এবং পরিক্রমণ গতিকে বার্ষিক গতি (Annual Motion) বলে।

আহ্নিক গতি (Diurnal Motion)

পৃথিবী গতিশীল। সূর্যকে কেন্দ্র করে নিজ অক্ষ বা মেরুরেখার ওপর পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরছে। পৃথিবীর এ গতিকে আবর্তন বলে। নিজ মেরুরেখার চারদিকে এক বার সম্পূর্ণ ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড অর্থাৎ প্রায় ২৪ ঘণ্টা। এ ২৪ ঘণ্টাকে 'একদিন' হিসেবে গণনা করা হয়। পৃথিবীর এ দৈনিক গতিকেই আহ্নিক গতি বলে। সুতরাং আবর্তন গতিই আহ্নিক গতি। পৃথিবীর একটি পূর্ণ আবর্তনের সময়কে সৌরদিন (Solar day) বলে। পৃথিবী তার নিজের অক্ষের ওপর দিনে এক বার আবর্তন করছে।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম। নিরক্ষরেখায় পৃথিবীর আহ্নিক গতির বেগ সবচেয়ে বেশি। এখানে পৃথিবীর আহ্নিক গতি ঘণ্টায় ১,৬১০ কিলোমিটারের বেশি। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর বা দক্ষিণে এই গতিবেগ ক্রমশ কমতে থাকে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে এ গতিবেগ শূন্যের কাছাকাছি।

পৃথিবীর আহ্নিক গতি বা আবর্তন গতি থাকা সত্ত্বেও আমরা তা অনুভব করি না। এর কারণ হল :

১। পৃথিবীর আয়তনের তুলনায় আমরা খুবই ক্ষুদ্র বলে এ গতি অনুভব করি না।

২। পৃথিবীর সামনে এমন কোনো স্থির বা চলমান বস্তু নেই যার সাপেক্ষে আমরা পৃথিবীর আবর্তন গতি বুঝতে পারি।

৩। পৃথিবীর গতির সঙ্গে তাল রেখে বায়ুমণ্ডলও পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে বলে আমরা পৃথিবীর আবর্তন গতি অনুভব করি না।

৪। পৃথিবীর প্রতিটি স্থানের আবর্তন গতি সুনির্দিষ্ট।

আহ্নিক গতির প্রমাণ

প্রাচীনকালে টলেমী ও তাঁর অনুগামী জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ পৃথিবীকে স্থির মনে করতেন। পরবর্তীকালে জ্যোতির্বিজ্ঞানী কোপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও ও নিউটন পৃথিবীর আহ্নিক গতির পক্ষে বলেন।

চিত্র ৯ : উঁচু স্থান থেকে বস্তু নিক্ষেপ

১। সূর্য প্রতি দিন পূর্ব দিকে ওঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, হয় সূর্য ঘুরছে না হয় পৃথিবী ঘুরছে। এ গতি সম্পন্ন হচ্ছে একদিনে বা ২৪ ঘণ্টায়। পৃথিবী থেকে সূর্য ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে মহাকাশে অবস্থান করছে। এত দূর থেকে সূর্যের পক্ষে ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করা সম্ভব নয়। ২৪ ঘণ্টায় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসতে সূর্যের যে প্রচণ্ড গতিবেগের প্রয়োজন তা আলোর গতির চেয়ে বেশি হতে হবে। যা অসম্ভব ব্যাপার। কারণ, কোনো পদার্থই আলোর চেয়ে দ্রুতগামী হতে পারে না। তাই সূর্য নয়, পৃথিবীই ২৪ ঘণ্টায় নিজ মেরুরেখার ওপর এক বার আবর্তন করছে।

২। **পৃথিবীর আকৃতি:** পৃথিবীর মধ্যভাগ কিছুটা স্ফীত এবং মেরু অঞ্চলে কিছুটা চাপা। কোনো নমনীয় বস্তু তার অক্ষের চারদিকে ঘুরতে থাকলে এ রকম হয়। পৃথিবীর এ আকৃতি আবর্তন গতির ফলে সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানী নিউটন বলেন যে, পৃথিবীর আবর্তনের ফলেই এর আকৃতি এমন হয়েছে।

৩। পৃথিবীর আবর্তন গতির জন্য বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের পরিবর্তন ঘটছে। আহ্নিক গতির ফলেই সমুদ্রস্রোত ও বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়।

৪। কোনো উঁচু স্থান থেকে পাথরখণ্ড নিচে নিক্ষেপ করলে দেখা যায় এটি লম্বভাবে মাটিতে না পড়ে সামান্য পূর্ব দিকে সরে মাটিতে পড়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করছে বা পৃথিবীর আবর্তন গতি রয়েছে (চিত্র ৯)।

৫। প্রধানত চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার-ভাঁটা সংঘটিত হয়। সাতাশ (২৭) দিনে চাঁদ এক বার পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে আসে। সুতরাং ২৭ দিনে এক বার মুখ্য জোয়ার হত, কিন্তু প্রত্যহ এক বার মুখ্য জোয়ার হয়। দৈনিক মুখ্য জোয়ারের ঘটনা পৃথিবীর আবর্তন গতির কারণে ঘটে।

৬। ১৮৫১ সালে ফরাসি বিজ্ঞানী ফুকো (Foucault) দোলকের সাহায্যে পৃথিবীর আহ্নিক গতির প্রমাণ করেন। তিনি একটি ভারি লোহা দোলকের তলদেশে একটি আলপিন আটকে দোলকটিকে প্যারিস শহরের প্যান্থিয়ান নামক একটি গির্জার চূড়া থেকে উত্তর-দক্ষিণে নির্দিষ্ট গতিতে দুলিয়ে দেন। এতে ভূমিতে আলপিনের দাগ পড়তে থাকে। তিনি লক্ষ করেন যে, ভূমির ওপর আলপিনের দাগগুলো প্রতিবারই পূর্ব দিকে সরে যাচ্ছে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আহ্নিক গতির ফলে পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বে আবর্তন করছে (চিত্র ১০)।
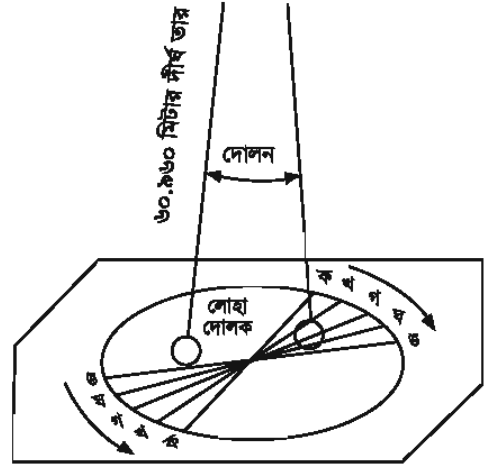
চিত্র ১০ : ফুকোর পরীক্ষা

আহ্নিক গতির ফল

১। **দিনরাত্রি সংঘটন:** পর্যায়ক্রমে দিনরাত্রি সংঘটিত হওয়া পৃথিবীর আহ্নিক গতির একটি ফল। আমরা জানি, পৃথিবী গোল এবং এর নিজের কোনো আলো নেই। সূর্যের আলোতে পৃথিবী আলোকিত হয়। আবর্তন গতির জন্য পৃথিবীর যে দিক সূর্যের সামনে আসে, যে দিক সূর্যের আলোতে আলোকিত হয়। তখন ঐ আলোকিত স্থানসমূহে দিন। আলোকিত স্থানের উল্টা দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর যে দিকটা সূর্যের বিপরীত দিকে, সেখানে সূর্যের আলো পৌঁছায় না, সে দিকটা অন্ধকার থাকে। এসব অন্ধকার স্থানে তখন রাত্রি (চিত্র ১১)।
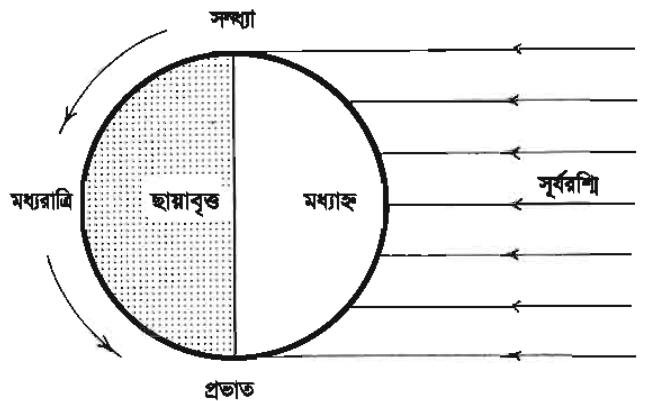
চিত্র ১১ : দিনরাত্রি সংঘটন

পৃথিবীর আবর্তনের ফলে আলোকিত দিকটা অন্ধকারে এবং অন্ধকারের দিকটা সূর্যের দিকে বা আলোকে চলে আসে। ফলে দিনরাত্রি পাল্টে যায়। অন্ধকার স্থানগুলো আলোকিত হওয়ার ফলে এসব স্থানে দিন হয়। আর আলোকিত স্থান অন্ধকার হয়ে যাওয়ার ফলে ঐসব স্থানে রাত হয়। এভাবে পর্যায়ক্রমে দিনরাত্রি সংঘটিত হতে থাকে। এভাবে কোনো স্থানে ১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত্রি হয়।

পৃথিবী গোল না হয়ে সমতল হলে আবর্তনের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে শুধু দিন বা শুধু রাত্রি হত। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে একসঙ্গে রাত ও একসঙ্গে দিন হত। কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীর একদিকে রাত, অপরদিকে দিন হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর একদিক আলোকিত থাকে অপরদিকে অন্ধকার থাকে। পৃথিবীর এই আলোকিত অংশ ও অন্ধকার অংশের সীমারেখাকে ছায়াবৃত্ত বলে। আহ্নিক গতি বা আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে অংশ অন্ধকার থেকে ছায়াবৃত্ত পার হয়ে সবেমাত্র আলোকিত অংশে পৌঁছায় সে অংশে হয় প্রভাত। আর যে অংশ আলোকিত অংশ থেকে ছায়াবৃত্ত অতিক্রম করে সবেমাত্র অন্ধকারে পৌঁছায় সে অংশে হয় সন্ধ্যা। প্রভাতের কিছুক্ষণ পূর্বে যে ক্ষীণ আলো দেখতে পাওয়া যায় তাকে বলা হয় ঊষা। আর সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্বে যে সময় ক্ষীণ আলো থাকে সে সময়কে বলা হয় গোধূলি। কোনো স্থানে সূর্য যখন মধ্য আকাশে অবস্থান করে তখন ঐ স্থানে দুপুর ১২টা বা মধ্যাহ্ন, আর এ স্থানের ঠিক বিপরীত দিকে মধ্যরাত্রি (চিত্র ১২)।
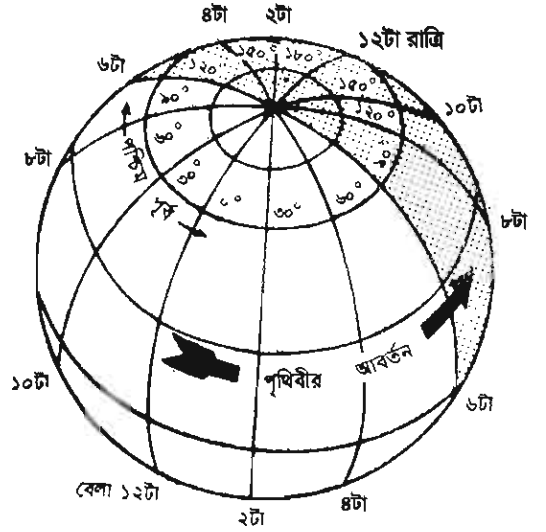
চিত্র ১২ : দিনরাত্রির বিভিন্ন অবস্থা

২। তাপমাত্রার তারতম্য সৃষ্টি: পৃথিবীর গোলাকার আকৃতি ও এর আবর্তনের ফলে সূর্যকিরণ পৃথিবীর ক্রান্তীয় অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র অংশে ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশ থেকে ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত বছরের কিছু সময় লম্বভাবে পতিত হয়। যে অংশে লম্বভাবে কিরণ পড়ে সে অংশ বেশি উত্তপ্ত হয়। এর উত্তর বা দক্ষিণে সূর্যকিরণ তির্যকভাবে পড়ে এবং এসব অঞ্চল কম উত্তপ্ত হয়।

৩। সমুদ্রস্রোত, জোয়ার-ভাঁটা ও বায়ুপ্রবাহ: আহ্নিক গতির ফলে আবর্তন শক্তির সৃষ্টি হয়। এর ফলে ভূপৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহ ও সমুদ্রস্রোতের দিক পরিবর্তিত হয়। সমুদ্রস্রোত ও বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়।

৪। সময় নির্ধারণ: আহ্নিক গতির ফলে সময়ের হিসাব করতে সুবিধা হয়। এক বার সম্পূর্ণ আবর্তনের সময়ের ২৪ ভাগের ১ ভাগকে ঘণ্টা ধরে এর ৬০ ভাগের ১ ভাগকে মিনিট আবার মিনিটের ৬০ ভাগের ১ ভাগকে সেকেন্ড- এভাবে সময় গণনা করা হয়।

৫। প্রকৃতি ও জীবজন্তুর ওপর প্রভাব: আহ্নিক গতির ফলে আলো ও উত্তাপের পরিবর্তনের সঙ্গে উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর জন্ম, বৃদ্ধি, স্বভাব ইত্যাদি জড়িত। আহ্নিক গতি না থাকলে কোনো কোনো স্থান চিরঅন্ধকার থাকত; ফলে গাছপালা কিছু জন্মাত না। আবার কোনো স্থানে সূর্যরশ্মি পড়ে উত্তাপে সবকিছু মরুপ্রায় হয়ে পড়ত।

বার্ষিক গতি (Annual Motion)

নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র অনুসারে গ্রহগুলো নক্ষত্রের আকর্ষণে এর চারপাশে পরিক্রমণ করে। সৌরজগতে একই ঘটনা ঘটছে। সৌরজগতের প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। পৃথিবী সৌরজগতের অন্যতম গ্রহ বলে পৃথিবীও প্রতিনিয়ত উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। নিজ অক্ষে ২৪ ঘণ্টায় এক বার আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট পথে বছরে এক বার সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পৃথিবীর এ পরিভ্রমণকে পরিক্রমণ গতি বা বার্ষিক গতি বলে। নিজ কক্ষপথে এক বার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড। যে সময়ে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে এক বার ঘুরে আসে সে সময়কালকে বলা হয় এক সৌরবছর।

পৃথিবীর কক্ষপথের পরিধি ৯৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৫১ হাজার ৮২৭ কিলোমিটার। বার্ষিক গতির গড় বেগ প্রতি ঘণ্টায় ১,০৬,২৬০ কিলোমিটার অর্থাৎ পৃথিবী প্রতি সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার বেগে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। এই হিসেবে সূর্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ড সময়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু ৩৬৫ দিনে সৌরবছর গণনা করা হয়। চার বছরে সময়ের ঘাটতি হয় প্রায় ২৪ ঘণ্টা বা একদিন। প্রতি ৪ বছরে একদিন বাড়িয়ে ইংরেজি চতুর্থ বছর ৩৬৬ দিনে গণনা করা হয়। সে বছর ফেব্রুয়ারি মাস ২৮ দিনের পরিবর্তে ২৯ দিন ধরা হয়। এরূপ বছরকে অধিবর্ষ বা Leap Year বলে। অধিবর্ষ হয় ৩৬৬ দিনে।

পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে দিনরাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে ও ঋতু পরিবর্তিত হয়।

বার্ষিক গতির ফল

১। দিনরাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি: পৃথিবীর বার্ষিক গতির ফলে একই সময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে দিনরাত্রির দৈর্ঘ্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয়ে থাকে। এর ফলে একই অক্ষাংশে ও বছরের বিভিন্ন সময়ে দিনরাত্রির দৈর্ঘ্যের তারতম্য হয়।

সূর্যকে পরিক্রমণকালে ২১শে জুন তারিখে পৃথিবী এমন এক জায়গায় আসে যে তখন সূর্যরশ্মি ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশে অর্থাৎ কর্কটক্রান্তির ওপর লম্বভাবে পড়ে। এ সময় উত্তর গোলার্ধ সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য থেকে সবচেয়ে বেশি দূরে থাকে। সে কারণে এই সময় উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য ও তাপমাত্রা বেশি হয়ে থাকে। উত্তর গোলার্ধে ২১শে জুন দীর্ঘতম দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত হয়। ২১শে জুন সূর্য উত্তরায়ণের শেষ সীমায় পৌছায়, এই দিনকে সূর্যের উত্তর অয়নান্ত (Summer Solstice) বলে।

২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্যরশ্মি নিরক্ষরেখার ওপর লম্বভাবে পড়ে। এ দুই দিন সূর্য উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থেকে সমান দূরে অবস্থান করে। এ দুই দিন পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান (১২ ঘণ্টা দিন ও ১২ ঘণ্টা রাত) হয়। যেদিন পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয় সেদিনকে বিষুব (Equinox) বলা হয়। ২১শে মার্চ উত্তর গোলার্ধে হয় বসন্তকাল, তাই ঐ দিনকে বাসন্ত বিষুব (Vernal Equinox) বলে। ২৩শে সেপ্টেম্বর উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল। ২৩শে সেপ্টেম্বরকে তাই বলা হয় শারদ বিষুব (Autumnal Equinox)।

২২শে ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকে থাকে তাই ঐ দিন দক্ষিণ গোলার্ধে দীর্ঘতম দিন এবং ক্ষুদ্রতম রাত হয়। ২২শে ডিসেম্বর সূর্য দক্ষিণায়নের শেষ সীমায় পৌছায়, একে দক্ষিণ অয়নান্ত (Winter Solstice) বলে। এ সময় সূর্যরশ্মি ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশে অর্থাৎ মকরক্রান্তির ওপর লম্বভাবে পতিত হয়।

বার্ষিক গতির প্রমাণ

১। নক্ষত্রের আপাত গতি: পৃথিবীর আবর্তন গতি আমরা যেমন অনুভব করতে পারি না, তেমনি অনুভব করতে পারি না পরিক্রমণ গতি বা বার্ষিক গতি। কিন্তু বছরের বিভিন্ন সময়ে রাতের আকাশে পূর্ব থেকে পশ্চিমে নক্ষত্রগুলোর অবস্থান পরিবর্তন থেকে পৃথিবীর যে বার্ষিক গতি আছে তা বোঝা যায়। মেঘমুক্ত আকাশে কয়েক দিন পরপর লক্ষ করলে নক্ষত্রের পূর্ব থেকে পশ্চিম আকাশে সরে যাওয়া বোঝা যায়।

২। আকাশে সূর্যের পরিবর্তিত অবস্থান: বছরের বিভিন্ন সময়ে সূর্যকে বিভিন্ন অবস্থানে দেখা যায়। ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর সূর্যকে ঠিক পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়ে পশ্চিম দিকে অস্ত যেতে দেখা যায়। ২১শে জুন সূর্যকে সবচেয়ে উত্তর-পূর্ব কোণে এবং ২২শে ডিসেম্বর সবচেয়ে দক্ষিণ-পর্ব কোণে উদিত হতে দেখা যায়। ২১শে জুন থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সূর্যের দক্ষিণাভিমুখী আপাত গতি রয়েছে বলে মনে হয়। একে সূর্যের দক্ষিণায়ন বলে। ২২শে ডিসেম্বর থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত মনে হয় সূর্য যেন উত্তর দিকে সরে যাচ্ছে। সূর্যের এ উত্তরাভিমুখী আপাত গতিকে বলা হয় সূর্যের উত্তরায়ণ।

৩। বিভিন্ন গ্রহের পরিক্রমণ গতি: দূরবীণের সাহায্যে পৃথিবী থেকে দেখা গেছে সকল গ্রহ সূর্যকে পরিক্রমণ করছে। পৃথিবী একটি গ্রহ সুতরাং এরও পরিক্রমণ গতি বা বার্ষিক গতি রয়েছে।

৪। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা: সাম্প্রতিককালে মহাশূন্যচারীগণ মহাশূন্যযান থেকে পৃথিবীর পরিক্রমণ গতি দেখেছেন।

৫। মহাকর্ষ সূত্র: সূর্যের তুলনায় পৃথিবী খুবই ক্ষুদ্র, সূর্য এর ১৩ লক্ষ গুণ বড়। তাই স্বাভাবিক কারণে সূর্যের মহাকর্ষ বলের প্রভাবে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে।

ঋতু পরিবর্তন (Change of Seasons)

তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে সারা বছরকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। এ প্রতিটি ভাগকে একটি ঋতু বলা হয়। এগুলো হল- গ্রীষ্মকাল, শরৎকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল। উল্লেখ্য যে, উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্মকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শীতকাল। আবার উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। তেমনি উত্তর গোলার্ধে যখন বসন্তকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন শরৎকাল এবং উত্তর গোলার্ধে যখন শরৎকাল দক্ষিণ গোলার্ধে তখন বসন্তকাল।

ঋতু পরিবর্তনের কারণ: তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে ঋতু পরিবর্তিত হয়। তাপমাত্রার পার্থক্য এবং ঋতু পরিবর্তনের কারণগুলো হল -

১। সূর্যের তাপের পার্থক্য।

২। পৃথিবী গোল, তাই পৃথিবীর কোথাও সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পড়ে আবার কোথাও তির্যকভাবে পড়ে। ফলে তাপমাত্রার পার্থক্য এবং ঋতু পরিবর্তিত হয়।

৩। পৃথিবীর আবর্তন পথ উপবৃত্তাকার তাই বছরের বিভিন্ন সময় সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কমবেশি হয়। এতে তাপমাত্রার পার্থক্য হয়, তাই ঋতু পরিবর্তিত হয়।

৪। নিজ কক্ষতলের সঙ্গে পৃথিবীর মেরুরেখা ৬৬.৫° কোণে একই দিকে অবস্থান করে। এতে বছরে এক বার পৃথিবীর উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু সূর্যের নিকটবর্তী হয়। যে গোলার্ধ যখন সূর্যের দিকে ঝুঁকে থাকে তার তাপমাত্রা তখন বেশি হয় এবং দূরে গেলে তাপমাত্রা কম হয়, ফলে ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

অনুসূর ও অপসূর: পৃথিবীর কক্ষপথ একটি উপবৃত্ত। এর দৈর্ঘ্য ৯৩,৮০,৫১,৮২৭ কিলোমিটার। সূর্য উপবৃত্তের কেন্দ্রে বা ফোকাসে (Focus) থাকে।

অনুসূর: পৃথিবীর উপবৃত্তাকার কক্ষে সূর্যকে পরিক্রমণ করতে করতে জানুয়ারির ১লা থেকে ৩রা তারিখে এমন এক অবস্থানে পৌঁছায় যেখানে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব সবচেয়ে কম থাকে। এ দূরত্ব ১৪ কোটি ৬৫ লক্ষ ৮৩ হাজার ৫০০ কিলোমিটার। একে পৃথিবীর অনুসূর অবস্থান (Perihelion) বলে। এ অবস্থানে পৃথিবীর মেরুরেখাটি কক্ষপথের বাইরের দিকে হেলে থাকে।
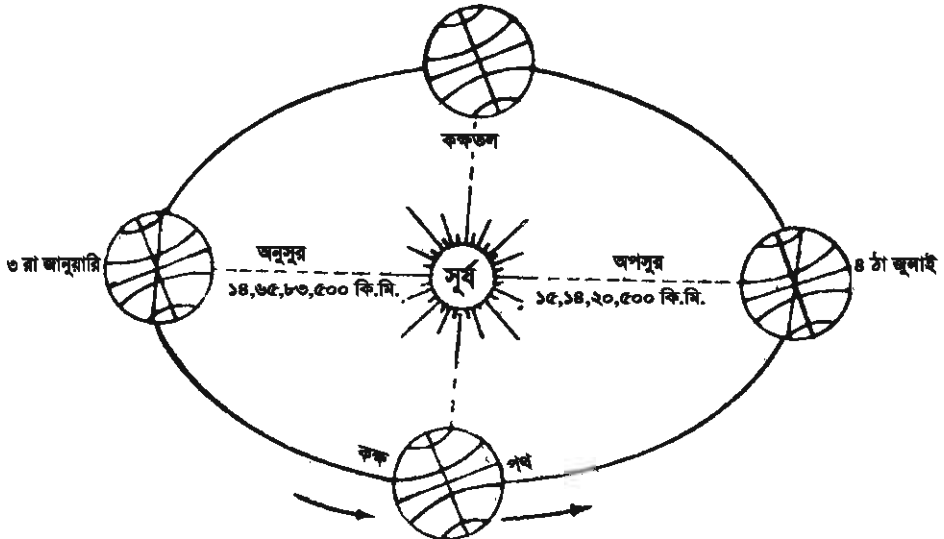
চিত্র ১৩ : অনুসূর ও অপসূর অবস্থান

অপসূর: পৃথিবীর কক্ষ উপবৃত্তাকার বলে সূর্যকে পরিক্রমণের সময় পৃথিবী ও সূর্যের মাঝের দূরত্ব সব সময় সমান থাকে না, কখনও বাড়ে কখনও কমে। জুলাই মাসের প্রথম দিকে অর্থাৎ ১লা থেকে ৪ঠা জুলাই সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব থাকে সবচেয়ে বেশি, ১৫ কোটি ১৪ লক্ষ ২০ হাজার ৫০০ কিলোমিটার। একে পৃথিবীর অপসূর অবস্থান (Aphelion) বলে।

ঋতু পরিবর্তন পদ্ধতি: আমরা জানি, পৃথিবীতে চারটি ঋতু- গ্রীষ্মকাল, শরৎকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল। আমরা এখন দেখব ঋতু কীভাবে পরিবর্তিত হয়। সূর্যকে পরিক্রমণকালে পৃথিবীর চারটি অবস্থান থেকে ঋতু পরিবর্তনের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

১। উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শীতকাল: আমরা জানি, পৃথিবীর উত্তর মেরু বছরে এক বার সূর্যের কাছাকাছি আসে। ২১শে জুনের পর থেকে পৃথিবী নিজ কক্ষপথে ঘোরার সময় এর উত্তর মেরু সূর্যের দিকে হেলে থাকে। এতে উত্তর গোলার্ধের বেশি অংশে সূর্যের আলো পড়ে। এ আলোকিত অংশ ক্রমেই বাড়তে থাকে। এর ফলে উত্তর মেরুতে দিন বড় হতে থাকে এবং রাত ছোট হতে থাকে। দিন বড় হয় বলে উত্তর গোলার্ধে সূর্যকিরণ বেশিক্ষণ ধরে পড়ে। এতে ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ার প্রচুর সময় পায়। ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়ে চারপাশের বায়ুকে উত্তপ্ত করে। রাত ছোট হওয়ার কারণে দিনের সঞ্চিত তাপের বিকিরণ কম হয়। ফলে উত্তর গোলার্ধে এ সময় গ্রীষ্মকালের আবহাওয়া বিরাজ করে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল। দক্ষিণ গোলার্ধে এ সময় বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে। এ সময় সূর্য থেকে হেলে থাকার কারণে এ গোলার্ধে সূর্য কম সময় ধরে কিরণ দেয়। ফলে দিন ছোট এবং রাত বড় হয়। দিনে ভূপৃষ্ঠ যতটুকু উত্তপ্ত হয়, রাতে তাপ বিকিরণের ফলে তা ঠান্ডা হয়ে যায়। এখানে তখন শীতের আবহাওয়া বিরাজ করে। দক্ষিণ গোলার্ধে এ সময় শীতকাল।
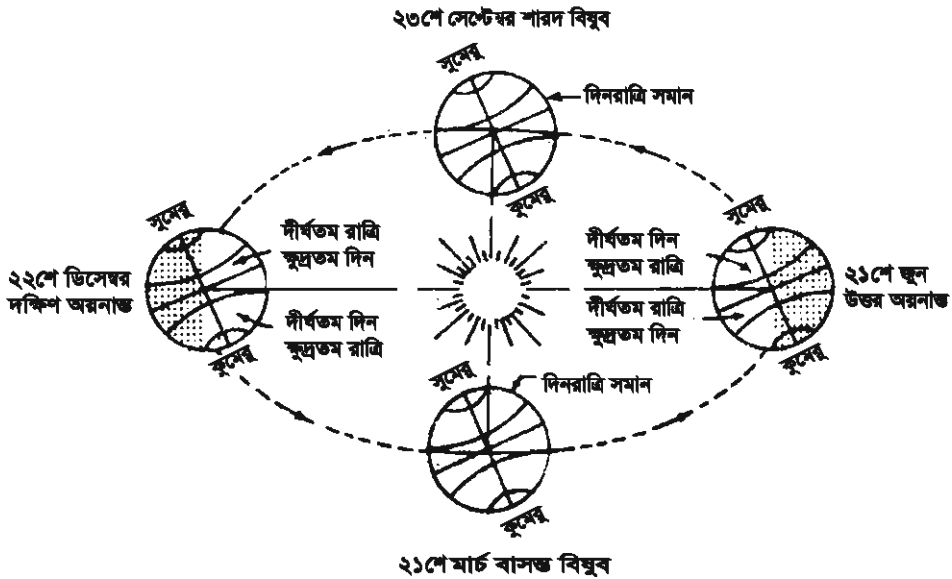
চিত্র ১৪ : পৃথিবীর পরিক্রমণ-দিনরাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন

২। উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল: ২১শে জুনের পর থেকে উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য কমতে থাকে, রাতের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। কিন্তু ২৩শে সেপ্টেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত দিনের তুলনায় রাত ছোট থেকে যায়। সূর্যের দিকে হেলে থাকা উত্তর মেরু অঞ্চল ক্রমাগত সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং দক্ষিণ মেরু অঞ্চল দূরে সরে থাকা অবস্থান থেকে সূর্যের দিকে ক্রমশ হেলতে থাকে অর্থাৎ দক্ষিণ মেরু অঞ্চল সূর্যের দিকে সরে যেতে থাকে। ফলে উত্তর গোলার্ধের তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এ সময় উত্তর গোলার্ধে শরৎকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বসন্তকাল। ২৩শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয় (চিত্র ১৪)।

৩। উত্তর গোলার্ধে শীতকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল: আমরা জানি, ২৩শে সেপ্টেম্বরের পর দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের দিকে হেলতে থাকে। মনে হয় যেন, সূর্য বুঝি প্রতি দিন একটু করে দক্ষিণ দিকে সরে যাচ্ছে। একে সূর্যের দক্ষিণায়ন বলে। দক্ষিণ মেরু যতই সূর্যের নিকটবর্তী হতে থাকে দক্ষিণ গোলার্ধে রাতের তুলনায় দিন ততই দীর্ঘ হতে থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধ বেশিক্ষণ ধরে সূর্যকিরণ পায় এবং সূর্যরশ্মি মকরক্রান্তিতে লম্বভাবে পড়ে। এতে দক্ষিণ গোলার্ধে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে। ২২শে ডিসেম্বর তারিখে পৃথিবীর দক্ষিণ মেরু সূর্যের সবচেয়ে কাছাকাছি আসে। ঐ দিন দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন হয়। ২২শে ডিসেম্বরের পূর্ববর্তী দেড় মাস ও পরবর্তী দেড় মাস দক্ষিণ গোলার্ধে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি হয়। স্বাভাবিকভাবে এ সময় উত্তর গোলার্ধে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। ২২শে ডিসেম্বরের পূর্ববর্তী দেড় মাস দক্ষিণ গোলার্ধে গ্রীষ্মকাল এবং উত্তর গোলার্ধে শীতকাল।
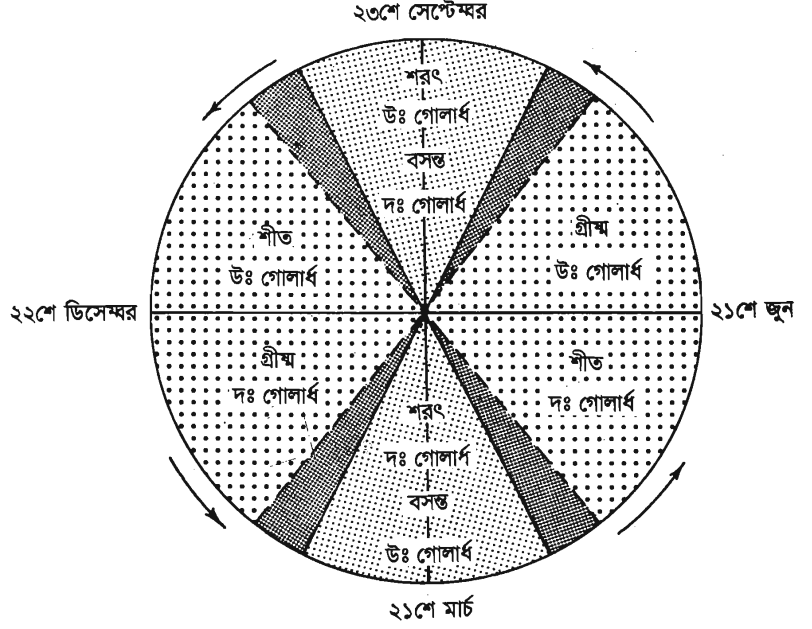
চিত্র ১৫ : প্রধান ঋতু

৪। উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল ও দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল: ২২শে ডিসেম্বরের পর সূর্যের উত্তরায়ণ শুরু হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য কমতে থাকে এবং উত্তর গোলার্ধে দিনের দৈর্ঘ্য বাড়তে থাকে। ফলে তাপমাত্রা উত্তর গোলার্ধে বাড়তে থাকে, দক্ষিণ গোলার্ধে কমতে থাকে। ২১শে মার্চে এসে পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রি সমান হয়। এ দিন সূর্য বিষুবরেখার ওপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এ দিনকে বাসন্ত বিষুব বলা হয়। এ সময় উত্তর গোলার্ধে বসন্তকাল এবং দক্ষিণ গোলার্ধে শরৎকাল (চিত্র ১৫)।

পৃথিবীর গতি

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

আহ্নিক গতি: পৃথিবী এর নিজ অক্ষরেখার চারদিকে ২৪ ঘণ্টা বা একদিনে এক বার ঘুরে আসে। পৃথিবীর এই গতিকে আহ্নিক গতি বলে। আহ্নিক গতির ফলে দিনরাত্রি সংঘটিত হয়, তাপমাত্রার তারতম্য হয়, সমুদ্রস্রোত, জোয়ার-ভাঁটা ও বায়ুপ্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়।

বার্ষিক গতি: পৃথিবী একটি নির্দিষ্ট পথে সূর্যের চারদিকে বছরে এক বার পরিক্রমণ করে। পৃথিবীর এই গতিকে বলা হয় বার্ষিক গতি। বার্ষিক গতির ফলে দিনরাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে ও ঋতু পরিবর্তিত হয়।

ঋতু: তাপমাত্রার পার্থক্য অনুসারে সারা বছরকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এ প্রতিটি ভাগকে একটি ঋতু বলা হয়। ঋতু চারটি- গ্রীষ্মকাল, শরৎকাল, শীতকাল ও বসন্তকাল।

ঋতু পরিবর্তন: প্রধানত তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে ঋতু পরিবর্তিত হয়। সূর্যের তাপের পার্থক্য, পৃথিবীর গোল আকার, পৃথিবীর আবর্তন ইত্যাদি কারণে ঋতু পরিবর্তিত হয়।

অনুসূর ও অপসূর: জানুয়ারির ১লা থেকে ৩রা তারিখে পৃথিবী সূর্য থেকে সবচেয়ে কম দূরত্বে অবস্থান করে, পৃথিবীর এই অবস্থানকে অনুসূর বলে। আবার জুলাই মাসের ১লা থেকে ৪ঠা তারিখে সূর্য থেকে পৃথিবী সবচেয়ে বেশি দূরত্বে অবস্থান করে। এই অবস্থানকে পৃথিবীর অপসূর বলে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। পৃথিবীর আহ্নিক গতি কোথায় প্রায় শূন্যের কাছাকাছি?

i. উত্তর মেরুতে
ii. দক্ষিণ মেরুতে
iii. নিরক্ষরেখায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii — খ. ii এবং iii
গ. i এবং iii — ঘ. i, ii এবং iii

নিচের চিত্রের ভিত্তিতে ২ থেকে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
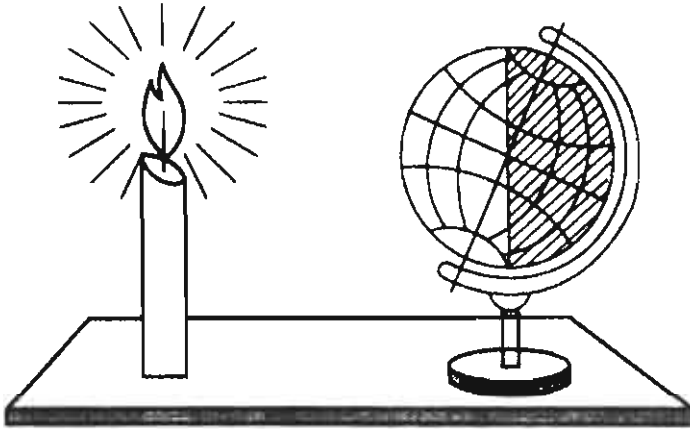
২। প্রদত্ত চিত্রটি দিয়ে কী বুঝানো হয়েছে?

ক. ঋতু পরিবর্তন — খ. দিনরাত্রি সংগঠন
গ. দিনরাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি — ঘ. পৃথিবীর আবর্তন

৩। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে–

ক. দিনরাত্রি সমান — খ. দিনরাত্রির ব্যবধান সামান্য
গ. একটানা ছয় মাস রাত — ঘ. দিন ও রাতের উত্তাপের বিরাট পার্থক্য

৪। বছরের কোন দিনটিকে শারদ বিষুব বলা হয়?

ক. ২১শে মার্চ
খ. ২১শে জুন
গ. ২৩শে সেপ্টেম্বর
ঘ. ২১শে ডিসেম্বর

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচে প্রদত্ত চিত্র অবলম্বন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
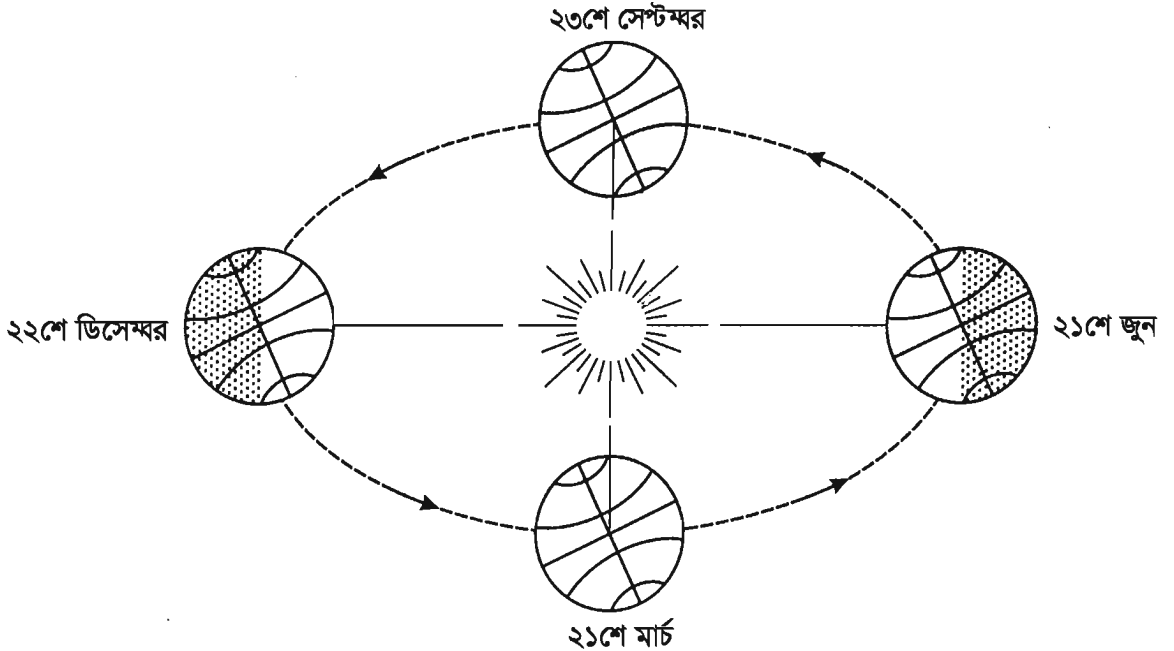
ক. উপরের চিত্রটি কীসের?

খ. ২২শে ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধে সবচেয়ে বড় দিন কেন?

গ. প্রদত্ত চিত্রের ৪টি অবস্থান থেকে বার্ষিক গতির প্রমাণ দাও।

ঘ. ঋতু পরিবর্তন বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে কীরূপ প্রভাব বিস্তার করে তা ব্যাখ্যা কর।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রাকৃতিক ভূগোল

অবতরণিকা

ভূত্বকের উপরিভাগে কার্যরত বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশে যে ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তাই প্রাকৃতি ভূগোলের আওতাভুক্ত। প্রাকৃতিক ভূগোলের বিষয়বস্তুসমূহকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অশ্মমণ্ডল বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডল। এদের প্রত্যেকেই পৃথক গুণাবলির হলেও একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। তা ছাড়া, এ একত্রে জীবমণ্ডলকে টিকিয়ে রেখেছে। অশ্মমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডল পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত এবং জীবমণ্ডল তিন ধরনের পরিবেশ থেকে নেওয়া উপাদানের ওপর গড়ে উঠেছে (চিত্র ১৬)। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। মানু কৃষিকাজের জন্য শিলাস্তর ব্যবহার করছে; সেচকাজের জন্য নদী বা জলাশয়ের (যা বারিমণ্ডলের আওতাভুক্ত পানির ওপর নির্ভর করে। আবার, কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সৌরতাপের (যা বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত) প্রয়োজন হয় অশ্মমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডল পর্যায়ক্রমে বর্ণনা করা হল।
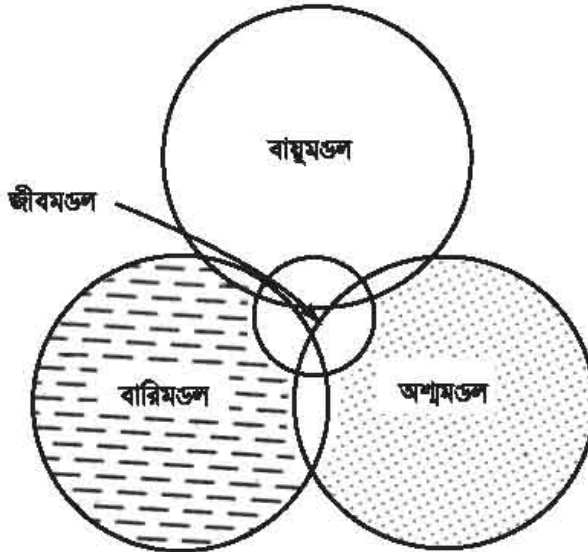
চিত্র ১৬ : অশ্মমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডলের সম্পর্ক

প্রথম অধ্যায়

অশ্মমণ্ডল

LITHOSPHERE

ভূত্বক ও ভূঅভ্যন্তর: পৃথিবী প্রায় একটি গোলকের ন্যায়। এর ব্যাসার্ধ আনুমানিক ৬,৪০০ কিলোমিটার। ভূপৃষ্ঠের কঠিন বহিরাবরণ ভেদ করে ভূঅভ্যন্তরের এত গভীরে সরাসরি পর্যবেক্ষণের কোনো সুযোগ নেই। ভূবিজ্ঞানীরা ভূঅভ্যন্তরে সংঘটিত ভূকম্পন তরঙ্গের গতি প্রকৃতি, মাধ্যাকর্ষণ ও চুম্বক ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ভূঅভ্যন্তরের গঠন কাঠামো ও উপাদান সম্পর্কে ধারণা লাভ করেন। পৃথিবীব্যাপী সংগৃহীত এ সমস্ত তথ্যের ভিত্তিতে পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে এর কেন্দ্র পর্যন্ত ৩টি স্তরে ভাগ করা হয়। এগুলো হল- (ক) ভূত্বক, (খ) গুরুমণ্ডল ও (গ) কেন্দ্রমণ্ডল।

(ক) ভূত্বক (Earth's Crust): ভূপৃষ্ঠে শিলার যে কঠিন বহিরাবরণ দেখা যায় তাই ভূত্বক (চিত্র ১৭ লক্ষ কর)। ভূঅভ্যন্তরের অন্যান্য স্তরের তুলনায় ভূত্বকের পুরুত্ব সবচেয়ে কম; গড়ে ২০ কিলোমিটার। ভূত্বক মহাদেশের তলদেশে গড়ে ৩৫ কিলোমিটার এবং সমুদ্র তলদেশে তা গড়ে মাত্র ৫ কিলোমিটার পুরু। সাধারণভাবে মহাদেশীয় ভূত্বকের এ স্তরকে সিয়াল (Sial) স্তর বলে, যা সিলিকন (Si) ও অ্যালুমিনিয়াম (Al) দ্বারা গঠিত। অপরদিকে, সমুদ্র তলদেশের ভূত্বক প্রধানত ব্যাসল্ট জাতীয় শিলায় গঠিত, যা সিয়াল স্তরের তুলনায় ভারি এবং এর প্রধান খনিজ উপাদানের নাম সিলিকন (Si) এবং ম্যাগনেসিয়াম (Mg) যা সাধারণভাবে সিমা (Sima) নামে পরিচিত। অনুমান করা হয় যে, এ ব্যাসল্ট স্তরই সারা পৃথিবী জুড়ে বহিরাবরণ হিসেবে মহাদেশের সিয়াল স্তরের নিচে ও গভীর সমুদ্র তলদেশে বিদ্যমান। ভূত্বকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ে।

চিত্র ১৭ : ভূঅভ্যন্তরের গঠন কাঠামোর আড়াআড়ি চিত্র
উৎস : Trabuck and Lutgens (1994)

(খ) গুরুমণ্ডল (Barysphere): ভূত্বকের নিচের স্তরই গুরুমণ্ডল। তবে ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের মাঝে একটি অত্যন্ত পাতলা স্তর আছে। সাবেক যুগোস্লাভিয়ার ভূবিজ্ঞানী মোহোরোভিসিক ১৯০৯ সালে ভূত্বক ও গুরুমণ্ডল পৃথককারী এ স্তরটি আবিষ্কার করেন। তাঁর নামানুসারে এ স্তরটি মোহোবিচ্ছেদ নামে পরিচিত। গুরুমণ্ডলীয় স্তরটি প্রায় ২,৮৮৫ কিলোমিটার পুরু যা মোহোবিচ্ছেদ থেকে নিচের বহিঃকেন্দ্রমণ্ডল পর্যন্ত বিস্তৃত (চিত্র ১৮)। গুরুমণ্ডলের উর্ধ্বাংশের শিলা কঠিন ও ভঙ্গুর যা প্রায় ১০০ কিলোমিটার গভীর। ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের উর্ধ্বাংশ ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পুরু এ স্তরকে একত্রে শিলামণ্ডল বা অশ্মমণ্ডল বলে।

গুরুমণ্ডলের কঠিন উর্ধ্বাংশের নিচের শিলা গলনাঙ্কের কাছাকাছি হওয়ায় আংশিক নরম অবস্থায় আছে, যা প্রায় ৩০০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এ স্তরের নাম নমনীয়মণ্ডল (Asthenosphere)। কঠিন শিলামণ্ডল নমনীয়মণ্ডলের ওপর ধীরে চলতে পারে। উর্ধ্ব গুরুমণ্ডল প্রধানত লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ সিলিকেট খনিজ দ্বারা গঠিত। অনুমান করা হয় গুরুমণ্ডলের নিম্নভাগ (৭০০-২,৮৮৫ কিলোমিটার) আয়রন অক্সাইড (FeO), ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড (MgO) এবং সিলিকন ডাইঅক্সাইড (SiO_2) খনিজ সংমিশ্রণে গঠিত। গুরুমণ্ডলের ১০০ কিলোমিটার গভীরতায়

আনুমানিক তাপমাত্রা ১,১০০° থেকে ১,২০০° সেলসিয়াস ও ৭০০ কিলোমিটার গভীরতায় তা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ১,৯০০° সেলসিয়াস এবং বহিঃকেন্দ্রমণ্ডলের সীমানায় প্রায় ৩,০০০° সেলসিয়াস এর কাছাকাছি।
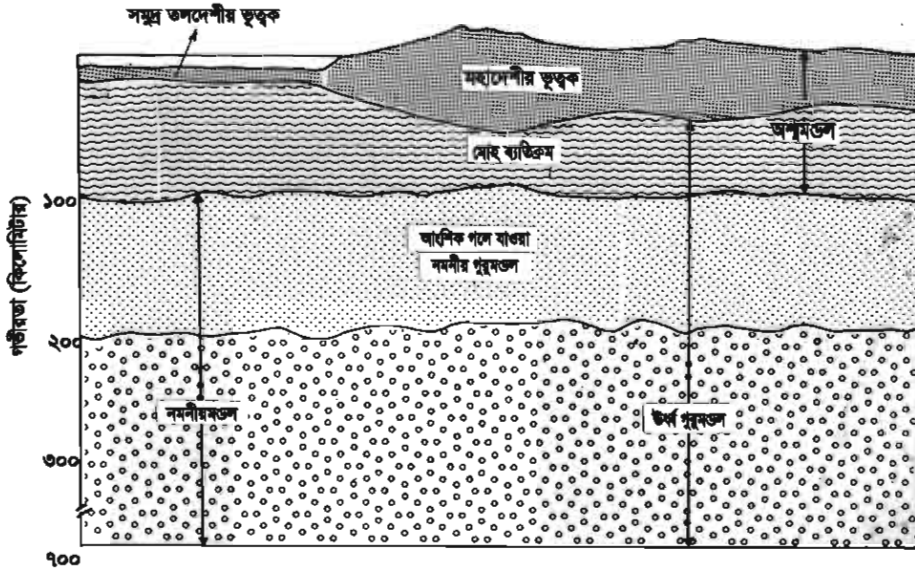
চিত্র ১৮ : নমনীয়মণ্ডল, অশ্মমণ্ডল ও মোহোবিচ্ছেদের অবস্থান

(গ) কেন্দ্রমণ্ডল (Centrosphere): গুরুমণ্ডলের নিম্নভাগ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে কেন্দ্রমণ্ডল বলে। এ স্তর প্রায় ৩,৪৮৬ কিলোমিটার পুরু (চিত্র ১৭)। কেন্দ্রমণ্ডল পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় ১৬ ভাগ এবং এর ওজনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। এ স্তরের চাপ পৃথিবীপৃষ্ঠের বায়ুচাপের চেয়ে কয়েক লক্ষ গুণ বেশি এবং তাপমাত্রা প্রায় ৩,০০০° থেকে ৫,০০০° সেলসিয়াস। ভূকম্পন তরঙ্গের সাহায্যে জানা গেছে যে, কেন্দ্রমণ্ডলের একটি তরল বহিরাবরণ আছে, যা প্রায় ২,২৭০ কিলোমিটার পুরু এবং একটি কঠিন অন্তঃভাগ আছে, যা ১,২১৬ কিলোমিটার পুরু। কেন্দ্রমণ্ডলের প্রধান দুইটি উপাদান লোহা (Fe) এবং নিকেল (Ni)। যা নিফে (NiFe) নামে পরিচিত।

অশ্মমণ্ডল

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

ভূত্বক ও ভূঅভ্যন্তর: ভূত্বক ও ভূঅভ্যন্তর যে শিলামণ্ডল নিয়ে গঠিত তাকে তিনটি স্তরে ভাগ করা হয়। এগুলো হল- (ক) ভূত্বক, (খ) গুরুমণ্ডল ও (গ) কেন্দ্রমণ্ডল।

ভূত্বক: ভূত্বক মহাদেশের তলদেশে গড়ে ৩৫ কিলোমিটার এবং সমুদ্র তলদেশে তা গড়ে মাত্র ৫ কিলোমিটার পুরু। ভূত্বকের ওপরের স্তরটির নাম সিয়াল। মহাদেশগুলো প্রধানত সিয়াল শিলাস্তরে গঠিত।

গুরুমণ্ডল ও অশ্মমণ্ডল: ভূত্বকের নিচের স্তরকে গুরুমণ্ডল বলে। এই স্তরটি প্রায় ২,৮৮৫ কিলোমিটার পুরু। ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের উর্ধ্বাংশ ১০০ কিলোমিটার পর্যন্ত পুরু এ স্তরকে একত্রে শিলামণ্ডল বা অশ্মমণ্ডল বলে।

কেন্দ্রমণ্ডল: গুরুমণ্ডলের নিম্নভাগ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরকে কেন্দ্রমণ্ডল বলে। এ স্তর প্রায় ৩,৪৮৬ কিলোমিটার পুরু।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর এবং ১ থেকে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
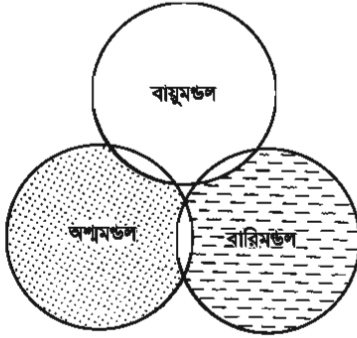
১। উদ্ভিদ ও প্রাণীর বসবাসের জন্য উপরের চিত্র অনুযায়ী নিচের কোন উক্তিটি গ্রহণযোগ্য?

ক. অশ্মমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল ও বারিমণ্ডলের ভিন্নতা
খ. অশ্মমণ্ডল বারিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পৃক্ত
গ. বায়ুমণ্ডল বারিমণ্ডলের সঙ্গে সম্পৃক্ত
ঘ. অশ্মমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও বায়ুমণ্ডল পরস্পর সম্পৃক্ত

২। চিত্রে প্রদর্শিত অশ্মমণ্ডল, বায়ুমণ্ডল এবং বারিমণ্ডলে একটি অভিন্ন উপাদান পরিলক্ষিত হয় তা হল–

ক. অক্সিজেন
খ. নাইট্রোজেন
গ. লোহা
ঘ. নিকেল

৩। ভূত্বকের নিচে প্রতি কিলোমিটারে কত ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা বাড়ে?

ক. ৩০°
খ. ৪০°
গ. ৫০°
ঘ. ৬০°

৪। পৃথিবীর কেন্দ্রে রয়েছে–

i. কেন্দ্রমণ্ডল
ii. লোহা ও নিকেল
iii. প্রচণ্ড উত্তাপ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii
খ. ii এবং iii
গ. i এবং iii
ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। পৃথিবীর সৃষ্টি সূর্য থেকে। সূর্যের একটি বিচ্ছিন্ন অংশ কালক্রমে তাপ বিকিরণ করে বর্তমান পৃথিবীর আকার ধারণ করেছে। পৃথিবীর ভূঅভ্যন্তর ভাগের তাপমাত্রা এখন পর্যন্ত সূর্যের তাপমাত্রার কাছাকাছি রয়েছে। কিন্তু এর বহিরাবরণ কালক্রমে শীতল ও কঠিন আকার ধারণ করেছে। ভূপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত গঠনগত ও উপাদানগুলোর মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

ক. ভূত্বক কাকে বলে?
খ. ভূত্বক কেন কঠিন আকার ধারণ করেছে?
গ. ভূপৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত গঠনগত ভিন্নতা চিত্র অঙ্কন করে দেখাও।
ঘ. পৃথিবীর উপরিভাগ থেকে কেন্দ্র পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের উপাদানগুলো কেন ভিন্ন? ব্যাখ্যা কর।

শিলা ও খনিজ

ROCKS AND MINERALS

ভূপৃষ্ঠের বহিরাবরণ ভূত্বক নামে পরিচিত। ভূত্বক মূলত বিভিন্ন খনিজের মিশ্রণে শিলা দ্বারা গঠিত। ভূত্বক গঠনকারী এ খনিজ পদার্থ আমাদের বিভিন্ন প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে। যেমন, জ্বালানি হিসেবে খনিজ তেল ও কয়লা ব্যবহার হয়। সোনা, তামা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, নিকেল, লোহা ইত্যাদি বহু ধরনের খনিজের অর্থনৈতিক ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

পৃথিবীতে কার্যরত বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রক্রিয়া, যেমন অগ্ন্যুৎপাত, সঞ্চয়, ক্ষয়কাজ ইত্যাদি শিলা ও খনিজের ধরন দ্বারা প্রভাবিত হয়। ভূত্বক গঠনকারী উপাদান হিসেবে খনিজ ও শিলা সম্পর্কে তাই ধারণা লাভ করা প্রয়োজন।

প্রথমেই জানা যাক, খনিজ বলতে কী বোঝায়? শিলা ও খনিজের মধ্যে পার্থক্য কী?

খনিজ দুই বা ততোধিক মৌলের সমন্বয়ে গঠিত। তবে কিছু কিছু খনিজ একটি মাত্র মৌল দ্বারাও গঠিত হতে পারে। যেমন, হীরা, সোনা, তামা, রুপা, পারদ ও গন্ধক। এর মধ্যে হীরার কাঠিন্য সর্বোচ্চ এবং টেলক–এর কাঠিন্য সর্বনিম্ন।

অপরদিকে, শিলা এক বা একাধিক খনিজের মিশ্রণ। এখানে খনিজের মিশ্রণ বলা হচ্ছে এ কারণে যে, প্রকৃতিতে খনিজ মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। শিলা গঠনকারী প্রতিটি খনিজের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। যদিও বেশিরভাগ শিলাই একাধিক খনিজ দ্বারা গঠিত হয়। সে ক্ষেত্রে খনিজ এবং শিলা একই পদার্থ। যেমন, ক্যালসাইট একটি খনিজ এবং শিলা হিসেবে এটি চুনাপাথর নামে পরিচিত। খনিজের ধর্ম এর গঠনকারী মৌলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অপরদিকে শিলার ধর্ম এর গঠনকারী খনিজ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

শিলা পরিবার: উৎপত্তি অনুযায়ী ভূত্বকের শিলা তিন ধরনের। যথা- আগ্নেয়, পাললিক ও রূপান্তরিত শিলা। আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা ভূঅভ্যন্তরের প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টি হয়। অপরদিকে, পাললিক শিলা ভূপৃষ্ঠে কার্যরত প্রক্রিয়ার কারণে সৃষ্টি হয়। যদিও এ শিলাসমূহের উৎপত্তির ধরন ভিন্ন ভিন্ন, তবুও একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আগ্নেয় শিলা (Igneous Rock): আগ্নেয় শিলা দুই ধরনের পরিবেশে সৃষ্টি হতে পারে, উদ্‌বেধী (Intrusive) ও নিঃসারী (Extrusive)। ভূঅভ্যন্তরের ম্যাগমা শীতল ও কেলাসিত হয়ে উদ্‌বেধী আগ্নেয় শিলার উৎপত্তি হয়। ম্যাগমা ভূত্বকের ফাটল দিয়ে ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসলে তাকে লাভা বলে। এ লাভা শীতল হয়ে নিঃসারী আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি হয়।

উদ্‌বেধী আগ্নেয় শিলা আবার পাতালিক ও উপপাতালিকে বিভক্ত। নিঃসারী শিলাও দুইটি উপবিভাগে বিভক্ত- বিস্ফোরক ও শান্ত। পাতালিক শিলায় ম্যাগমা ভূঅভ্যন্তরের গভীরে জমাট বাঁধে। গ্রানাইট, গ্যাব্রো, সায়েনাইট, ডায়োরাইট প্রভৃতি পাতালিক শিলার উদাহরণ। উপপাতালিক শিলায় ম্যাগমা অগভীর অভ্যন্তরে সৃষ্টি হয়, যেমন পরফাইরি।

ম্যাগমা ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়ে জমাট বেঁধে যে শিলার সৃষ্টি হয় তাকে বিস্ফোরক আগ্নেয় শিলা বলে। যেমন, টাফ ও ব্রেসিয়া। শান্ত প্রকৃতির নিঃসারী শিলায় ম্যাগমা নিঃশব্দে উপচে পড়ে এবং চারদিকে বিস্তৃতভাবে জমাট বাঁধে। রায়োলাইট, ব্যাসল্ট, অ্যান্ডেসাইট এ জাতীয় শিলার উদাহরণ।
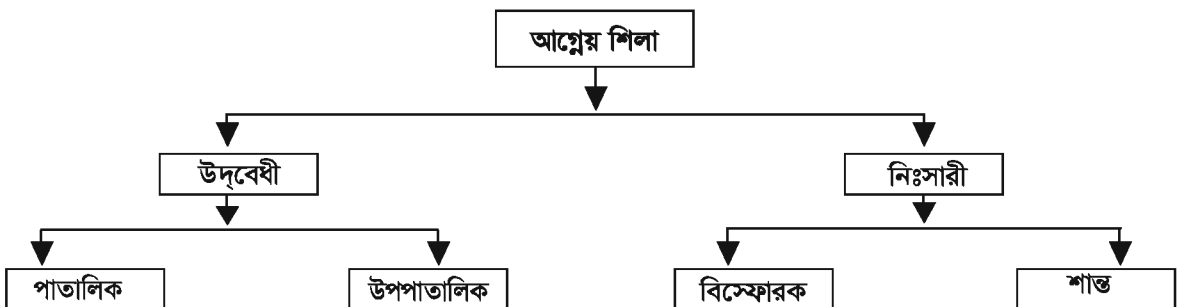
ভূঅভ্যন্তরে সৃষ্ট আগ্নেয় শিলার মধ্যে ব্যাথোলিথ, ল্যাকোলিথ, ডাইক, সিল অন্যতম (চিত্র ১৯)।
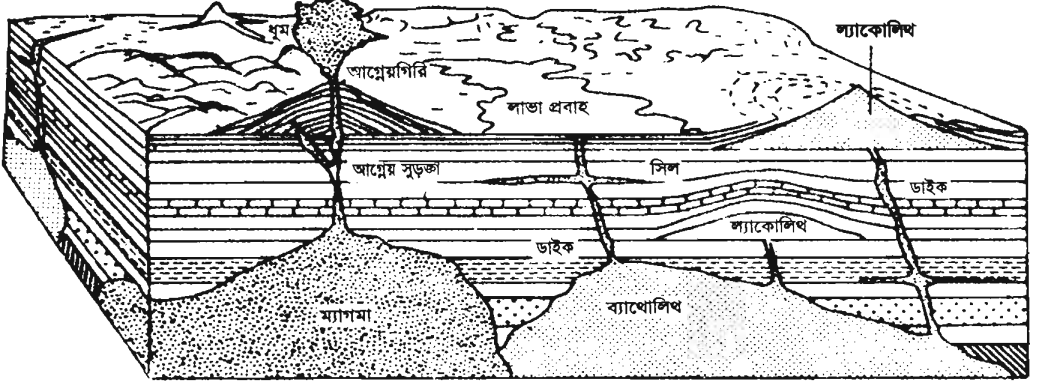
চিত্র ১৯ : আগ্নেয়জাত শিলা

পাললিক শিলা (Sedimentary Rock): পলি সঞ্চিত হয়ে যে শিলা গঠন করে তা পাললিক শিলা। এ শিলায় পলি সাধারণত স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। পাললিক শিলা ভূত্বকের মোট আয়তনের শতকরা ৫ ভাগ (আয়তনে) দখল করে আছে। তবে মহাদেশীয় ভূত্বকের উন্মুক্ত অংশের প্রায় ৭৫ ভাগই পাললিক শিলায় গঠিত।

পলির উৎস ও পলির ধরন: ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন ধরনের যান্ত্রিক ও রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া কাজ করে। এ সমস্ত প্রক্রিয়ার কার্যকরণের ফলে ভূপৃষ্ঠে বহিরাবরণ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এ ক্ষয়িত পদার্থসমূহই পলি নামে পরিচিত। যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয় প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট চূর্ণ (Detrital) পলি থেকে যে পাললিক শিলার সৃষ্টি হয় তাকে যান্ত্রিক পাললিক শিলা বলে। যেমন, কর্দম, বেলেপাথর, নুড়িপাথর, যান্ত্রিক পাললিক শিলার উদাহরণ। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পলি থেকে যে পাললিক শিলার উদ্ভব হয় তাকে রাসায়নিক পাললিক শিলা বলে। এ প্রক্রিয়ায় পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা পদার্থসমূহ বিভিন্ন অজৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরাসরি তলায় থিতায় এবং পরিশেষে জমাটবদ্ধ হয়। যেমন, কোথাও আটকে পড়া সমদ্রের পানি বাষ্পায়িত হয়ে গেলে এর সঙ্গে দ্রবীভূত লবণ থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে বাষ্পায়ন একটি অজৈব প্রক্রিয়া এবং থিতানো লবণকে পলি হিসেবে ধরা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে, উদ্ভিদ ও পানিতে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণীর দেহাবশেষ জৈব পলি হিসেবে জমা হয় এবং শেষে তা জমাটবন্ধ হয়ে জৈবিক পাললিক শিলায় পরিণত হয়। যেমন, কয়লা ও চুনাপাথর এর অন্যতম উদাহরণ। তা ছাড়া ডোলোমাইট, চার্ট, জিপসাম এসবই রাসায়নিক পাললিক শিলা।

পাললিক শিলার শ্রেণীবিভাগ: পাললিক শিলা প্রধানত তিন প্রকার। যথা– যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈবিক। সারণি ১ এ পাললিক শিলার পলির উপাদানসহ নাম দেওয়া হল।

সারণি ১ : পাললিক শিলার শ্রেণীবিভাগ

উৎস	পলির উপাদান	শিলার নাম
যান্ত্রিক উপায়ে গঠিত	দানা বা তার চেয়ে বড়	নুড়িপাথর
	বালি	বেলেপাথর
	পলি	পলিপাথর
	কর্দম	কর্দমপাথর
রাসায়নিক উপায়ে গঠিত	ক্যালসাইট	চুনাপাথর
	ডোলোমাইট	ডোলোমাইট
	হেলাইট	লবণ
	জিপসাম	জিপসাম
জৈবিক উপায়ে গঠিত	চুন	চুনাপাথর, চক, কোকিনা
	সিলিকন ডাইঅক্সাইড জাতীয় ডায়াটম	ডায়াটম
	উদ্ভিজ পদার্থ	কয়লা

পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য: পাললিক শিলায় স্তরায়ন (Bedding), তরঙ্গ ছাপ (Ripple mark), কর্দম ফাটল প্রভৃতি দেখা যায় (চিত্র ২০)। জীবাশ্মের উপস্থিতি এই শিলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

চিত্র ২০ : পাললিক শিলার স্তরায়ন

রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rock): কোনো শিলায় তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর খনিজ উপাদান ও বুনটের পরিবর্তন হয়ে যে নতুন শিলার সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে। আগ্নেয় বা পাললিক শিলা পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপান্তরিত শিলার সৃষ্টি হয়।

রূপান্তর মাধ্যম: শিলার রূপান্তর সাধনে তাপ, চাপ ও রাসায়নিকভাবে সক্রিয় তরল পদার্থ কখনও আলাদাভাবে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে একত্রে কাজ করে। এ সমস্ত রূপান্তর মাধ্যম শিলার ভেতরের ঘনত্ব ও স্ফটিকের আয়তন বাড়িয়ে দেয় এবং সুস্পষ্ট পত্রায়ন (Foliation) সৃষ্টি করে। শিলার তাপ ও চাপের ফলে এর খনিজসমূহ পাতার ন্যায় চ্যাপ্টা হয়ে সমান্তরালভাবে বিন্যস্ত হয়। শিলার খনিজ বিন্যাসের এ গুণাবলিকে পত্রায়ন বলে (চিত্র ২১)।
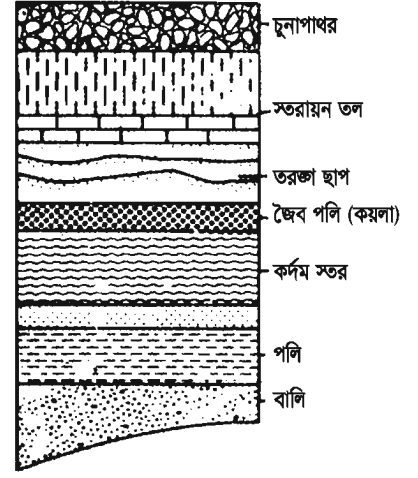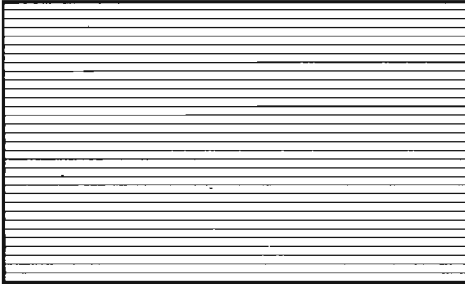
পত্রায়নের পূর্বে
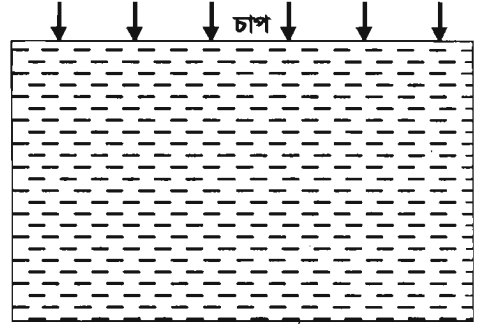
পত্রায়িত রূপ

চিত্র ২১ : পত্রায়ন গঠন

প্রধান রূপান্তরিত শিলাসমূহের উদাহরণ :

পত্রায়ন বিশিষ্ট শিলা

স্লেট: শেল থেকে স্লেট–এর সৃষ্টি হয়। এ অত্যন্ত সূক্ষ্ম দানা বিশিষ্ট পত্রায়িত শিলা যা মূলত ক্ষুদ্র মাইকা ফলক দ্বারা গঠিত। লেখার স্লেট, ব্লাকবোর্ড ইত্যাদি বানাতে স্লেট ব্যবহৃত হয়।

অপত্রায়ন শিলা

মার্বেল: বড় দানা বিশিষ্ট, কেলাসিত শিলা যা চুনাপাথর বা ডোলোমাইট থেকে সৃষ্টি হয়।

কোয়ার্টজাইট: এ অত্যন্ত কঠিন রূপান্তরিত শিলা। প্রধানত কোয়ার্টজ, বেলেপাথর থেকে সৃষ্টি হয়।

শিলা

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

উৎপত্তি অনুসারে শিলাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা– (১) আগ্নেয় শিলা, (২) পাললিক শিলা ও (৩) রূপান্তরিত বা পরিবর্তিত শিলা।

ভূগর্ভস্থ গরম তরল পদার্থগুলোকে ম্যাগমা (Magma) বলে। এগুলো ভূপৃষ্ঠের ওপর উঠে এলে তাকে লাভা (Lava) বলে।

আগ্নেয় শিলা: ম্যাগমা (Magma) শীতল হয়ে কঠিনাকার ধারণ করলে আগ্নেয় শিলা হয়। আগ্নেয় শিলা দ্বারা ভূমিরূপ গঠনে অনেক বৈচিত্র্য দেখা যায়; উদাহরণ ডাইক (Dike), সিল, ল্যাকোলিথ, ব্যাথোলিথ প্রভৃতি।

পাললিক শিলা: পলি সঞ্চিত হয়ে যে শিলা গঠিত হয় তাকে পাললিক শিলা বলে। এ শিলায় পলি সাধারণত স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। চুনাপাথর, কয়লা, জিপসাম পাললিক শিলার উদাহরণ।

রূপান্তরিত শিলা: কোনো শিলায় তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এর খনিজ উপাদান ও বুনটের পরিবর্তন হয়ে যে নতুন শিলার সৃষ্টি হয় তাকে রূপান্তরিত শিলা বলে। আগ্নেয় বা পাললিক শিলা পরিবর্তনের মাধ্যমে রূপান্তরিত শিলা সৃষ্টি হয়।

স্লেট: শেল থেকে স্লেট–এর সৃষ্টি হয়। এটি লেখার স্লেট, ব্লাকবোর্ড ইত্যাদি বানাতে ব্যবহৃত হয়।

মার্বেল: বড় দানা বিশিষ্ট, কেলাসিত শিলা যা চুনাপাথর ও ডোলোমাইট থেকে সৃষ্টি হয়।

কোয়ার্টজাইট: এটি একটি রূপান্তরিত শিলা। প্রধানত কোয়ার্টজ, বেলেপাথর থেকে সৃষ্টি হয়।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। জৈবিক উপায়ে গঠিত পাললিক শিলা কোনটি?

ক. কর্দম ও বেলেপাথর   খ. কয়লা ও চুনাপাথর
গ. ডোলোমাইট ও জিপসাম   ঘ. ক্যালসাইট ও নিকেল

২. স্লেট কোন ধরনের শিলা?

ক. আগ্নেয়   খ. পাললিক
গ. রূপান্তরিত   ঘ. অকেলাসিত

নিচের চিত্র পর্যবেক্ষণ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। প্রদর্শিত চিত্রটির 'ক' স্থানে কোন শিলা অবস্থান করছে?

ক. বহিঃজ   খ. পাললিক
গ. রূপান্তরিত   ঘ. উপপাতালিক

৪। ম্যাগমা হল–

i. পাতালিক শিলা

ii. উপপাতালিক শিলা

iii. বহিঃজ শিলা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. iii ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। তামান্না তার বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে রূপসা ব্রিজ দেখতে এসে বান্ধবী হ্যাপিকে প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা বলতো রূপসা ব্রিজ কী দিয়ে তৈরি?' উত্তরে হ্যাপি বলল কেন, সিমেন্ট দিয়ে তৈরি। পাল্টা প্রশ্নে তামান্না বলল, সিমেন্ট কী দিয়ে তৈরি? প্রতি উত্তরে হ্যাপি জানালো সিমেন্ট চুনাপাথর থেকে তৈরি হয় এবং এটি একপ্রকার শিলা।

ক. চুনাপাথর কোন ধরনের শিলা?

খ. এ ধরনের শিলা কীভাবে গঠিত হয়?

গ. সিমেন্ট তৈরিতে ব্যবহৃত চুনাপাথরের সঙ্গে রূপান্তরিত শিলার পার্থক্য নিরূপণ কর।

ঘ. 'ভূপৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত পাললিক শিলার গঠন প্রক্রিয়া বিদ্যমান'–এর স্বপক্ষে তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর।

ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন
CHANGE OF THE EARTH'S CRUST

ভূপৃষ্ঠ সর্বদা পরিবর্তনশীল। নানা প্রকার ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন সাধন করে। যে সমস্ত কার্যাবলির কারণে প্রাকৃতিকভাবে ভূমিরূপের পরিবর্তন সাধিত হয় তা ভূপ্রক্রিয়া। যেমন, নদী অবক্ষেপণের মাধ্যমে প্লাবন ভূমি গড়ে তুলছে। এখানে নদী অবক্ষেপণ একটি প্রক্রিয়া। ভূপ্রক্রিয়া তার কার্য সাধনের জন্য নানা প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির সাহায্য নেয়। যেমন, মাধ্যাকর্ষণ, ভূতাপীয় শক্তি এবং সৌরশক্তি। এ সমস্ত শক্তির সাহায্যে ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠের কোথাও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনে, আবার কখনও খুব দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে। সাধারণভাবে বহিঃশক্তির (যেমন, সৌরশক্তি) সঙ্গে জড়িত ভূপ্রক্রিয়া ভূপৃষ্ঠে ধীর পরিবর্তন আনে। সুদীর্ঘ সময় ধরে ভূপৃষ্ঠে এই পরিবর্তন চলে বিধায় একে ধীর পরিবর্তন বলে। ধীর পরিবর্তন সাধারণত দুইটি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়। যেমন, নগ্নীভবন ও অবক্ষেপণ।

নগ্নীভবন: নগ্নীভবন অর্থ উন্মুক্ত করা। যে প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের শিলারাশি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয় এবং বিচূর্ণীত শিলা অন্যত্র অপসারিত হয় তাকে নগ্নীভবন বলে। নগ্নীভবন তিন ধরনের প্রক্রিয়ায় কাজ করে। যেমন, বিচূর্ণীভবন, ক্ষয়সাধন ও অপসারণ।

বিচূর্ণীভবন: যে প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের শিলা তুষার ও তাপ-চাপের পার্থক্যের কারণে যান্ত্রিকভাবে চূর্ণবিচূর্ণ অথবা রাসায়নিকভাবে দ্রবীভূত হয় তাকে বিচূর্ণীভবন বলে। অবশ্য জীবজন্তু দ্বারাও শিলারাশি বিশ্লিষ্ট হয়। এই প্রক্রিয়ায় বিচূর্ণীত শিলা অন্যত্র অপসারিত হয় না।

ক্ষয়সাধন: ক্ষয়সাধন ও অপসারণ প্রক্রিয়া একত্রে সম্পন্ন হয়। যে প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠের শিলারাশি নদী, বায়ু, হিমবাহ, সমুদ্রস্রোত ইত্যাদি দ্বারা ক্ষয়ীভূত হয় এবং ক্ষয়িত পদার্থসমূহ অন্যত্র অপসারিত হয় তাকে ক্ষয়ীভবন বলা হয়।

অপরদিকে অন্তঃশক্তির (যেমন, ভূমিকম্প) সঙ্গে জড়িত ভূপ্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠে দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়। নিচে ভূত্বকের পরিবর্তন সাধনকারী ভূপ্রক্রিয়াসমূহের একটি ছক দেওয়া হয়েছে। এ ছক অনুযায়ী ভূপৃষ্ঠে দ্রুত, আকস্মিক পরিবর্তন সাধনকারী প্রক্রিয়ার মধ্যে ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত অন্যতম।
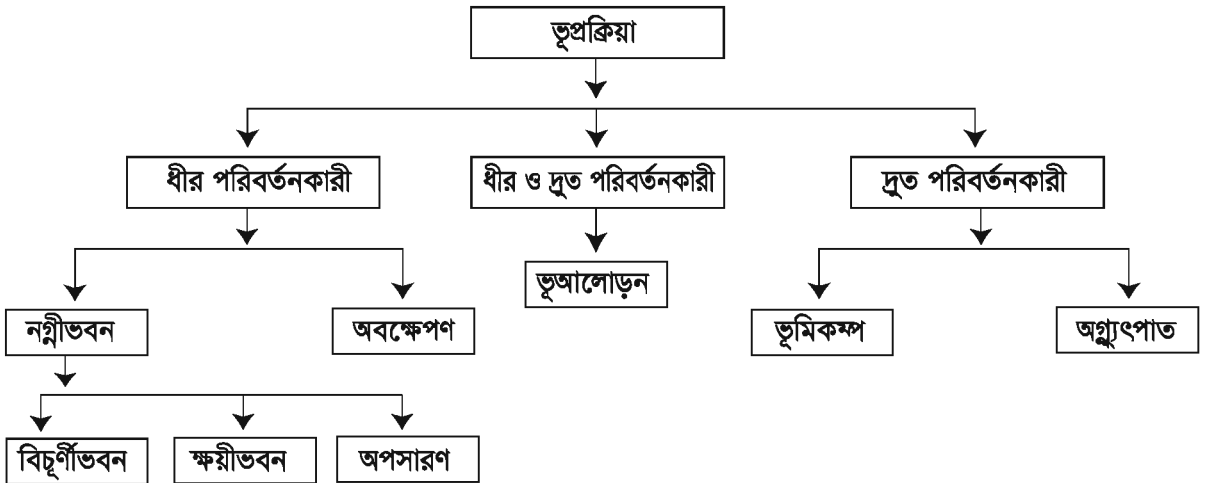
১। ভূমিকম্প (Earthquake): ভূঅভ্যন্তরে দ্রুত বিপুল শক্তি বিমুক্ত হওয়ায় পৃথিবীপৃষ্ঠে যে ঝাঁকুনি বা কম্পনের সৃষ্টি হয় তাকে ভূমিকম্প বলে। একটি শান্ত পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে ঢিলটি পানিতে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে তা পুকুরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে ভূমিকম্পের ক্ষেত্রেও ভূঅভ্যন্তরে যেখানে শক্তি বিমুক্ত হয় সেখান থেকে পানির ঢেউয়ের মতো শিলায় ঢেউ বা তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তা দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূঅভ্যন্তরে যেখানে শক্তি বিমুক্ত হয় তাকে কেন্দ্র বলে। কেন্দ্র থেকে লম্বালম্বিভাবে ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ বিন্দু উপকেন্দ্র (Epicentre) নামে

পরিচিত (চিত্র ২২)। ভূকম্পন তরঙ্গ পরিমাপের জন্য ভূকম্পলিখন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

ভূমিকম্পনের ধরন: সাধারণত ভূপৃষ্ঠের অগভীর তলদেশ ৫ কিলোমিটার থেকে প্রায় ১,১২৬ কিলোমিটার গভীর অভ্যন্তরের মধ্যেই ভূকম্পন সৃষ্টি হয়ে থাকে।

চিত্র ২২ : ভূমিকম্পের কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র

ভূকম্পন কেন্দ্রের অবস্থানের গভীরতার ভিত্তিতে কেন্দ্রকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা–

অগভীর (Shallow): ৬০ কিলোমিটার গভীরতায় ভূকম্পন সৃষ্টি হয়।

মাঝারি (Intermediate): ৬০ থেকে ৩০০ কিলোমিটার গভীরতায় ভূকম্পন সৃষ্টি হয়।

গভীর (Deep): ৩০০ কিলোমিটার–এর অধিক গভীরতায় ভূকম্পন সৃষ্টি হয়।

প্রতি বছর সারা পৃথিবীব্যাপী যে ভূকম্পন হয় তার প্রায় ৯০ ভাগই ১০০ কিলোমিটার–এর চেয়ে কম গভীরতায় সৃষ্টি হয়। যেসব শক্তিশালী ভূমিকম্প পৃথিবীতে সংঘটিত হয়েছে তার সবগুলোই অগভীর শ্রেণীভুক্ত।

ভূমিকম্পের কারণ: ভূবিজ্ঞানীগণ মনে করেন, ভিত্তিশিলা চ্যুতি বা ফাটল বরাবর আকস্মিক ভূআলোড়ন হলে ভূমিকম্প হয়। তা ছাড়া আগ্নেয়গিরির লাভা প্রচণ্ড শক্তিতে ভূঅভ্যন্তর থেকে বের হয়ে আসার সময়ও ভূমিকম্পের সৃষ্ট হয়।

ভূত্বক তাপ বিকিরণ করে সংকুচিত হলে ভূনিম্নস্থ শিলাস্তরে ভারের সামঞ্জস্য রক্ষার্থে ফাটল ও ভাঁজের সৃষ্টির ফলে ভূকম্পন অনুভূত হয়। ভূআলোড়নের ফলে ভূত্বকের কোনো স্থানে শিলা ধসে পড়লে বা শিলা চ্যুতি ঘটলে ভূমিকম্প হয়।

ভূকম্পন শক্তি: ভূমিকম্পের সময় ভূমিকম্প কেন্দ্র থেকে যে পরিমাণ শক্তি ছড়িয়ে পড়ে তাকেই ভূকম্পন শক্তি বলে। চার্লস এফ রিক্টার নামক একজন ভূকম্পনবিদ ভূকম্পন শক্তি পরিমাপের একটি গাণিতিক স্কেল ব্যবহার করেন, যা বর্তমানে রিক্টার স্কেল নামে পরিচিত।

ভূকম্পন প্রবণ এলাকা/বলয় (Earthquake Prone Area or Belt)

চিত্র ২৩ থেকে সহজেই ধারণা করা যায় যে ভূমিকম্পের প্রকোপ পৃথিবীর সর্বত্র সমান নয়। বেশিরভাগ ভূমিকম্প পৃথিবীর অল্পকিছু জায়গায় ঘটে, যা আয়তনে দীর্ঘ ও সরু। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এলাকাগুলো হল বৃত্তচাপীয় দ্বীপমালা (যেমন, ফিলিপাইন, জাপান), নবীন ভঙ্গিল পর্বত ও সামুদ্রিক শৈলশিরাসমূহ। চিত্র ২৩ অনুযায়ী ভূমিকম্পন প্রকোপ এলাকাগুলোকে তিনটি প্রধান অংশে ভাগ করা যায়।

(ক) প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশ: প্রশান্ত মহাসাগরের বহিঃসীমানা বরাবর সবচেয়ে বেশি ভূমিকম্প হয়। এ অংশের জাপান, ফিলিপাইন, চিলি, অ্যালিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা সবচেয়ে ভূকম্পন প্রবণ এলাকা হিসেবে পরিচিত।

(খ) ভূমধ্যসাগরীয়–হিমালয় অংশ: এ অংশ আল্পস পর্বত থেকে শুরু করে ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীর হয়ে ককেশাস, ইরান, হিমালয়, ইন্দোচীন ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত।

(গ) মধ্য আটলান্টিক–ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা অংশ: উত্তর–দক্ষিণ বরাবর মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা এবং ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা মিশে আফ্রিকার লোহিত সাগর বরাবর ভূমধ্যসাগরীয় অংশের সঙ্গে মিলেছে।

এ তিনটি প্রধান বলয় ছাড়াও বিচ্ছিন্নভাবে মহাদেশের অভ্যন্তরে এবং মহাসাগরের খাতেও কিছু কিছু অংশে ভূমিকম্পের প্রকোপ দেখা যায়।

চিত্র ২৩ : ভূমিকম্প প্রবণ এলাকার বণ্টন

ভূমিকম্পের ফলাফল: ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে স্বীকৃত। এ প্রায়ই পৃথিবীর কোনো অংশে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদের ক্ষতির কারণ হয়।

সাধারণভাবে বলা যায় ভূমিকম্পের ধ্বংসাত্মক শক্তি ভূপৃষ্ঠের নিম্নলিখিত ক্ষতি ও পরিবর্তন সাধন করে।

(ক) ভূমিকম্পের ফলে ভূমিরূপের কোথাও ভাঁজ, ফাটল বা ধসের সৃষ্টি হয়। নদীর গতিপথ পাল্টে যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ১৭৮৭ সালে আসামে যে ব্যাপক ভূমিকম্প হয় তাতে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তলদেশ কিছুটা উঁচু হয়ে যায়। ফলে নদটি তার গতিপথ পাল্টে বর্তমানে যমুনা নদী দিয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে।

(খ) ভূমিকম্প কোনো জনবহুল এলাকায় হলে তা ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, পানি, গ্যাস সরবরাহ ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে। তা ছাড়া এলাকাটি পাহাড়ি হলে তা পাদদেশের লোকালয়ে কাদার ধস, ভূমিধস/শিলাধসের সৃষ্টি করে যা ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

(গ) ভূকম্পন সমুদ্র তলদেশে হলে তা পানিতে বিশাল ঢেউয়ের সৃষ্টি করে। ভূকম্পনে সৃষ্ট এ সমুদ্র ঢেউ সুনামী (Tsunami) নামে পরিচিত। সুনামী উপকূলীয় শহর ও অন্যান্য লোকালয়ে আকস্মিক ব্যাপক বন্যার সৃষ্টি করে।

২। অগ্ন্যুৎপাত (Eruption): ভূপৃষ্ঠে পরিবর্তন সাধনকারী প্রক্রিয়া/শক্তিগুলোর মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত অন্যতম। আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণ বা ম্যাগমাই ভূপৃষ্ঠের আগ্নেয় শিলার প্রধান উৎস। আগ্নেয়গিরি অভ্যন্তরের শক্তির কারণে বিভিন্ন ভূমিরূপের সৃষ্টি করে যাকে আদি (Initial) ভূমিরূপ বলা যায়। এ সমস্ত আদি ভূমিরূপে তাৎক্ষণিকভাবে নানা ধরনের বাহ্যিক প্রক্রিয়া ক্ষয়কাজ করতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তা সমতল ভূমিতে পরিণত করে। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ভূঅভ্যন্তরের শক্তি এবং বহিঃশক্তির ভারসাম্যতা বজায় রাখার বিরামহীন চেষ্টা চলছে।

আগ্নেয়গিরি (Volcano)

ভূঅভ্যন্তরের তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে বের হওয়া প্রচণ্ড উত্তাপ অশ্মমণ্ডলীয় শিলার নিম্নভাগ গলিয়ে ম্যাগমার সৃষ্টি করে। ভূঅভ্যন্তরের এ গলিত শিলা অশ্মমণ্ডলের ফাটল বা দুর্বল অংশ ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে উদ্‌গিরণ হয়। এ উদ্‌গিরিত পদার্থকে লাভা বলে। এ লাভা ক্রমাগত ফাটল বা উদ্‌গিরণ মুখের চারদিকে জমা হয়ে যে উঁচু ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয়গিরি বলে (চিত্র ২৪)।

আগ্নেয়গিরির চূড়ায় অবস্থিত খাড়া পাড় বিশিষ্ট ফাটল বা উদ্‌গিরণ মুখকে জ্বালামুখ বলে। এ জ্বালামুখ ভূঅভ্যন্তরের গলিত শিলা ভান্ডারের সঙ্গে ফাটল/সুড়ঙ্গ দ্বারা সরাসরি যুক্ত। গলিত শিলা কখনও ভূপৃষ্ঠে উদ্‌গিরণের পরিবর্তে তলদেশেই জমাট বেঁধে যায়। আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণ শেষে জ্বালামুখ ধসে পড়ে যে গর্তের সৃষ্টি করে তাকে ক্যালডেরা বলে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন রাজ্যের ক্রেটার হ্রদ একটি ক্যালডেরা। যে আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাকে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি বলে। বর্তমানে পৃথিবীতে সক্রিয় আগ্নেয়গিরির সংখ্যা প্রায় ৮৫০টি। অগ্ন্যুৎপাত সাময়িককালের জন্য বন্ধ থাকলে তা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি এবং অগ্ন্যুৎপাত স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেলে তাকে মৃত আগ্নেয়গিরি বলে।
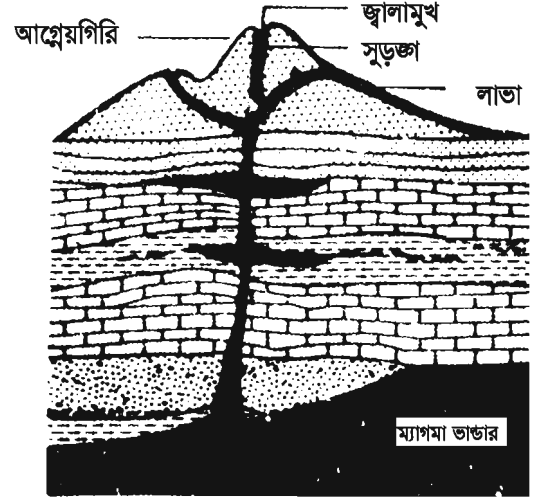
চিত্র ২৪ : আগ্নেয়গিরি

অগ্ন্যুৎপাতজাত পদার্থ: আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরিত লাভায় প্রচুর পরিমাণে শিলা টুকরা, লাভা বিস্ফোরক, সূক্ষ্ম ভস্ম ও ধূলিকণা থাকে। তা ছাড়া উদ্‌গিরণের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ গ্যাসও বের হয়ে আসে। আগ্নেয়গিরি প্রথম পর্যায়ে ব্যাসল্ট জাতীয় লাভা, পরে অ্যান্ডেসাইট এবং শেষে শিলা টুকরা উদ্‌গিরণ করে।

আগ্নেয়গিরির প্রকারভেদ: প্রতিটি আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরণ প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন হলেও আগ্নেয়গিরি বিশারদগণ আকার, আকৃতি ও উদ্‌গিরণ প্রকৃতির ভিত্তিতে সব আগ্নেয়গিরিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেন। যথা– শিল্ড আগ্নেয়গিরি, সিনডার কোণ ও মিশ্র কোণ।

শিল্ড আগ্নেয়গিরি: এ জাতীয় আগ্নেয়গিরি প্রধানত ব্যাসল্ট লাভায় গঠিত। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি মনালোয়া, কিলাউয়া এর অন্যতম উদাহরণ। মনালোয়া সমুদ্র তলদেশে প্রায় ৫,০০০ মিটার চওড়া এবং সমুদ্রের ওপরে ৪,১৭০ মিটার উঁচু (চিত্র ২৫)।
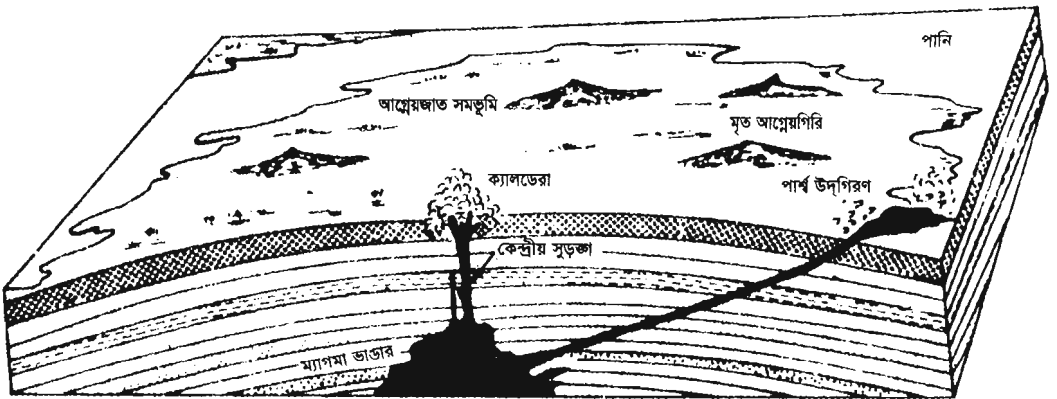
চিত্র ২৫ : শিল্ড আগ্নেয়গিরি

সিনডার কোণ: এ ধরনের আগ্নেয়গিরি খণ্ডিত শিলা টুকরা, লাভা বিস্ফোরক থেকে সৃষ্টি হয়। মেক্সিকোর পারকুটিন আগ্নেয়গিরি ও মাউন্ট সেন্ট হেলেনস্ এর উদাহরণ।

মিশ্র কোণ: নিঃশব্দে উদ্‌গিরিত চটচটে আঠালো অ্যান্ডেসাইটিক লাভা দ্বারা এর সৃষ্টি হয়। কঠিন শিলা টুকরা, ধূলিকণা, দাহ্য ভস্ম ও উত্তপ্ত গ্যাস প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে উদ্‌গিরণ হয়ে জ্বালামুখের পাশেই জমা হয় এবং আঠালো লাভা এর ওপর জমা হয়। ফিলিপাইনের মাউন্ট মেওন এবং জাপানের ফুজিয়ামা এ ধরনের আগ্নেয়গিরি (চিত্র ২৬)।

চিত্র ২৬ : সিনডার ও মিশ্র কোণ

আগ্নেয়গিরি প্রবণ অঞ্চল: চিত্র ২৭ এ সক্রিয় আগ্নেয়গিরির অবস্থান দেখানো হয়েছে। সব আগ্নেয়গিরিই মহাদেশ ও সমুদ্র সীমানা বরাবর অবস্থিত। প্রধান বলয়টি প্রশান্ত মহাসাগরের নিউজিল্যান্ড থেকে শুরু হয়ে ফিলিপাইন, জাপান, আলাস্কা ও উত্তর আমেরিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে যা আগ্নেয় মেখলা (Fiery ring) নামে পরিচিত। পৃথিবীর ৮৫০টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরির শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই এ বলয়ের আওতাভুক্ত। তা ছাড়া মহাসাগরের যেখানে শৈলশিরা আছে সেখানেও ব্যাপক আগ্নেয় তৎপরতা চলছে। যেমন, মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা বরাবর আগ্নেয় ও ভূআলোড়নজনিত তৎপরতার মাধ্যমে ভূগঠন ক্রিয়া সক্রিয় আছে।

চিত্র ২৭ : সক্রিয় আগ্নেয়গিরির অবস্থান

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলাফল: আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত এবং লাভা ঢল একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা উদ্ভিদ, জীবজন্তু ও মানবিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে। অতীতে বহু শহর ও লোকালয় আগ্নেয়গিরির লাভা ঢলের নিচে চাপা পড়ে গেছে বা দাহ্য ও বিষাক্ত গ্যাস উদ্‌গিরণের কারণে নিকটবর্তী এলাকার হাজার হাজার লোকের নিমেষে প্রাণহানি ঘটেছে। বহু আগ্নেয়গিরি উঁচু পার্বত্য এলাকায় অবস্থিত। এ সমস্ত এলাকা বরফে ঢাকা থাকলে উদ্‌গিরণের সময় তা গলে গিয়ে নিকটবর্তী এলাকায় অত্যন্ত দ্রুত ব্যাপক কর্দম প্রবাহ বা বন্যার সৃষ্টি করে। ফলে

পর্বতের পাদদেশের লোকালয়ে ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়। তা ছাড়া অনেক সময় আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্গিরিত লাভা, ভস্ম ও ধূলিকণা ঊর্ধ্ব আকাশে উঠে যায়।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ও লাভা ঢল থেকে যে ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় তা বহু বছর অব্যবহৃত থেকে যায় এবং ভূদৃশ্যে মারাত্মক পরিবর্তন আনে। তবে আগ্নেয়জাত ভূমি অত্যন্ত উর্বর হয় এবং অত্যন্ত মূল্যবান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়। তা ছাড়া চিত্তবিনোদন ও পর্যটনের জন্য আগ্নেয় ভূমিরূপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভূমিকম্প

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

ভূমিকম্প: ভূঅভ্যন্তরে দ্রুত শক্তি বিমুক্ত হওয়ায় পৃথিবীপৃষ্ঠে যে ঝাঁকুনি বা কম্পনের সৃষ্টি হয় তাই ভূমিকম্প।

ভূমিকম্পের ফলাফল

(ক) ভূমিকম্পের ফলে ভূমিরূপে কোথাও ভাঁজ, ফাটল বা ধসের সৃষ্টি হয়। নদীর গতিপথও পাল্টে যায়।

(খ) ভূকম্পন কোনো জনবহুল এলাকায় হলে তা ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, পানি, গ্যাস সরবরাহ ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

(গ) ভূকম্পন সমুদ্র তলদেশে হলে তা পানিতে বিশাল ঢেউয়ের সৃষ্টি করে।

আগ্নেয়গিরি: ভূঅভ্যন্তরের গলিত শিলা অশ্মমন্ডলের ফাটল বা দুর্বল অংশ ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে উদ্গিরণ হয়। এ উদ্গিরিত পদার্থকে লাভা বলে। এ লাভা ফাটল বা উদ্গিরণ মুখের চারদিকে ক্রমাগত জমা হয়ে যে উঁচু ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। আগ্নেয়গিরিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- শিল্ড আগ্নেয়গিরি, সিনডার কোণ ও মিশ্র কোণ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র হল–

ক. যে স্থান থেকে ভূমিকম্পের শক্তির মাত্রা মাপা হয়

খ. যে স্থান থেকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়

গ. কেন্দ্র থেকে লম্বালম্বিভাবে ভূপৃষ্ঠের উপরিস্থ বিন্দু

ঘ. যে স্থানে ভূমিকম্প অনুভূত হয়

২। যদি ঢাকায় একটি মাঝারি ধরনের ভূমিকম্প হয়। তা হলে নিম্নের কোন বিপর্যয়টি সংঘটিত হবে?

i. জীবনহানি হবে

ii. বহুতল ভবন ভেঙে পড়বে

iii. নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii

খ. ii এবং iii

গ. i এবং iii

ঘ. i, ii এবং iii

৩। নিচের কোন এলাকাটি সবচেয়ে কম ভূকম্পন প্রবণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচিত?

ক. প্রশান্ত মহাসাগরের বহিঃসীমানা

খ. ভূমধ্যসাগরের উত্তর অংশ

গ. মধ্য আফ্রিকার পর্বতমালা

ঘ. মধ্য আটলান্টিক মহাসাগরের শৈলশিরা

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

২০০৫ সালে যে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, এর ফলে ক্রান্তীয় ও নিরক্ষীয় অঞ্চলের দেশসমূহ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। এ ছাড়াও সারা বিশ্বে বছরে অসংখ্য ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। ভূমিকম্পের ফলে ব্যাপক প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে থাকে।

৪। ২০০৫ সালে ভূমিকম্পে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হল–

i. শ্রীলঙ্কা

ii. জাপান

iii. ইন্দোনেশিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii এবং iii

৫। সুনামীর ফলে স্থলভাগে সৃষ্টি হয়–

ক. আকস্মিক বন্যা

খ. আকস্মিক বৃষ্টিপাত

গ. আকস্মিক কম্পন

ঘ. আকস্মিক ঝড়ের

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সুহার্ত একদিন ভোর বেলা পুকুর পাড়ে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সে ভূমিতে প্রচণ্ড এক ঝাঁকুনি অনুভব করল এবং দেখতে পেল পুকুরের পানি তার বিপরীত কুলে আছড়ে পড়ছে। পরক্ষণেই সে দেখতে পেল পানির ঢেউ তার দিকে ছুটে আসছে। সে আরো দেখল চারিদিকে ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের ছুটাছুটি আর কোলাহল। সুহার্ত বিষয়টি নিয়ে ভাবতে লাগল। এটি কি একটি প্রাকৃতিক বিপর্যয়?

ক. সুহার্ত ভূমিতে যে ঝাঁকুনি অনুভব করল সেটি কী?

খ. এ ধরনের ঘটনা কেন ঘটে?

গ. মানচিত্র অঙ্কন করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভূমিকম্প প্রবণ এলাকাসমূহ চিহ্নিত কর।

ঘ. 'ভূমিকম্প একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে স্বীকৃত'– এর স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও।

ভূমিরূপ
LANDFORM

ভূপৃষ্ঠ যে বৈচিত্র্যময় ভূপ্রকৃতি দ্বারা গঠিত তা ভূমিরূপ। এ সমস্ত ভূপ্রকৃতি কোথাও সুউচ্চ পার্বত্যময়, আবার কোথাও সমতল বা কোথাও এ দুইয়ের মাঝামাঝি। পৃথিবীর শতকরা ১৮ ভাগ এলাকা পার্বত্যময়, শতকরা ২৪ ভাগ এলাকা মালভূমি ও পাহাড়ের আওতায় এবং শতকরা ৫৮ ভাগ এলাকা সমভূমির অন্তর্ভুক্ত।

পর্বত (Mountains)

ভূপৃষ্ঠের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সুউচ্চ শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। অধিক উচ্চতা ও খাড়া ঢাল এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েক হাজার মিটার হতে পারে। কোনো কোনো পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। যেমন, পূর্ব আফ্রিকার কিলিমানজারো। আবার কিছু পর্বত অনেকগুলো পৃথক শৃঙ্গসহ ব্যাপক এলাকা (কয়েক হাজার কিলোমিটার) জুড়ে অবস্থান করে। এ ধরনের পর্বতসমূহ সাধারণত ঢেউয়ের ন্যায় ভাঁজ বিশিষ্ট (চিত্র ২৮) যেমন, হিমালয় পর্বতমালা। পশ্চিমে পামীর মালভূমি থেকে শুরু হয়ে পূর্বে প্রায় পাপুয়া নিউগিনি পর্যন্ত বিস্তৃত। অন্যান্য পর্বতসমূহের মধ্যে উত্তর আমেরিকার রকি, অ্যাপালেশিয়ান, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, ইউরোপের আল্পস, এশিয়ার ফুজিয়ামা, ইউরোপের ইউরাল, ককেশাস উল্লেখযোগ্য।

চিত্র ২৮ : ভাঁজ পর্বত

এ সমস্ত পর্বতসমূহ গঠনে অনেকগুলো প্রক্রিয়া একত্রে কাজ করে, যা গিরিজনি আলোড়ন (Orogenesis) নামে পরিচিত। গ্রিক শব্দ ওরোস অর্থ পর্বত এবং জেনেসিস অর্থ সৃষ্টি/গঠিত হওয়া। ব্যাপক ক্ষয়কাজ বিশেষত বায়ুপ্রবাহ, পানিপ্রবাহ, হিমবাহ ইত্যাদি পার্বত্য এলাকার ভূমিরূপে সব সময় পরিবর্তন ঘটায়।
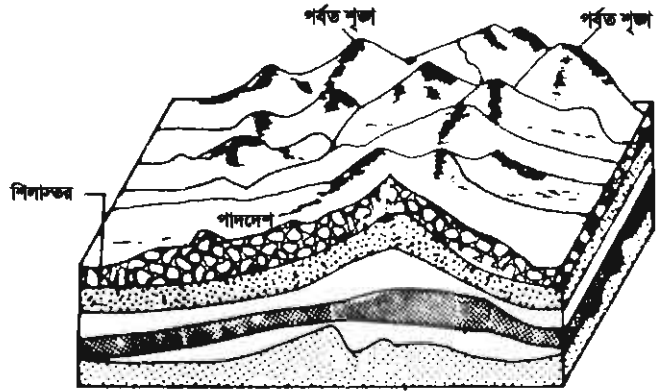
পর্বতের প্রকারভেদ: প্রধান বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্বত প্রধানত চার প্রকার। যথা- (ক) ভঙ্গিল পর্বত, (খ) আগ্নেয় পর্বত, (গ) চ্যুতি-স্তূপ পর্বত এবং (ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত।

(ক) ভঙ্গিল পর্বত: বিস্তৃত ও সুউচ্চ অনেক পর্বতের সমন্বয়ে ভঙ্গিল পর্বত গঠিত হয়। ভঙ্গিল পর্বতের প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাঁজ। সহজভাবে বলা যায় যে, অভ্যন্তরের তলদেশে যেখানে একটি শিলামণ্ডলীর প্লেট, পার্শ্ববর্তী প্লেটের তলদেশে ঢুকে পড়ে সে বরাবর বিপুল পরিমাণে পলি এসে জমা হতে থাকে। এ সমস্ত পলি এক পর্যায়ে প্রবল পার্শ্বচাপের কারণে কোথাও ঊর্ধ্বভাঁজের (Anticline) সঙ্গেই নিম্নভাঁজের (Syncline) সৃষ্টি করে। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে এ সমস্ত ঊর্ধ্ব ও অধঃভাঁজ সংবলিত ভূমিরূপ মিলেই ভঙ্গিল পর্বত গঠিত হয়। হিমালয়, আল্পস, ইউরাল, রকি ইত্যাদি ভঙ্গিল পর্বতের উদাহরণ (চিত্র ২৯)।
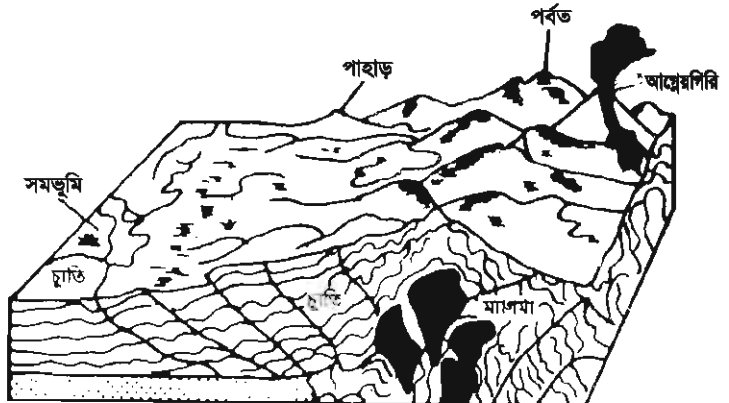
চিত্র ২৯ : ভঙ্গিল পর্বত

(খ) আগ্নেয় পর্বত: আগ্নেয় পর্বত মূলত আগ্নেয়গিরি থেকে উদ্‌গিরিত পদার্থ সঞ্চিত ও জমাট বেঁধে সৃষ্টি হয়। এরূপ পর্বত সাধারণত মোচাকৃতির (Conical) হয়ে থাকে। আগ্নেয়গিরির উদ্‌গিরিত লাভার বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে এ ধরনের পর্বত কখনও অল্প জায়গা জুড়ে খুব খাড়া ঢালবিশিষ্ট হয় (চিত্র ৩০)। যেমন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট সেন্ট হেলেনস্। আবার কখনও চওড়া ভিত্তির স্বল্প ঢাল সম্পন্ন হয়। যেমন, ফুজিয়ামা (জাপান) এবং মনালোয়া (হাওয়াই)।

চিত্র ৩০ : আগ্নেয় পর্বত

(গ) চ্যুতি-স্তূপ পর্বত: এ ধরনের পর্বতের অন্তত একপাশে উঁচু কোণ বিশিষ্ট স্বাভাবিক চ্যুতি থাকে। ভূআলোড়নের সময় ভূপৃষ্ঠে যে টানজনিত চাপ পড়ে তাতে ভূত্বকে ফাটলের সৃষ্টি হয়। কালক্রমে এ ফাটল বরাবর ভূত্বক ক্রমে স্থানচ্যুত হয়। একে চ্যুতি বলে। ভূত্বকের এ স্থানচ্যুতি কোথাও ওপরের দিকে হয়, আবার কখনও নিম্নগামী হয়। চ্যুতি বরাবর ঊর্ধ্বগামী শিলাস্তূপকে স্তূপ পর্বত বলে (চিত্র ৩১)। যেমন, জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট, পাকিস্তানের লবণ পর্বত। নিম্নগামী চ্যুতির ফলে যে উপত্যকার সৃষ্টি হয় তাকে স্রস্ত উপত্যকা বলে।

চিত্র ৩১ : চ্যুতি-স্তূপ পর্বত

(ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত: কখনও কখনও পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে গলিত শিলা বা ম্যাগমা বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা স্থানান্তরিত হয়ে ভূপৃষ্ঠে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু কোনো কোনো সময় এগুলো ভূপৃষ্ঠে না পৌঁছে ভূত্বকের নিম্নে এক স্থানে জমাটবন্ধ হয় এবং ঊর্ধ্বমুখী চাপের দ্বারা শিলাস্তর স্ফীত হয়ে ভূত্বকের অংশবিশেষ গম্বুজ আকার ধারণ করে। এভাবে সৃষ্ট পর্বতকে ল্যাকোলিথ বা গম্বুজ পর্বত বলে (চিত্র ৩২)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হেনরী পর্বত এর উদাহরণ।
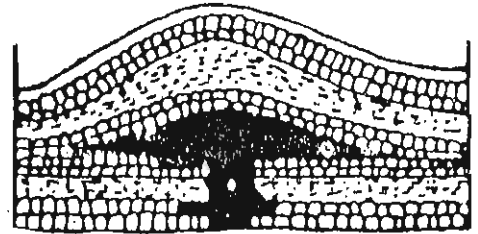
চিত্র ৩২ : ল্যাকোলিথ পর্বত

মালভূমি (Plateau)

পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিকে মালভূমি বলে। মালভূমির সৃষ্টি মূলত পর্বত গঠন প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত (চিত্র ৩৩)। আগ্নেয়জাত লাভা কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিস্তৃত ভূমিরূপের সৃষ্টি করেছে। যেমন, ভারতের দাক্ষিণাত্যের লাভা গঠিত মালভূমি। তা ছাড়া প্রাচীন পার্বত্য এলাকাও ব্যাপক ক্ষয়কাজের কারণে উচ্চতা হ্রাস পেয়ে মালভূমিতে পরিণত হতে পারে।
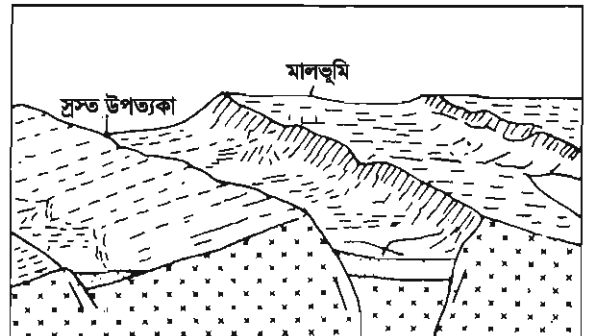
চিত্র ৩৩ : মালভূমি

অবস্থানের ভিত্তিতে মালভূমি তিন ধরনের। যথা- (ক) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি, (খ) পাদদেশীয় মালভূমি ও (গ) মহাদেশীয় মালভূমি।

(ক) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি: পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমির উচ্চতা আনুমানিক ৩,০০০ থেকে ৫,০০০ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এ সমস্ত মালভূমি পর্বতবেষ্টিত থাকে এবং পর্বত গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে এগুলো সৃষ্টি হয়। তিব্বত মালভূমি একটি পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি যার উত্তরে কুলনুন ও দক্ষিণে হিমালয় পর্বত এবং পূর্ব-পশ্চিমেও পর্বত ঘিরে আছে। এ মালভূমির গড় উচ্চতা ৪,০০০ মিটারেরও বেশি এবং আয়তন ৫২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটারের বেশি। তা ছাড়া, দক্ষিণ আমেরিকার বলিভিয়া মালভূমি, মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো মালভূমি এবং এশিয়ার মঙ্গোলিয়া ও তারিম মালভূমি এ জাতীয় মালভূমি (চিত্র ৩৪)।
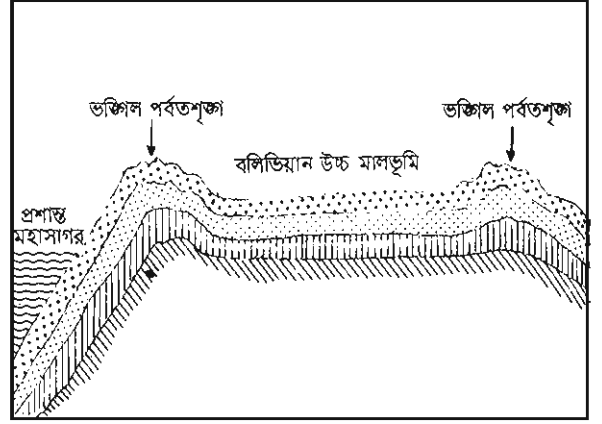
চিত্র ৩৪ : পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি

(খ) পাদদেশীয় মালভূমি: উচ্চ পর্বতের পাদদেশে এর অবস্থান। পর্বতের গায়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে ক্ষয়িত পলি পর্বতের নিম্ন ঢালে এসে জমা হয়ে যে বিস্তৃত অনুভূমিক ভূমিরূপের সৃষ্টি করে তাকেই পাদদেশীয় মালভূমি বলে। তবে এ ধরনের মালভূমির নিম্নপ্রান্ত সমতল ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত। উত্তর আমেরিকার রকি পর্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমের কলোরাডো এবং দক্ষিণ আমেরিকার পাতাগোনিয়া পাদদেশীয় মালভূমি।

(গ) মহাদেশীয় মালভূমি: সাগর বা নিম্নভূমি পরিবেষ্টিত বিস্তীর্ণ উচ্চভূমিকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে। এ ধরনের মালভূমির সঙ্গে পর্বতের কোনো সংযোগ থাকে না। আরব উপদ্বীপ, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, গ্রিনল্যান্ড, এন্টার্কটিকা এবং ভারতীয় উপদ্বীপ এর অন্যতম উদাহরণ।

মালভূমির বেশিরভাগই বন্ধুর ভূপ্রকৃতি, শুষ্ক জলবায়ু থাকায় জনবসতি খুব সীমিত। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মালভূমিতে খনিজ শিল্প যেমন, টিন, তামা ইত্যাদি পাওয়া যায়। তা ছাড়া কোনো মালভূমির খরস্রোতা নদীতে বাঁধ দিয়ে পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে।

সমভূমি (Plains)

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে। এখানে সমতল বলতে খুব কম বন্ধুরতা সম্পন্ন ভূমিকে বোঝানো হয়েছে। এ ধরনের সমভূমি বিভিন্ন ভূপ্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যেমন, নদী, হিমবাহ ও বায়ুর ক্ষয় ও সঞ্চয় ক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়। সমভূমির মৃদু ঢাল ও স্বল্প বন্ধুরতা, কৃষিকাজ, বসবাস, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য খুবই উপযোগী। তাই সমভূমিতে সবচেয়ে ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে।

সমভূমির উৎপত্তির ধরনের ভিত্তিতে প্রধানত ক্ষয়জাত ও সঞ্চয়জাত এ দুই শ্রেণীর সমভূমি দেখা যায়।

ক্ষয়জাত সমভূমি: মূলত দীর্ঘ দিন নদী, বায়ুপ্রবাহ এবং হিমবাহের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে ক্ষয়জাত সমভূমির সৃষ্টি হয়। ওপরের শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উঁচু ঢালবিশিষ্ট এলাকা সমতল
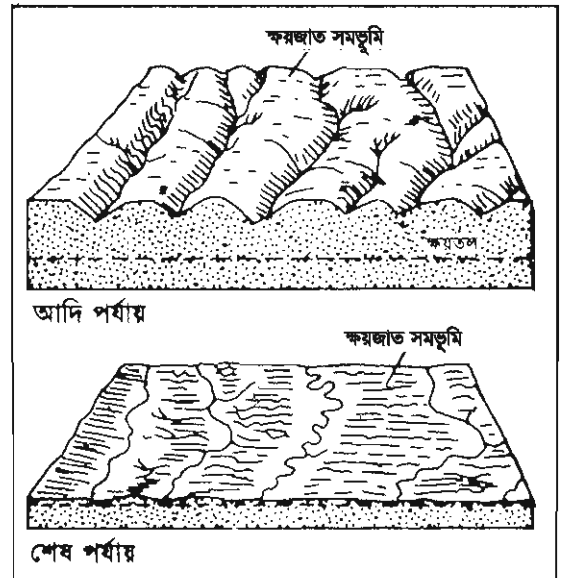
চিত্র ৩৫ : ক্ষয়জাত সমভূমি

ভূমিতে পরিণত হয় (চিত্র ৩৫)। যেমন, অ্যাপালেশিয়ান পাদদেশীয় সমভূমি ও সাইবেরিয়া সমভূমি এ ধরনের ক্ষয়জাত ভূমি। বাংলাদেশের মধুপুরের চত্বর ও বরেন্দ্রভূমি দুইটি ক্ষয়জাত সমভূমির উদাহরণ। প্লাইস্টোসিনকালে অর্থাৎ ৮ থেকে ১০ লক্ষ বছর পূর্বে এ এলাকাগুলো সমুদ্র সমতল থেকে ভূআলোড়নজনিত কারণে জেগে ওঠে। পরবর্তীতে নদীর ক্রিয়ায় এগুলো সমভূমিতে রূপ নেয়।

সঞ্চয়জাত সমভূমি: সঞ্চয় ক্রিয়ার মাধ্যমে সঞ্চয়জাত সমভূমির সৃষ্টি হয়। এ ধরনের সঞ্চয়জাত ভূমি পার্বত্য অঞ্চল থেকে শুরু করে সমুদ্র উপকূল পর্যন্ত যে কোনো অবস্থানে সৃষ্টি হতে পারে। নদীর পার্বত্যগতিতে পলি অবক্ষেপণের মাধ্যমে বিস্তৃত উপত্যকা (Valley) সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, নেপালের উপত্যকা। আবার পাহাড়ের পাদদেশে পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে পাদদেশীয় পলল সমভূমির সৃষ্টি হয়। যেমন, পলল পাখা (Alluvial fan)। আরো নিচু এলাকায় নদীর পরিবাহিতা কমে গেলে সহজেই দুই কূল ছাপিয়ে বন্যার সৃষ্টি করে এবং উভয় কূল সংলগ্ন এলাকায় পলি অবক্ষেপণের মাধ্যমে বিস্তৃত প্লাবন সমভূমি (Flood plain) সৃষ্টি করে (চিত্র ৩৬)। যেমন, ধলেশ্বরী প্লাবন ভূমি, যমুনা প্লাবন ভূমি। নদীর মোহনার কাছাকাছি এসে নদী সঞ্চয়ের মাধ্যমে এক ধরনের সমতল ভূমি গড়ে তোলে। একে বদ্বীপ (Delta) সমভূমি বলে (চিত্র ৩৬)। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল এ ধরনের বদ্বীপের অন্তর্গত যা গাঙ্গেয় বদ্বীপ নামে পরিচিত। তা ছাড়া সমুদ্র উপকূল বরাবর যেখানে জোয়ার-ভাঁটা দ্বারা প্রবাহিত হয় সেখানে
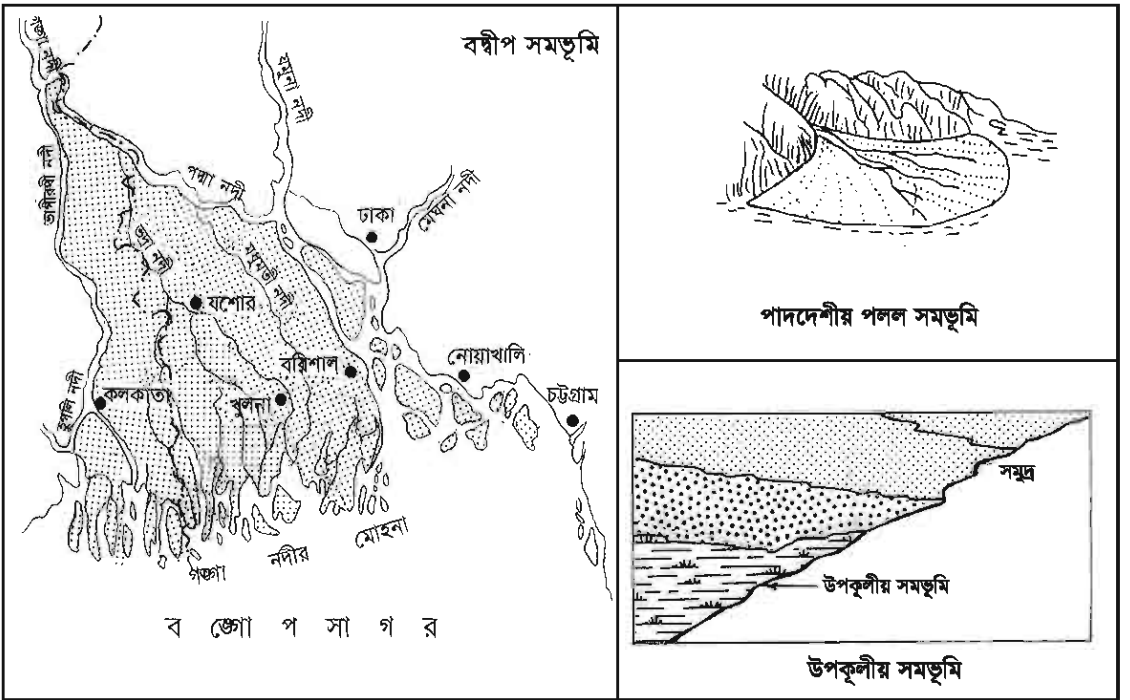
চিত্র ৩৬ : সঞ্চয়জাত সমভূমি

উপকূলীয় সমভূমি (Coastal plain) গড়ে ওঠে (চিত্র ৩৬)। যেমন, বাংলাদেশের চট্টগ্রাম উপকূলীয় সমভূমি যা উত্তরে ফেনী নদীর মোহনা থেকে দক্ষিণে টেকনাফ পর্যন্ত বিস্তৃত।

শীতপ্রধান এলাকায় হিমবাহের গ্রাবরেখা (Moraine) দ্বারা সঞ্চয়কৃত পলি থেকে সমভূমি গড়ে ওঠে। কানাডার প্রেইরী অঞ্চল একটি হিমবাহ সমভূমি।

বায়ুর সঞ্চয় কাজের ফলে কখনও বিস্তৃত সমভূমি গড়ে ওঠে। যেমন, চীনের উত্তর অঞ্চলের লোয়েস মৃত্তিকা ও আর্জেন্টিনার পাম্পাস এলাকা। এ সমস্ত লোয়েস মৃত্তিকা অত্যন্ত উর্বর কিন্তু এর ক্ষয় প্রবণতা খুব বেশি।

ভূমিরূপ

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

পর্বত: ভূপৃষ্ঠের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে সুউচ্চ শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। পূর্ব আফ্রিকার কিলিমানজারো, এশিয়ার হিমালয় পর্বতমালা ও ফুজিয়ামা, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ বিভিন্ন প্রকার পর্বতের উদাহরণ।

প্রকারভেদ: (ক) ভঙ্গিল পর্বত, (খ) আগ্নেয় পর্বত, (গ) চ্যুতি-স্তূপ পর্বত এবং (ঘ) ল্যাকোলিথ পর্বত।

মালভূমি: পর্বত থেকে নিচু কিন্তু সমভূমি থেকে উঁচু বিস্তীর্ণ সমতল ভূমিকে মালভূমি বলে। মালভূমির উপরিভাগ কিছুটা সমতল। অবস্থানের ভিত্তিতে মালভূমি তিন প্রকার। যথা- (ক) পর্বতমধ্যবর্তী মালভূমি, (খ) পাদদেশীয় মালভূমি ও (গ) মহাদেশীয় মালভূমি।

সমভূমি: সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট সুবিস্তৃত ভূমিকে সমভূমি বলে। সমভূমি দুই প্রকার- ক্ষয়জাত সমভূমি ও সঞ্চয়জাত সমভূমি।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। জার্মানির ব্লাক ফরেস্ট কোন ধরনের পর্বত?

ক. ভঙ্গিল　　খ. আগ্নেয়

গ. চ্যুতি–স্তূপ　　ঘ. ল্যাকোলিথ

২। সঞ্চয়জাত বদ্বীপ সমভূমি গঠিত হয়–

ক. পাহাড়ের পাদদেশে　　খ. নদীর মোহনার কাছাকাছি

গ. বায়ুপ্রবাহের ফলে　　ঘ. হিমবাহের গ্রাবরেখার ফলে

৩। পর্বতের বৈশিষ্ট্য হল–

i. অধিক উঁচু ও খাড়া ঢালবিশিষ্ট ভূভাগ

ii. সমুদ্র সমতল থেকে উঁচু মৃদু ঢালবিশিষ্ট ভূভাগ

iii. প্রায় সুউচ্চ ও সমতল প্রকৃতির ভূভাগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii এবং iii

৪। **বদ্বীপ সৃষ্টির কারণ–**

i. নদীর উভয়কূল সংলগ্ন পলি অবক্ষেপণের ফলে

ii. নদী পরিবাহিত তলানী নদীর মোহনায় সঞ্চয়নের ফলে

iii. নদীর পার্বত্য গতিতে পলি অবক্ষেপণের মাধ্যমে বিস্তৃত উপত্যকা সৃষ্টির ফলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii এবং iii

৫। **মালভূমির ক্ষেত্রে কোন উক্তিটি সঠিক?**

ক. আগ্নেয়জাত লাভা নদী মোহনায় সঞ্চয়ের ফলে সমুদ্র সমতলে যে উঁচুভূমির সৃষ্টি হয়

খ. নদীর পরিবাহিতা কমে গিয়ে পলি অবক্ষেপণের ফলে নদীর মোহনায় যে সুউচ্চ ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়

গ. আগ্নেয়জাত লাভা, প্রাচীন পার্বত্য এলাকার ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে উচ্চতা হ্রাস পেয়ে যে সমতল ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়

ঘ. মূলত দীর্ঘ দিন নদী, বায়ুপ্রবাহ এবং হিমবাহের ক্ষয়ক্রিয়ার ফলে যে ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ভূপৃষ্ঠ সর্বত্র সমান নয়। কোথাও সুউচ্চ পর্বত, কোথাও মালভূমি, কোথাও পাহাড় আবার কোথাও বা বিস্তৃত সমতল ভূমি বিদ্যমান। সুউচ্চ পার্বত্যভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে মালভূমি ও সমতল ভূমির সৃষ্টি করে। আবার নদীর মোহনার কাছাকাছি এসে নদী সঞ্চয়ের মাধ্যমে সমতল ভূমি গড়ে ওঠে। ভূত্বকের উত্থান ও ক্ষয় থেকেও আবার বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়ে থাকে। পৃথিবীর সমতল ভূমির মধ্যে নদীর মোহনায় অবস্থিত বদ্বীপ সমতল ভূমিগুলো খুবই উর্বর। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা প্রভৃতি নদীর পলি দ্বারা গঠিত বদ্বীপ পৃথিবী বিখ্যাত।

ক. নদীর মোহনার কাছাকাছি এসে নদী সঞ্চয়ের মাধ্যমে কী গড়ে ওঠে?

খ. ভঙ্গিল পর্বত ও ল্যাকোলিথ পর্বতের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্ণনা কর।

গ. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে এ দেশের দক্ষিণ–পশ্চিমাঞ্চলে নদী সঞ্চয়নের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সমভূমি চিহ্নিত কর।

ঘ. নদীর মোহনায় কাছাকাছি সৃষ্ট এ সমভূমির অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বায়ুমণ্ডল

ATMOSPHERE

ভূপৃষ্ঠের চারপাশে বেষ্টন করে যে বায়ুর আবরণ আছে তাকেই বায়ুমণ্ডল বলে। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, বায়ুমণ্ডল এর বয়স প্রায় ৩৫ কোটি বছর। এর গভীরতা প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার। তবে বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৯৭ শতাংশই ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩০ কিলোমিটার–এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে বায়ুমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লেপ্টে আছে। বায়ুর চাপের কারণে সমুদ্রপৃষ্ঠে এর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং ওপরের দিকে ঘনত্ব খুবই কম।

বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব: পৃথিবীর সমস্ত জীবের বেঁচে থাকার জন্য বায়ুমণ্ডলের গুরুত্ব অপরিসীম। বায়ুমণ্ডল সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে প্রাণিকুলকে রক্ষা করে এবং এর গ্যাসীয় উপাদান যেমন, কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2) উদ্ভিদকে ও অক্সিজেন প্রাণীকে বাঁচিয়ে রাখে। পৃথিবীতে মানুষের কর্মকাণ্ড বায়ুমণ্ডলের গঠন উপাদানে পরিবর্তন করতে সাহায্য করে। বিশেষ করে, ব্যাপকভাবে গাছপালা কেটে ফেলা, কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া এবং জ্বালানি তেল, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ানো থেকে নির্গত ধোঁয়া ও বিষাক্ত গ্যাস বায়ুমণ্ডল দূষিত করে তুলছে। প্রাণীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যই বায়ুমণ্ডলকে বিশুদ্ধ রাখা দরকার। তাই বায়ুমণ্ডলের গঠন এবং তা কীভাবে কাজ করে এ সম্বন্ধে জানা প্রয়োজন।

বায়ুমণ্ডলের গঠন: বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণে গঠিত। এ গ্যাসীয় মিশ্রণ ভূপৃষ্ঠ থেকে আনুমানিক ৮০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত প্রায় সমান। বিশুদ্ধ, শুষ্ক বায়ুর প্রধান দুইটি উপাদানের নাম নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। আয়তনের দিক থেকে এ দুইটি গ্যাস একত্রে ৯৮.৭৩ শতাংশ জায়গা জুড়ে আছে এবং বাকি ১.২৭ শতাংশ জায়গা অন্যান্য গ্যাস দ্বারা আবৃত। নিচে আয়তন হিসেবে নিম্ন বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উপাদানসমূহের একটি তালিকা দেওয়া হল।

নাইট্রোজেন (N_2)	৭৮.০২	কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)	০.০৩
অক্সিজেন (O_2)	২০.৭১	ওজোন (O_3)	০.০০০১
আরগন (Ar)	০.৮০	অন্যান্য	০.৪৩৯৯

বাকি অংশ অন্যান্য নিষ্ক্রিয় গ্যাস যেমন, নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন, হাইড্রোজেন, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইড দ্বারা গঠিত। তবে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন মাত্রায় জলীয়বাষ্প ও ধূলিকণা থাকে। বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের মাত্রা ০.০৩ শতাংশ। এ স্বল্প মাত্রায় কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলীয় প্রক্রিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এ গ্যাস সূর্য থেকে আগত ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোক রশ্মিকে পৃথিবীতে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতিফলিত সূর্যের এ বিকিরিত আলোক রশ্মি ক্ষুদ্র তরঙ্গ থেকে দীর্ঘ তরঙ্গে পরিণত হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড এ দীর্ঘ তরঙ্গ রশ্মিকে নিম্ন বায়ুমণ্ডল শুষে নেয়। ফলে বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়।

বায়ুমণ্ডলীয় স্তর: বায়ুমণ্ডল যে সমস্ত উপাদানে গঠিত তাদের বৈশিষ্ট্যের (যেমন, উষ্ণতা, চাপ, ঘনত্ব) ভিত্তিতে ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরের দিকে একে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা- ট্রপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল ও তাপমণ্ডল (চিত্র ৩৭)।

ট্রপোমণ্ডল (Troposphere): এ মণ্ডল বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর, ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লেগে আছে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর জন্য বায়ুমণ্ডলের এ স্তর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ট্রপোমণ্ডলের সীমানা ওপরের দিকে হঠাৎ করে শেষ না হয়ে ধীরে ধীরে এর গুণাবলি পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তী স্তর স্ট্রাটোমণ্ডলের গুণাবলির সঙ্গে মিশে গেছে। ট্রপোমণ্ডলের শেষ প্রান্তের অংশের নাম ট্রপোবিরতি (Tropopause)। এ স্তরের গভীরতা মেরু এলাকায় ৮ কিলোমিটার এবং নিরক্ষীয় এলাকায় ১৬ থেকে ১৯ কিলোমিটার। ট্রপোমণ্ডলের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ :

(ক) উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুর ঘনত্ব ও উষ্ণতা কমতে থাকে। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে উষ্ণতা কমে যাওয়াকে স্বাভাবিক তাপ হ্রাস হার বলে।
(খ) উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে বাতাসের গতিবেগ বেড়ে যায়।
(গ) নিচের দিকের বাতাসে জলীয়বাষ্প থাকে।
(ঘ) বায়ু ওপরে-নিচে ওঠানামা করে এবং
(ঙ) আবহাওয়া ও জলবায়ুজনিত যাবতীয় প্রক্রিয়ার বেশিরভাগ এ স্তরে ঘটে থাকে।

চিত্র ৩৭ : বায়ুমন্ডলের স্তরসমূহ

স্ট্রাটোমন্ডল (Stratosphere): স্ট্রাটোমন্ডল বায়ুমন্ডলের পরবর্তী স্তর যা ওপরের দিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত (চিত্র ৩৭)। বায়ুমন্ডলীয় ওজন (O_3) গ্যাসের বেশিরভাগ এ স্তরেই আছে। এ ওজোন স্তর সূর্যের আলোর বেশিরভাগ অতিবেগুনি রশ্মি (Ultraviolet rays) শুষে নেয়। তাই পৃথিবী প্রাণিজগতের বাস উপযোগী হয়েছে। এ স্তরে বায়ুর ঘনত্ব ও চাপ উভয়ই অনেক কম এবং উষ্ণতা নিম্ন স্ট্রাটোমন্ডলে তেমন পরিবর্তন হয় না। তবে এ স্তরের ২০ কিলোমিটার থেকে ধীরে ধীরে উষ্ণতা বাড়তে থাকে এবং তা উচ্চ স্ট্রাটোমন্ডলে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। স্ট্রাটোমন্ডলে জলীয়বাষ্প নেই। এ স্তরের ওপরেই অবস্থান করে স্ট্রাটোবিরতি।
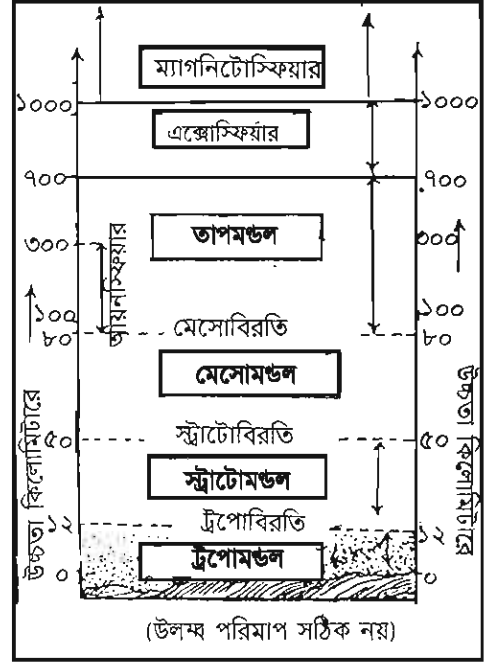
মেসোমন্ডল (Mesosphere): স্ট্রাটোবিরতির ওপরের স্তর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত উষ্ণতা দ্রুত হ্রাস পেতে থাকে। এ বিস্তৃত অংশকে মেসোমন্ডল বলে। তবে ৮০ কিলোমিটার-এর পরে পুনরায় উষ্ণতা বাড়তে শুরু করে। এ অংশের নাম মেসোবিরতি, মেসোমন্ডলে বায়ুর চাপ অত্যন্ত ক্ষীণ।

তাপমন্ডল (Thermosphere): মেসোবিরতির ওপরের অংশ থেকে তাপমন্ডল শুরু হয়। তাপমন্ডলের নিম্ন অংশকে আয়নমন্ডল বলা হয়। আয়নমন্ডলের ওপরের অংশে এক্সোস্ফিয়ার ও ম্যাগনিটোস্ফিয়ার নামক দুইটি স্তর আছে।

আবহাওয়া ও জলবায়ু (Weather and Climate)

বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরে এর গঠন উপাদানগুলোর বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষণীয়। বায়ুমন্ডলের নিম্নস্তরে তাপ, চাপ, আর্দ্রতা ও বায়ুপ্রবাহের পার্থক্য আমরা সবচেয়ে বেশি অনুভব করি। প্রতি দিনের গড় তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ও বারিপাতের তথ্যের ভিত্তিতে কোনো এলাকার যে অবস্থা প্রকাশ করে তাকেই আবহাওয়া বলে। সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থাকে জলবায়ু বলে।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান: (১) বায়ুর তাপ, (২) বায়ুর চাপ, (৩) বায়ুপ্রবাহ, (৪) বায়ুর আর্দ্রতা ও (৫) বারিপাত।

জলবায়ুর নিয়ামক: আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহ নিম্নলিখিত নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

অক্ষাংশ, উচ্চতা, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, পর্বতের অবস্থান, ভূমির বন্ধুরতা, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, ভূমির ঢাল, মৃত্তিকা ও বনভূমির অবস্থান।

১। **অক্ষাংশ:** এটি জলবায়ুর একটি বিশেষ নিয়ামক। কারণ সূর্যকিরণের মাত্রা অক্ষাংশভেদে বিভিন্ন রকম হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়, ফলে এ অঞ্চলে বায়ুর তাপমাত্রা বেশি। অপরদিকে উচ্চ অক্ষাংশে সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয়, ফলে বায়ুর তাপমাত্রা কম। নিরক্ষরেখা থেকে উভয় মেরুর দিকে বায়ুমন্ডলীয় তাপমাত্রা সাধারণত হ্রাস পায়।

২। উচ্চতা: উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা হ্রাস পাচ্ছে। সাধারণত প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতায় ৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এ উচ্চতার পার্থক্যের কারণে দুই জায়গা একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও একটি অপরটির চেয়ে ভিন্ন জলবায়ু সম্পন্ন হয়। যেমন, দিনাজপুর ও শিলং একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু উচ্চতার তারতম্যের জন্য এদের জলবায়ু ভিন্ন রকম। শিলং এ দিনাজপুরের চেয়ে তাপমাত্রা কম হয়।

৩। সমুদ্র থেকে দূরত্ব: জলভাগের অবস্থা কোনো এলাকার জলবায়ুকে মৃদুভাবাপন্ন করে। যেমন, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালি সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানকার জলবায়ু বগুড়ার তুলনায় বেশ মৃদুভাবাপন্ন। সমুদ্র নিকটবর্তী এলাকায় শীত-গ্রীষ্ম এবং দিনরাত্রির তাপমাত্রার তেমন পার্থক্য হয় না। এ ধরনের জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে। কিন্তু সমুদ্র উপকূল থেকে দূরের এলাকায় শীত-গ্রীষ্ম উভয়ই চরম হয়। কারণ স্থলভাগ জলভাগ অপেক্ষা যেমন দ্রুত উষ্ণ হয়, আবার দ্রুত ঠান্ডাও হয়। এ জন্য গ্রীষ্মকালে মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগের এলাকা অত্যন্ত উত্তপ্ত থাকে, আবার শীতকালে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয়। এ ধরনের জলবায়ুকে মহাদেশীয় বা চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বলে।

৪। বায়ুপ্রবাহ: বায়ুপ্রবাহ কোনো জায়গার জলবায়ুর ওপরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু কোনো এলাকার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হলে সে এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যেমন, বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রচুর জলীয়বাষ্পপূর্ণ মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়ায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। আবার শীতকালে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে মহাদেশীয় বায়ু প্রবাহিত হওয়ার কারণে বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে এবং বায়ুর তাপমাত্রা খুব কমে যায়।

৫। সমুদ্রস্রোত: শীতল বা উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে উপকূল সংলগ্ন এলাকার বায়ু ঠান্ডা বা উষ্ণ হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলবর্তী এলাকার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। আবার শীতল ল্যাব্রাডর স্রোত উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলকে শীতল রাখে।

৬। পর্বতের অবস্থান: উচ্চ পার্বত্যময় এলাকা বায়ুপ্রবাহ পথে বাধা হলে এর প্রভাব জলবায়ুর ওপর পরিলক্ষিত হয়। যেমন, মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উত্তরে আড়াআড়িভাবে অবস্থিত হিমালয় পর্বতে বাধা পাওয়ায় বাংলাদেশ, ভারত ও নেপালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। অপরদিকে শীতকালে মধ্য এশিয়ার শীতল বায়ু হিমালয় অতিক্রম করতে পারে না। তাই ভারতীয় উপমহাদেশের জলবায়ু ইউরোপের মতো তত শীতল হয় না।

৭। ভূমির ঢাল: সূর্যকিরণ উঁচুভূমির ঢাল বরাবর লম্বভাবে পতিত হলে সেখানকার বায়ু এবং ভূমি বেশি উত্তপ্ত হয়। কিন্তু ঢালের বিপরীত দিকে সূর্যকিরণ কিছুটা তির্যকভাবে পড়ে বা কখনও সূর্যালোক খুব কম পায় ফলে বায়ু শীতল হয়।

৮। মৃত্তিকা: মৃত্তিকার গঠন বা বুনট সূর্যতাপ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা রাখে। অনাবৃত এলাকার বেলেমাটি যেমন দ্রুত উত্তপ্ত হয় আবার তেমনি দ্রুত ঠান্ডাও হয়। কিন্তু পলি বা কর্দম বিশিষ্ট মাটি তাপ সংরক্ষণ ক্ষমতার জন্য উষ্ণ বা শীতল হতে বেলেমাটির তুলনায় বেশি সময় লাগে।

৯। বনভূমির অবস্থান: গাছপালা প্রস্বেদন (Transpiration) ও বাষ্পীভবনের (Evaporation) সাহায্যে বায়ু জলীয়বাষ্পপূর্ণ হয় এবং তা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। তা ছাড়া বনভূমি ঝড়-তুফান, সাইক্লোন-এর গতিপথে বাধা দিয়ে এর শক্তি কমিয়ে দেয়। বনভূমিতে সূর্যালোক মাটিতে পৌঁছাতে পারে না, ফলে সেখানকার বায়ু তুলনামূলকভাবে শীতল হয়।

সৌরশক্তি ও বায়ুর তাপ

সৌরশক্তির তারতম্য: বায়ুমণ্ডলের মোট শক্তির ৯৯.৯৭ শতাংশই আসে সূর্য থেকে। সূর্য থেকে আগত এ শক্তি বায়ুমণ্ডল তাপীয় শক্তি বা গতিশক্তি হিসেবে ধারণ করে। সূর্য থেকে বিকিরণের মাধ্যমে পৃথিবী যে শক্তি ক্ষুদ্র তরঙ্গ আকারে পায় তাই সৌরশক্তি (Insolation) নামে পরিচিত। সূর্যরশ্মি পৃথিবীতে আসার পথে বায়ুমণ্ডলে শোষিত (Absorption), বিচ্ছুরিত (Scattered) ও প্রতিফলিত (Reflected) হয়। মেঘমুক্ত অবস্থায় বায়ুমণ্ডল ভেদকারী সূর্যরশ্মির প্রায় ৮০ শতাংশ পৃথিবীতে গৃহীত হয়, বাকি প্রায় ২০ শতাংশ মহাশূন্যে ফিরে যায়।

ভূপৃষ্ঠে গৃহীত-সৌরশক্তির পরিমাণ পৃথিবীতে সমানভাবে বণ্টন হয় না। নিরক্ষীয় এলাকা যে পরিমাণ সৌরশক্তি পায় সেই তুলনায় অনেক কম শক্তি হারায়। অপরদিকে মেরু এলাকায় এর বিপরীত অবস্থা হয়, অর্থাৎ সৌরশক্তি যা পায় তার চেয়ে বেশি হারায়। পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহ ও মহাসাগরের পানি স্রোতের মাধ্যমে সৌরশক্তি এ অসম বণ্টনে সমতা আনার চেষ্টা করে।

সৌরশক্তি নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামক : পৃথিবীর কোনো অংশ একদিনে কী পরিমাণ সৌরতাপ পাবে তা দুইটি নিয়ামকের ওপর নির্ভর করে। যথা-

(ক) সৌরশক্তির তীব্রতা নির্ভর করে পৃথিবীর কোন অংশে সূর্যালোক কত খাড়া বা তির্যকভাবে পৌঁছে তার ওপর (চিত্র ৩৮)।

(খ) রাতের তুলনায় দিনের দৈর্ঘ্য বা সূর্যালোকের স্থায়িত্বের ওপর।

ওপরের এ দুইটি নিয়ামক নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু পর্যন্ত বিভিন্ন অক্ষাংশে এবং বিভিন্ন ঋতুতে সূর্যের অবস্থানের সঙ্গে ভিন্নভাবে কাজ করে।
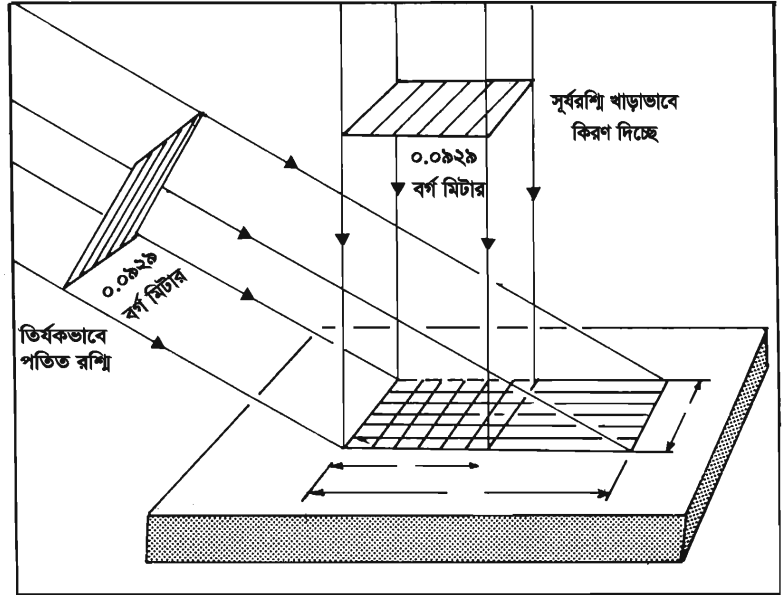
চিত্র ৩৮ : সূর্যরশ্মির কিরণ দান

চিত্র ৩৮ এ দেখা যাচ্ছে খাড়াভাবে পতিত সূর্যরশ্মির তীব্রতা অনেক বেশি কারণ তা কম বায়ুস্তর ভেদ করে এবং ভূপৃষ্ঠের স্বল্প স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়। কর্কট ও মকরক্রান্তির মাঝামাঝি বিভিন্ন অক্ষরেখায় মধ্যাহ্নে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। অপরদিকে সূর্যের তির্যকরশ্মি অধিক বায়ুস্তর ভেদ করে এবং ভূপৃষ্ঠের অনেক খানি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। এ দুইটি কারণে, শীতকালীন সূর্যালোকের চেয়ে গ্রীষ্মকালীন সূর্যালোক অনেক তীব্র হয়। আবার সকাল ও বিকালের সূর্যালোকের তেজ মধ্যাহ্নের চেয়ে কম।

দিনের দৈর্ঘ্য বড় হলে ভূপৃষ্ঠ অধিক সময় সৌরশক্তি গ্রহণ করার সময় পায়। ফলে ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডল অধিক উষ্ণ হয়। পক্ষান্তরে কোনো স্থানে রাতের দৈর্ঘ্য বড় হলে স্বল্প সময়ের জন্য সে স্থান সৌরশক্তি গ্রহণ করার সময় পায়, ফলে তাপমাত্রা কম হয়।

বায়ুর তাপ: বায়ুর উষ্ণ ও শীতল অবস্থাকে বায়ুর তাপ বলে। সূর্যরশ্মি বা সৌরশক্তি বায়ুমণ্ডল উষ্ণতার প্রধান কারণ।

ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তাপশক্তির স্থানান্তর: ভূপৃষ্ঠ ও বায়ুমণ্ডলের মধ্যে তাপশক্তি তিন ধরনের প্রক্রিয়ায় স্থানান্তরিত হয়- বিকিরণ, পরিবহণ ও পরিচলন।

বিকিরণ প্রক্রিয়া: তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ বস্তুর বিনিময় ছাড়াই দুইটি বস্তুতে শক্তি (তাপ ও আলো উভয়ই) স্থানান্তরিত করতে পারে। সৌরশক্তির ক্ষেত্রেও তাই ঘটে। বিকিরণ প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে সুনির্দিষ্ট মাপের কিছু তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে। আবার বিকিরণ প্রক্রিয়ায় পৃথিবী তাপ হারিয়ে শীতল হয়।

পরিবহণ: এ প্রক্রিয়ায় একটি উত্তপ্ত বস্তু এর সংলগ্ন বস্তুকে উত্তপ্ত করে। এভাবে পদার্থের মধ্যে উত্তাপ এক অংশ থেকে অন্য অংশে স্থানান্তর হয়। উত্তাপের এ ধরনের স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয়।

পরিচলন: পরিচলন প্রক্রিয়ায় পদার্থের উত্তপ্ত কণাগুলো তাপসহ অপেক্ষাকৃত উষ্ণ স্থান থেকে শীতল অংশে গিয়ে তাপ স্থানান্তর করে। এ প্রক্রিয়া তরল এবং গ্যাসের ক্ষেত্রে হয়। এ ক্ষেত্রে উত্তপ্ত তরল বা গ্যাস হালকা হয়ে ওপরে উঠে আসে এবং পার্শ্ববর্তী ঠান্ডা তরল গ্যাস খালি জায়গা দখল করে। এভাবে বায়ুমণ্ডলের তাপ স্থানান্তর হয়।

সূর্যরশ্মি বিকিকরণ প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূপৃষ্ঠে পৌঁছে। পরিবহণ প্রক্রিয়ায় ভূপৃষ্ঠ উত্তপ্ত হয় এবং পরিচলন প্রক্রিয়ায় পানি ও বায়ুমণ্ডলের উত্তাপের বিনিময় হয়।
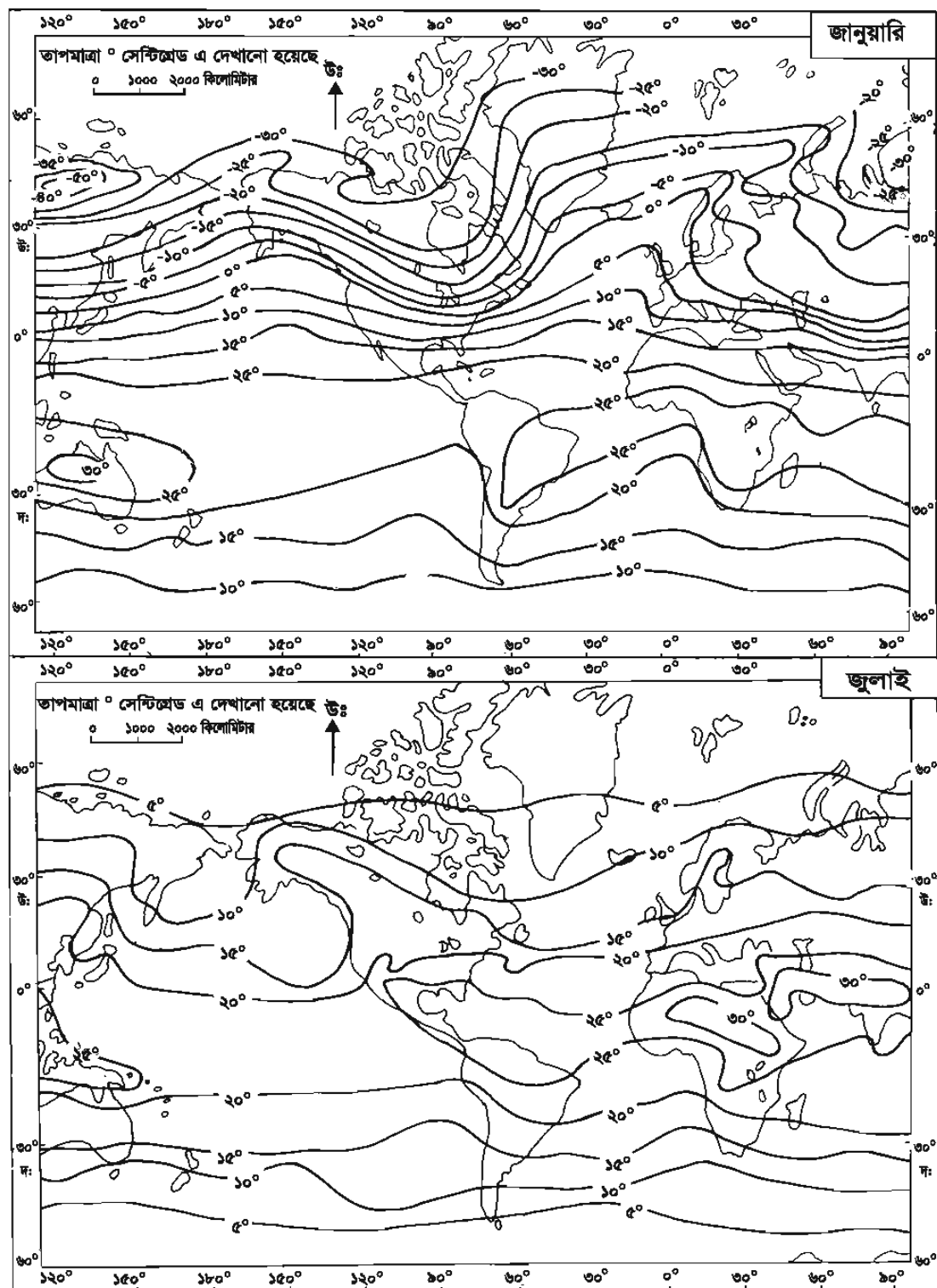
চিত্র ৩৯ : সমোষ্ণরেখার বিন্যাস

তাপমাত্রার বন্টন: ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা অক্ষাংশ, উচ্চতা এবং ঋতুভেদে তারতম্য ঘটে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির কারণে কোনো অবস্থানের তাপমাত্রার পরিবর্তন হয়। তা ছাড়া বায়ুপ্রবাহের কারণেও তাপের তারতম্য ঘটে থাকে। ভূপৃষ্ঠে স্থানীয় তাপমাত্রার এ ধরনের পরিবর্তনশীলতা সত্ত্বেও এর একটি গড় ঋতুভিত্তিক তাপবিন্যাসের চিত্র লক্ষ করা যায়। বায়ুর তাপমাত্রার বন্টন দেখানোর জন্য সমোষ্ণরেখা ব্যবহার করা হয়। বায়ুর সমতাপ সম্পন্ন বিন্দুগুলোকে মানচিত্রের ওপর সংযুক্তকারী রেখাকে সমোষ্ণরেখা (Isotherm) বলে। সমোষ্ণরেখা একটি সময়ের সব বিন্দুর তাপমাত্রা অথবা বহু দিন বা এক বছরের কয়েক মাসের গড় তাপমাত্রা প্রকাশ করে। ভূপৃষ্ঠে জানুয়ারি ও জুলাই মাসের অনুভূমিক তাপবিন্যাস সমোষ্ণরেখার সাহায্যে (চিত্র ৩৯) দেখানো হল। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এ সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা উত্তর এবং দক্ষিণ গোলার্ধের মধ্যে পাল্টে যায়। যেমন, জানুয়ারি মাসে উত্তর গোলার্ধে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন এবং জুলাই মাসে সর্বোচ্চ থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধে এর বিপরীত অবস্থা বিরাজ করে।

বায়ুর চাপ

যে কোনো পদার্থের মতো বায়ুর নিজস্ব ওজন আছে। বায়ুর এ ওজনজনিত কারণে যে চাপের সৃষ্টি হয় তাই বায়ুর চাপ (Air Pressure)।

চাপ বলয় (Pressure Belt)

ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অক্ষাংশের তাপের পার্থক্য এবং গোলাকার পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে বায়ুমণ্ডলের নিম্নতম স্তরে কয়েকটি চাপমণ্ডলের সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোকে চাপ বলয় বলে (চিত্র ৪০)।

(১) নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় (Equatorial low pressure belt): নিরক্ষরেখার উভয় পাশে ০° থেকে ৫° অক্ষাংশ পর্যন্ত এই বলয় অবস্থিত। এই অঞ্চলে সূর্য সারা বছর লম্বভাবে কিরণ দেয়। এই অঞ্চলের বায়ু পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বায়ু অপেক্ষা উষ্ণ ও লঘু তাই বায়ুর চাপ কম। এখানে জলভাগও বেশি। ফলে এ অঞ্চলে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। একে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় বলে।

(২) ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় (Tropical high pressure belt): নিরক্ষীয় উষ্ণ, আর্দ্র ও লঘু বায়ু যতই ওপরে উঠে ততই শীতল হতে থাকে। কিন্তু নিচ থেকে উষ্ণ বায়ু অনবরত ওপরে উঠায় এ বায়ু নিরক্ষীয় অঞ্চলে নিচে নামতে পারে না। ফলে ওপরের বায়ু উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হতে থাকে। এভাবে ২৫° থেকে ৩০° ক্রান্তীয় প্রদেশে এসে শীতল ও ভারি বায়ু নিচে নামতে থাকে। এভাবে উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের ২৫° থেকে ৩৫° মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুইটি উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এ চাপ বলয় দুইটিকে যথাক্রমে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় বলে।

চিত্র ৪০ : চাপ বলয়

(৩) উপ-মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয় (Sub-Polar low pressure belt): দুই মেরুবৃত্ত প্রদেশে পৃথিবীর আবর্তনের বেগ বেশি। ফলে এ অঞ্চলের বায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে সরে যায়। তখন দুই মেরুবৃত্তে (৬০° থেকে ৭০° অক্ষাংশের মধ্যে) বায়ুর চাপ হ্রাস পেয়ে দুইটি নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়। এ দুইটিকে উপ-মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয় বলে।
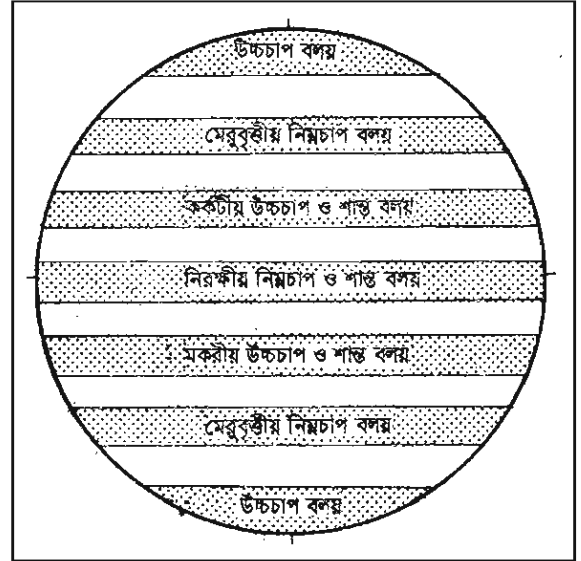
(৪) মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় (Polar high pressure belt): দুই মেরুর নিকটবর্তী স্থানে অত্যধিক শীতের জন্য বায়ু সর্বদা শীতল ও ভারি হয়। ফলে মেরু অঞ্চলে দুইটি উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এ দুইটিকে মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় বলে। এই উচ্চচাপ বলয়দ্বয় থেকে বায়ু মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয়দ্বয়ের নিকট প্রবাহিত হয়।

চাপের মান মিলিবারে (mb) দেখানো হয়। সমুদ্র সমতলে ৬.৪৫ বর্গ সেন্টিমিটার পরিমিতি স্থানে বায়ুর ওজন বা চাপ প্রায় ৬.৭ কেজি। উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে এ বায়ুর চাপ হ্রাস পায়। আন্তর্জাতিকভাবে সমুদ্র সমতলকে বায়ুচাপ পরিমাপের জন্য শূন্য উচ্চতা ধরা হয়। ব্যারোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে বায়ুর চাপ পরিমাপ করা হয়। যেসব স্থানে বায়ুমণ্ডলীয় গড় চাপ সমান সেসব স্থানগুলোকে মানচিত্রের ওপর যে রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয় তাকে সমচাপরেখা (Isobar) বলে। অধিক চাপবিশিষ্ট এলাকা থেকে বায়ু নিম্নচাপ এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়।

বায়ুপ্রবাহ (Wind Movement)

সূর্যতাপ ও বায়ুচাপের পার্থক্যের জন্য বায়ু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। বায়ুর এ গতিশীল অবস্থাকে বায়ুপ্রবাহ বলে। বায়ুপ্রবাহের কিছু সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন-

১। উচ্চচাপ বলয় থেকে শীতল ও ভারি বায়ু নিম্নচাপ বলয়ে প্রবাহিত হয়;

২। ফেরেলের সূত্র অনুসারে বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়।

পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, নিয়ত বায়ু, সাময়িক বায়ু, স্থানীয় বায়ু ও অনিয়মিত বায়ু।

নিয়ত বায়ু (Planetary Winds)

এ বায়ু পৃথিবীর চাপ বলয়গুলো দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে সারা বছর একই দিকে প্রবাহিত হয়। নিয়ত বায়ু তিন প্রকার। যথা- অয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু ও মেরু বায়ু। চিত্রের সাহায্যে পৃথিবীর নিয়ত বায়ুপ্রবাহের গতিপথ দেখানো হল (চিত্র ৪১)।

অয়ন বায়ু: বিষুবীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেওয়ায় বায়ু উষ্ণ হয়ে ওপরের দিকে ওঠে। ওপরে চাপ কম থাকায় বায়ু ফাঁকা জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বায়ু শীতল হতে থাকে। এ শীতল বায়ু নিচের ক্রমাগত গরম বায়ুর জন্য নিচে নামতে পারে না। তাই উঁচু দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে এগুতে থাকে। প্রায় ৩০° অক্ষাংশ বরাবর এর কিছু বায়ু নিচে নেমে তা আবার বিষুবীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। একে অয়ন বায়ু বলে। ৩০° অক্ষাংশের বিষুবরেখা অভিমুখী অয়ন বায়ু ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী উত্তর গোলার্ধে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে থাকে। উত্তর গোলার্ধের অয়ন বায়ুকে উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু বলে এবং দক্ষিণ গোলার্ধের অয়ন বায়ুকে দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু বলে। এর উৎস উচ্চচাপ সম্পন্ন এলাকায় হওয়ায় এখানকার আবহাওয়া মেঘমুক্ত, উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে। পৃথিবীর বড় বড় মরুভূমিগুলো এ এলাকার কাছাকাছি অবস্থিত। যেমন, উত্তর গোলার্ধে সাহারা, লিবিয়া, আরব এবং দক্ষিণ গোলার্ধে কালাহারি।

চিত্র ৪১ : নিয়ত বায়ুপ্রবাহ

পশ্চিমা বায়ু: ৩০° অক্ষাংশে কিছু বায়ু পৃথিবীর গা-ঘেঁষে মেরুর দিকে ৬০° অক্ষাংশ পর্যন্ত পৌঁছালে মেরু এলাকা থেকে আগত শীতল ও ভারি বায়ুর মুখোমুখি হয়। এখানে অপেক্ষাকৃত উষ্ণ ও হালকা বায়ু ওপরের দিকে উঠে এক অংশ মেরুবৃত্তের নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়, একে পশ্চিমা বায়ু বলে। উত্তর গোলার্ধে এ দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। উত্তর গোলার্ধে স্থলভাগের আয়তন বেশি বলে স্থানীয়ভাবে এ বায়ুর গতির বেশ পরিবর্তন ঘটে। তবে দক্ষিণ গোলার্ধে পানির ভাগ বেশি থাকায় পশ্চিমা বায়ু বাধাহীনভাবে প্রবাহিত হয়। প্রায় ৪০° দক্ষিণ থেকে ৪৭° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত পশ্চিমা বায়ুর গতিবেগ সবচেয়ে বেশি। এ অঞ্চলকে গর্জনশীল চল্লিশ (Roaring Forties) বলে। এই বায়ুপ্রবাহকে প্রবল পশ্চিমা বায়ু (Brave west winds) বলে।

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু উচ্চচাপ বলয় থেকে নিয়মিতভাবে আরো দুইটি বায়ুপ্রবাহ মেরুবৃত্ত প্রদেশীয় নিম্নচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হয়। এদের উত্তর-পূর্ব মেরু বায়ু ও দক্ষিণ-পূর্ব মেরু বায়ু বলে।

এভাবেই উত্তর-দক্ষিণ উভয় গোলার্ধে নিয়ত বায়ুপ্রবাহসমূহ (অয়ন, পশ্চিমা ও মেরু বায়ু) বিষুবরেখা ও মেরুর মধ্যে প্রবাহিত হয়। এর সাহায্যে পৃথিবীর উষ্ণ ও শীতল এলাকার মধ্যে তাপের ভারসাম্য রক্ষা হয়।

সাময়িক বায়ু

দিনের কোনো নির্দিষ্ট সময়ে অথবা বছরের কোনো নির্দিষ্ট ঋতুতে যে বায়ুপ্রবাহ জল ও স্থলভাগের তাপের তারতম্যের জন্য সৃষ্টি হয় তাকে সাময়িক বায়ু বলে। যেমন, মৌসুমি বায়ু, স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু।

মৌসুমি বায়ু: আরবি ভাষায় 'মওসুম' শব্দের অর্থ ঋতু। এ বায়ুর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এর দিক পরিবর্তন হয়। মৌসুমি বায়ু একটি আঞ্চলিক বায়ু। প্রধানত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেখা যায়। তা ছাড়া উত্তর অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার কিছু অংশ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ লক্ষ করা যায়। গ্রীষ্মকালে মধ্য অক্ষাংশ বরাবর অর্থাৎ ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে প্রচণ্ড উত্তাপে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ সময় পার্শ্ববর্তী সমুদ্র থেকে আর্দ্র ও অপ্লবনশীল বায়ু মহাদেশের দিকে প্রবাহিত হয়। ফেরেলের সূত্র অনুসারে নিরক্ষীয় রেখা অতিক্রম করে এ বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুতে পরিণত হয়। অতঃপর স্থলভাগে প্রবেশ করে উঁচু পর্বতের গায়ে বাধাপ্রাপ্ত হলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

শীতকালে এশিয়ার অভ্যন্তর ভাগ অত্যধিক শীতল থাকে এবং সেখানে একটি উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। স্থলভাগের এ উচ্চচাপ কেন্দ্র থেকে শীতল বায়ু উত্তর-পূর্ব দিক থেকে মহাসাগরের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। স্থলভাগের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এ বায়ুতে জলীয়বাষ্প থাকে না। এ কারণে শীতকালে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার অঞ্চলগুলো প্রায় বৃষ্টিহীন থাকে। এ বায়ু বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় জলীয়বাষ্প গ্রহণ করে শ্রীলঙ্কা ও তামিলনাড়ু উপকূলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। তবে এ বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করার পর ফেরেলের সূত্র অনুসারে উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুরূপে উত্তর অস্ট্রেলিয়াতে পৌঁছে এবং ভারত মহাসাগর থেকে সংগৃহীত জলীয়বাষ্পের সাহায্যে সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়।

স্থল ও সমুদ্রবায়ু: উপকূলে সকালের সূর্যতাপ স্থানীয় ভূমির তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয় এবং একটি নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়, ফলে নিকটস্থ সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয় (চিত্র ৪২)। একে সমুদ্রবায়ু বলে। বিকালে এ বায়ুর বেগ সবচেয়ে বেশি হয়। বিকালের দিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় ঐ নিম্নচাপ অঞ্চলে সমুদ্রের উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়।

সূর্যাস্তের পর সমুদ্রের চেয়ে স্থলভাগ দ্রুত শীতল হয়। তখন স্থলভাগে উচ্চচাপ বিরাজ করে। স্থলভাগের এই উচ্চচাপ থেকে তখন বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয় (চিত্র ৪২)। একে স্থলবায়ু বলে।

স্থানীয় বায়ু: স্থানীয় প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও তাপমাত্রার তারতম্যের কারণে যে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকে স্থানীয় বায়ু বলে। পৃথিবীতে প্রায় কয়েকশ স্থানীয় বায়ুপ্রবাহ আছে। যেমন, উপত্যকা ও পার্বত্য বায়ু।
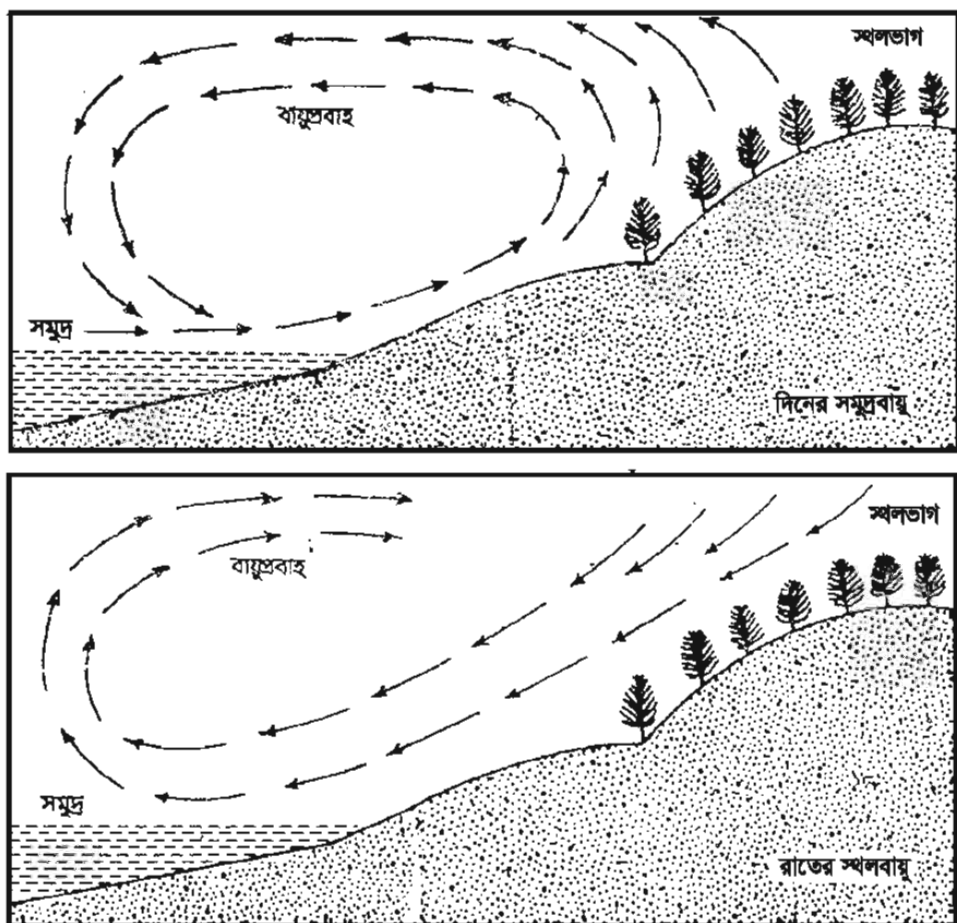
চিত্র ৪২ : স্থল ও সমুদ্রবায়ু

উপত্যকা ও পার্বত্য বায়ু: ভূমির বন্ধুতার জন্য পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষ প্রকারের বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয়। দিনের বেলায় উপত্যকার তলদেশ অপেক্ষা পর্বত গাত্র অধিকতর উষ্ণ হয়। ফলে উপত্যকার তলদেশে উচ্চচাপ এবং পর্বতের পার্শ্বদেশে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। এ কারণে দিনের বেলায় পর্বতের গা বেয়ে ওপরের দিকে যে বায়ু প্রবাহিত হয় তাকে উপত্যকা বায়ু বলে (চিত্র ৪৩)।

রাতের বেলায় তাপ বিকিরণের ফলে পর্বত গাত্র শীতল হয়। এ সময় উপত্যকা তুলনামূলকভাবে উষ্ণ থাকে। ফলে শীতল ও ভারি বায়ু পর্বতের গা বেয়ে নিচের দিকে নেমে আসে। রাতের বেলায় যে বায়ু পর্বতের গা বেয়ে উপত্যকার নিচের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে পার্বত্য বায়ু বলে (চিত্র ৪৩)।
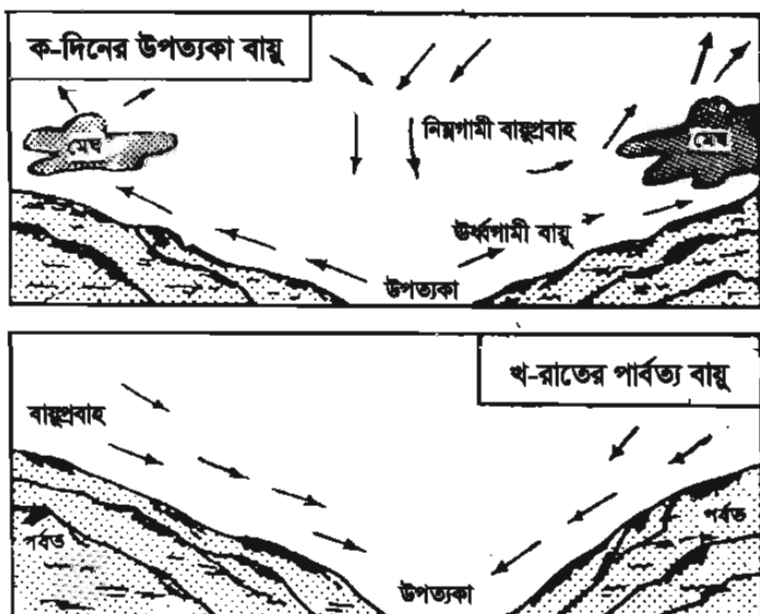
চিত্র ৪৩ : উপত্যকা ও পার্বত্য বায়ু

অনিয়মিত বায়ু: কোনো স্থানে অধিক উত্তাপের জন্য বায়ুর চাপ কমে যায় এবং নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়। আবার অত্যধিক শৈত্যের জন্য কোনো স্থানের বায়ু শীতল হলে উচ্চচাপের সৃষ্টি হয়। ফলে যে বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি হয় তাকে অনিয়মিত বায়ু বলে। যেমন, ঘূর্ণিবাত ও প্রতীপ ঘূর্ণিবাত।

বায়ুর আর্দ্রতা ও বারিপাত (Atmospheric Humidity and Precipitation)

বায়ুতে জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে বায়ুর আর্দ্রতা (Humidity) বলে। বায়ুর আর্দ্রতা দুই ভাগে প্রকাশ করা যেতে পারে। যথা- পরম আর্দ্রতা ও আপেক্ষিক আর্দ্রতা। কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাণকে পরম আর্দ্রতা (Absolute Humidity) বলে।

অপরদিকে, কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে প্রকৃত জলীয়বাষ্পের পরিমাণ আর একই আয়তনের বায়ুকে একই উষ্ণতায় পরিপৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্পের প্রয়োজন এ দুইটির অনুপাতকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity) বলে।

বায়ুর আর্দ্রতা মূলত জলীয়বাষ্প নির্ভর। বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় উন্মুক্ত জলাশয় (সমুদ্র, নদী, ক্ষুদ্র জলাশয়) এবং উদ্ভিদ থেকে জলীয়বাষ্পের সৃষ্টি হয়।

কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ু যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে, সেই পরিমাণ জলীয়বাষ্প বায়ুতে থাকলে বায়ু আর জলীয়বাষ্প গ্রহণ করতে পারে না। তখন সেই বায়ুকে পরিপৃক্ত বায়ু বলে।

বায়ু শীতল হতে থাকলে পূর্বের মতো বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করে রাখতে পারে না তখন জলীয়বাষ্পের কিছু অংশ জলকণায় পরিণত হয়। একে ঘনীভবন (Condensation) বলে। বায়ুর যে উষ্ণতায় জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয় তাকে শিশিরাঙ্ক (Dew point) বলে। তাপমাত্রা ০° সেলসিয়াস বা হিমাঙ্কের (Freezing point) নিচে নেমে গেলে তখন ঘনীভূত জলীয়বাষ্প কঠিন আকার ধারণ করে এবং তুষার ও বরফরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। কিন্তু হিমাঙ্ক শিশিরাঙ্কের ওপরে থাকলে ঘনীভবনের মাধ্যমে শিশির, কুয়াশা অথবা বৃষ্টিতে পরিণত হয়।

তুষার: শীতপ্রধান এলাকায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে নামলে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পেঁজা তুলার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। একে তুষার (Snow) বলে।

শিশির: ভূপৃষ্ঠ তাপ বিকিরণের মাধ্যমে রাত্রে শীতল হয়। এ সময় ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ফলে বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কমে যায় এবং অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে ক্ষুদ্র জলবিন্দুরূপে ভূপৃষ্ঠে সঞ্চিত হয়। এই শিশির (Dew) নামে পরিচিত। শীতপ্রধান এলাকায় ভূপৃষ্ঠের তাপ অত্যন্ত কমে গেলে শিশির জমাট বেঁধে হিমকণায় (Frost) পরিণত হয়।

কুয়াশা: শীতকালে ঠান্ডা ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে নিম্ন বায়ুস্তরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়। ফলে বায়ুর জলীয়বাষ্প ভাসমান ধূলিকণাকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণারূপে ঘনীভূত হয় এবং ভূপৃষ্ঠের ওপর ধোঁয়ার ন্যায় ভাসমান অবস্থায় থাকে। একে কুয়াশা (Fog) বলে।

বৃষ্টিপাত (Rainfall): জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঊর্ধ্বাকাশে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। মেঘের মধ্যে অসংখ্য পানিকণা ও বরফকণা থাকে। এ সমস্ত পানি ও বরফকণা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বড় পানির কণায় পরিণত হয়। এসব বড় কণা এক সময়ে পৃথিবীর আকর্ষণের টানে পানির ফোঁটা (Rainfall) হয়ে মাটিতে পড়ে। একে বৃষ্টিপাত বলে। বৃষ্টিপাত চার প্রকার, যথা- পরিচলন, শৈলোৎক্ষেপ, ঘূর্ণি ও সংঘর্ষ বৃষ্টি।

পরিচলন বৃষ্টি (Convectional Rain): নিম্নচাপমণ্ডলীয় বায়ু উত্তপ্ত হয়ে ওপরে ওঠে এবং প্রসারিত হয়। ফলে

সহজেই শীতল হয়ে পড়ে। এভাবে বায়ুর তাপ হ্রাস এর অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকে পরিচলন বৃষ্টি বলে (চিত্র ৪৪)।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ এলাকায় ঊর্ধ্বগামী বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকায় সেখানে নিয়মিত পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়।

চিত্র ৪৪ : পরিচলন বৃষ্টি

শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি (Orographic Rain): জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু উঁচু পাহাড় বা পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে ওপরে ওঠে এবং শীতল হয়ে পর্বতের প্রতিবাত ঢালে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি বলে (চিত্র ৪৫)। পর্বতের অপর পাশের বায়ু শুষ্ক হওয়ায় বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। একে বৃষ্টিচ্ছায় বা অনুবাত ঢাল (Leeward slope) বলে। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু মেঘালয় পাহাড়ে বাধা পাওয়ায় সিলেট এলাকায় প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি হয়।

চিত্র ৪৫ : শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি

ঘূর্ণি বৃষ্টি (Cyclonic Rain): ঘূর্ণিবাত কেন্দ্রের বায়ু ওপরে উঠে যাওয়ায় এর তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং শীতল হয়। এ সময় বায়ুর অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এরূপ বৃষ্টিপাতকে ঘূর্ণি বৃষ্টি বলে।

সংঘর্ষ বৃষ্টি (Frontal Rain): শীতল ও উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ (Air mass) মুখোমুখি হলে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং শিশিরাঙ্কে পৌঁছায়। আরো
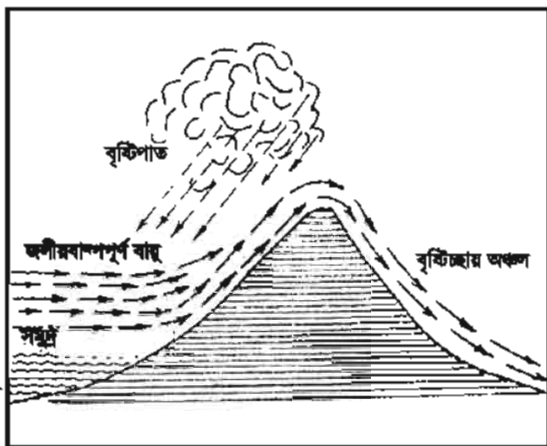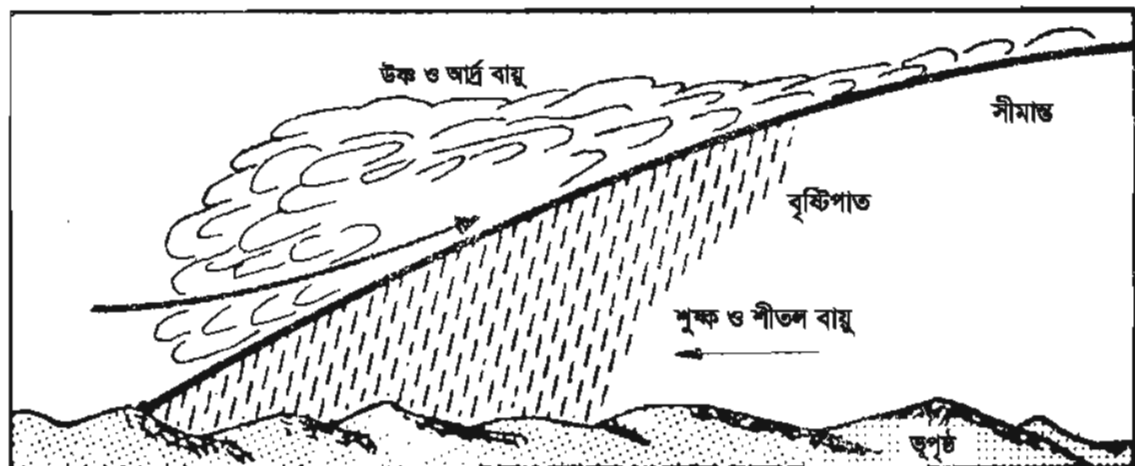
চিত্র ৪৬ : সংঘর্ষ বৃষ্টি

ঘনীভূত হয়ে বায়ুপুঞ্জের সংযোগস্থলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এটি সংঘর্ষ বৃষ্টি নামে পরিচিত (চিত্র ৪৬)। এ প্রকার বৃষ্টিপাত সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় দেখা যায়।

মৌসুমি জলবায়ু (Monsoon Climate)

মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য: পূর্বে বলা হয়েছে, মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ একটি সাময়িক বায়ু এবং শীত ও গ্রীষ্মকালে এই

বায়ু বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হওয়ায় এর গুণাবলিরও পরিবর্তন হয়। মৌসুমি বায়ুর এ ঋতুভিত্তিক বিপরীতমুখী বৈশিষ্ট্যের কারণে শীতকাল প্রায় শুষ্ক থাকে এবং গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। শীতকালীন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ স্থলভাগ থেকে প্রবাহিত হয়, ফলে বায়ু সমুদ্র অতিক্রম করে স্থলভাগে পৌঁছালে তা বৃষ্টিপাত ঘটায়। যেমন, শীতকালীন মৌসুমি বায়ুর কারণে শ্রীলঙ্কার উত্তর-পূর্ব উপকূল, তামিলনাড়ু উপকূল, পশ্চিম জাপান এবং ফিলিপাইনের পূর্ব উপকূলে বৃষ্টিপাত হয়।

গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ু সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় এ বায়ু বিপুল পরিমাণে জলীয়বাষ্প বহন করে। ফলে এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। মৌসুমি বায়ুপ্রবাহজনিত কারণে নিম্ন অক্ষাংশে শীত ও গ্রীষ্মে তাপের তেমন তারতম্য হয় না। তবে মধ্য অক্ষাংশে শীতের তীব্রতা সহজেই অনুভূত হয়। এ সময় মহাদেশীয় শীতল বায়ুপ্রবাহ মধ্য অক্ষাংশে পৌঁছায়। গ্রীষ্মকালে মধ্য অক্ষাংশে উষ্ণমণ্ডলীয় বায়ুর প্রভাব থাকে। ফলে এ সময় যথেষ্ট গরম অনুভূত হয় (চিত্র ৪৭)।
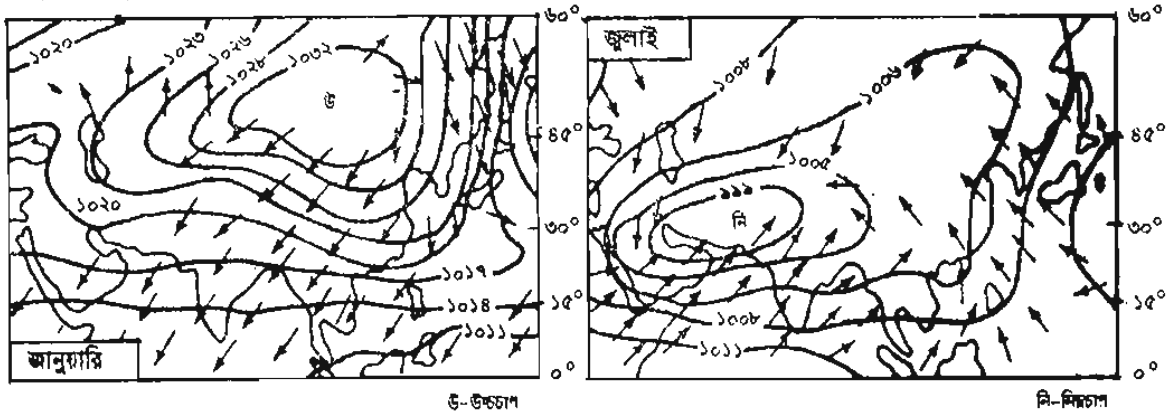
চিত্র ৪৭ : দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ

মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান: মৌসুমি জলবায়ুর সর্বাধিক বিকাশ দেখা যায় এশিয়ায়, বিশেষত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায়। এশিয়ার বিশাল আয়তন, হিমালয়ের অবস্থান এবং দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত উষ্ণ সমুদ্র, স্থলভাগ ও জলভাগের মধ্যে তাপের ব্যাপক তারতম্য সৃষ্টি করে। এ বৈষম্যের জন্য মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি ঘটে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মৌসুমি জলবায়ুর আওতাভুক্ত দেশগুলো হল ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, লাওস, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন। এ ছাড়া চীন, তাইওয়ান, জাপান, কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলেও মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব দেখা যায়।

দক্ষিণ এশিয়ার মৌসুমি জলবায়ু: বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ভারতে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাবে তিনটি ঋতু দেখা যায়। যথা-

১। **শীতকাল:** অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ পর্যন্ত।

২। **গ্রীষ্মকাল:** মার্চ থেকে মে মাসের শেষ ভাগ পর্যন্ত।

৩। **বর্ষাকাল:** জুনের প্রথম থেকে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ পর্যন্ত।

এ তিনটি ঋতুর মধ্যে বর্ষাকালই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। শীত ও গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের অবস্থা চিত্র ৪৭ এ দেখানো হয়েছে। শীতকালে বায়ুপ্রবাহ স্থলভাগ থেকে সমুদ্রের দিকে, গ্রীষ্মকালে সমুদ্র থেকে স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় সকল ঋতুতেই স্থানভেদে কমবেশি বৃষ্টিপাত হয়। তবে বর্ষাকালে বছরের প্রায় ৮০ ভাগ বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষার পরপরই এ অঞ্চলে শুরু হয় শীতকাল। শীতের স্থায়িত্ব ও তীব্রতা স্থানভেদে যথেষ্ট পার্থক্য হয়। যেমন, শীতকালে বাংলাদেশের মাঝামাঝি এলাকায় শীতের তীব্রতা কম। কিন্তু একই সময় ভারতের উত্তর প্রদেশে তীব্র শীত অনুভূত হয়। মার্চের শুরু থেকেই এ অঞ্চলে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং মে মাসে তা সর্বোচ্চ

পর্যায়ে পৌঁছে। এ সময় এ এলাকায় স্থলভাগের ওপর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয় যা সমুদ্রবায়ুকে আকর্ষণ করে। জুন মাস নাগাদ এ সমুদ্রবায়ু স্থলভাগে জোরালোভাবে পৌঁছে যায় এবং বর্ষাকাল শুরু হয়। এভাবেই মৌসুমি জলবায়ুর পূর্ণচক্র সম্পন্ন হয়।

দক্ষিণ-পূর্ব ও পূর্ব এশিয়ার মৌসুমি জলবায়ু: পূর্ব এশিয়ার শীতকালীন মৌসুমি বায়ু সাইবেরীয় বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় শীতল ও জলীয়বাষ্পহীন। এ সময় এ অঞ্চলে বায়ু প্রথমে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়, পরে দক্ষিণে বিষুবীয় এলাকা অভিমুখী হয়। এ বায়ু সমুদ্রের ওপর দিয়ে বয়ে আসার কারণে জাপানের পশ্চিম উপকূলে, ফিলিপাইনে ও দক্ষিণ চীনে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। গ্রীষ্মকালে (মে-সেপ্টেম্বর) মধ্য এশিয়ায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হওয়ায় পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অভিমুখী পার্শ্ববর্তী সমুদ্রবায়ু আসতে শুরু করে। ফলে প্রথমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং পরে পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়।

মৌসুমি জলবায়ুর গুরুত্ব: দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ায় মৌসুমি জলবায়ু কৃষির দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ সমস্ত অঞ্চলের শস্যপঞ্জি মৌসুমি জলবায়ু দ্বারা বেশিরভাগ নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন, বাংলাদেশে মৌসুমি বৃষ্টিপাত সময়মতো ও পরিমাণগত না হলে ফসল খরায় আক্রান্ত হয়।

বায়ুমণ্ডল

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

ভূপৃষ্ঠের চারপাশে বেষ্টন করে যে বায়ুর আবরণ আছে তাকেই বায়ুমণ্ডল বলে। বায়ুমণ্ডল বিভিন্ন গ্যাসের মিশ্রণে গঠিত। বিশুদ্ধ ও শুষ্ক বায়ুর প্রধান দুইটি উপাদানের নাম নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন।

বায়ুমণ্ডলীয় স্তরকে চারটি স্তরে ভাগ করা যায়। যথা- ট্রপোমণ্ডল, স্ট্রাটোমণ্ডল, মেসোমণ্ডল ও তাপমণ্ডল

আবহাওয়া ও জলবায়ু: প্রতি দিনের গড় তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা ও বারিপাতের তথ্যের ভিত্তিতে কোনো এলাকার যে অবস্থা প্রকাশ করে তাকেই আবহাওয়া বলে। সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বছরের গড় আবহাওয়ার অবস্থাকেই জলবায়ু বলে।

সৌরশক্তি: সূর্য থেকে বিকিরণের মাধ্যমে পৃথিবী ক্ষুদ্র তরঙ্গ আকারে যে শক্তি পায় তাকেই সৌরশক্তি বলে।

বিকিরণ, পরিবহণ ও পরিচলন প্রক্রিয়ার দ্বারা তাপশক্তির স্থানান্তর হয়।

বায়ুপ্রবাহ: সূর্যতাপ ও বায়ুচাপের পার্থক্যের জন্য বায়ু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। বায়ুর এ গতিশীল অবস্থাকে বায়ুপ্রবাহ বলে। বায়ু উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে প্রবাহিত হয়।

পৃথিবীর বায়ুপ্রবাহকে চারটি ভাগে করা যায়। যেমন, নিয়ত বায়ু, সাময়িক বায়ু, স্থানীয় বায়ু ও অনিয়মিত বায়ু।

স্থলবায়ু ও সমুদ্রবায়ু: উপকূলে সকালের সূর্যতাপ স্থানীয় ভূমির তাপমাত্রা বাড়িয়ে দেয়, ফলে নিকটস্থ সমুদ্রের অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয়। একে সমুদ্রবায়ু বলে।

সূর্যাস্তের পর সমুদ্রের চেয়ে স্থলভাগ দ্রুত শীতল হয়ে যায়। তখন স্থলভাগের শীতল বায়ু সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। একে স্থলবায়ু বলে।

বৃষ্টিপাত: জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঊর্ধ্বাকাশে শীতল ও ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। মেঘের মধ্যে অসংখ্য পানিকণা ও বরফকণা থাকে। এ সমস্ত পানি ও বরফকণা পরস্পরে মিলিত হয়ে বড় পানির কণায় পরিণত হয়। এসব বড় কণা এক সময় পৃথিবীর আকর্ষণের টানে পানির ফোঁটা (Rainfall) হয়ে মাটিতে পড়ে। বৃষ্টিপাত চার প্রকার- পরিচলন, শৈলোৎক্ষেপ, ঘূর্ণি ও সংঘর্ষ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। **পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রভাবে–**

ক. বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইড হ্রাস পায় খ. পুনঃপুন জলোচ্ছ্বাস সংঘটিত হয়

গ. জীব বৈচিত্র্য বিনষ্ট হয় ঘ. সবুজ বনাঞ্চল ধ্বংস হয়

২। **মৌসুমি বায়ুর বৈশিষ্ট্যসমূহ হল–**

i. মৌসুমি বায়ু একটি আঞ্চলিক বায়ু

ii. ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এর দিক পরিবর্তন হয়

iii. প্রধানত দক্ষিণ এশিয়ায় এর সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii

খ. i এবং iii

গ. ii এবং iii

ঘ. i, ii এবং iii

নিচের চিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
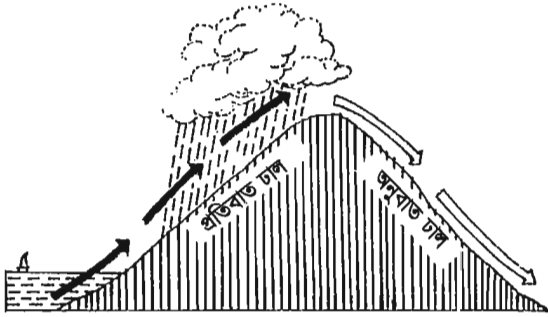
৩। **উপরের চিত্রটি কী ধরনের বৃষ্টিপাত নির্দেশ করে?**

ক. পরিচলন খ. সংঘর্ষ

গ. ঘূর্ণি ঘ. শৈলোৎক্ষেপ

৪। **মধ্যপ্রাচ্যে অনেক পর্বত থাকা সত্ত্বেও চিত্রে অঙ্কিত শ্রেণীর বৃষ্টিপাত হয় না কেন?**

i. সমুদ্র থেকে অনেক দূরে বলে

ii. মরুভূমির আধিক্যের কারণে

iii. বায়ু জলীয়বাষ্পহীন থাকার কারণে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii

খ. ii এবং iii

গ. i এবং iii

ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিম্নের চিত্রের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
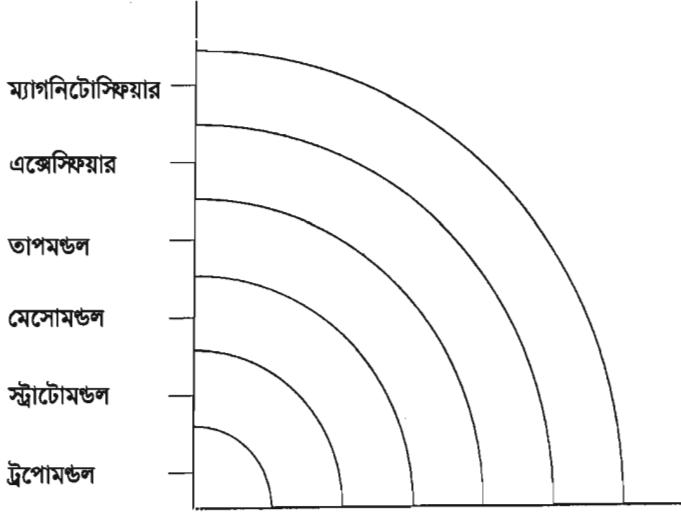
ক. উপরের চিত্রটি কী প্রদর্শন করে?

খ. ট্রপোমণ্ডল গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. প্রাণিজগতের জন্য চিত্রে বর্ণিত কোন স্তরটি অতি গুরুত্বপূর্ণ এবং কেন তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ওজোন স্তরের ক্ষতিই পৃথিবীর তাপ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ' বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

বারিমণ্ডল

HYDROSPHERE

বারিমণ্ডলের সংজ্ঞা: যে বিশাল পানিরাশিতে ভূত্বকের নিচু অংশগুলো পরিপূর্ণ রয়েছে তাকে বারিমণ্ডল বলে। বারিমণ্ডল ভূপৃষ্ঠের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ দখল করে রয়েছে। এর আয়তন প্রায় ৩৬ কোটি ২৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ প্রভৃতি নিয়ে বারিমণ্ডল গঠিত। উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ পানিরাশিকে মহাসাগর (Ocean) বলে। মহাসাগরের চেয়ে আয়তনে ছোট পানিরাশিকে সাগর (Sea) বলে। তিনদিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত পানিরাশিকে উপসাগর (Bay) বলে, প্রায় চারদিক স্থল দ্বারা বেষ্টিত পানিরাশিকেও উপসাগর (Gulf) বলে। চারদিকে সম্পূর্ণভাবে স্থল দ্বারা বেষ্টিত প্রাকৃতিক পানিরাশিকে হ্রদ (Lake) বলে।

মহাসাগর (Ocean)

পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে, এগুলোর নাম যথাক্রমে প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর এবং দক্ষিণ মহাসাগর। এগুলোর মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর সবচেয়ে বড়, এর আয়তন প্রায় ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। প্রশান্ত মহাসাগরের গড় গভীরতাও সবচেয়ে বেশি; ৪,২৭০ মিটার। আয়তনের দিক থেকে আটলান্টিক মহাসাগরের স্থান দ্বিতীয়; এর আয়তন ৮ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার। অবশ্য গড় গভীরতার দিক থেকে আটলান্টিকের স্থান তৃতীয়; ৩,৯৩২ মিটার। ভগ্ন উপকূল বিশিষ্ট আটলান্টিক মহাসাগরের অনেকগুলো প্রায় বেষ্টিত সাগর রয়েছে। ভারত মহাসাগরের আয়তন ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং এর গড় গভীরতা ৩,৯৬২ মিটার। পৃথিবীর উত্তর মেরুর চারদিকে উত্তর মহাসাগর রয়েছে। এ মহাসাগরের দক্ষিণ প্রান্ত উত্তর আমেরিকা ও ইউরেশিয়া দ্বারা প্রায় বেষ্টিত। উত্তর মহাসাগরের আয়তন ১ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং এর গড় গভীরতা ৮২৪ মিটার। দক্ষিণ মহাসাগরের আয়তন ১ কোটি ৪৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং এর গড় গভীরতা ১৪৯ মিটার (চিত্র ৪৮)।

সারণি ২ : মহাসাগরের আয়তন ও গড় গভীরতা

মহাসাগর	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	গড় গভীরতা (মিটার)
প্রশান্ত	১৬ কোটি ৬০ লক্ষ	৪,২৭০
আটলান্টিক	৮ কোটি ২৪ লক্ষ	৩,৯৩২
ভারত	৭ কোটি ৩৬ লক্ষ	৩,৯৬২
উত্তর	১ কোটি ৫০ লক্ষ	৮২৪
দক্ষিণ	১ কোটি ৪৭ লক্ষ	১৪৯

মহাসাগরীয় স্রোতের সংজ্ঞা: মহাসাগরের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পানির নির্দিষ্ট ও নিয়মিত গতিকে মহাসাগরীয় স্রোত বা সমুদ্রস্রোত (Ocean Current) বলে।

মহাসাগরীয় স্রোতের কারণ: মহাসাগরীয় স্রোতের উৎপত্তির কারণগুলো নিচে উল্লেখ করা হল।

১। বায়ুপ্রবাহ
২। উষ্ণতার তারতম্য
৩। লবণাক্ততার তারতম্য
৪। বাষ্পীভবনের তারতম্য
৫। গভীরতার তারতম্য
৬। পৃথিবীর আবর্তন
৭। স্থলভাগের অবস্থান
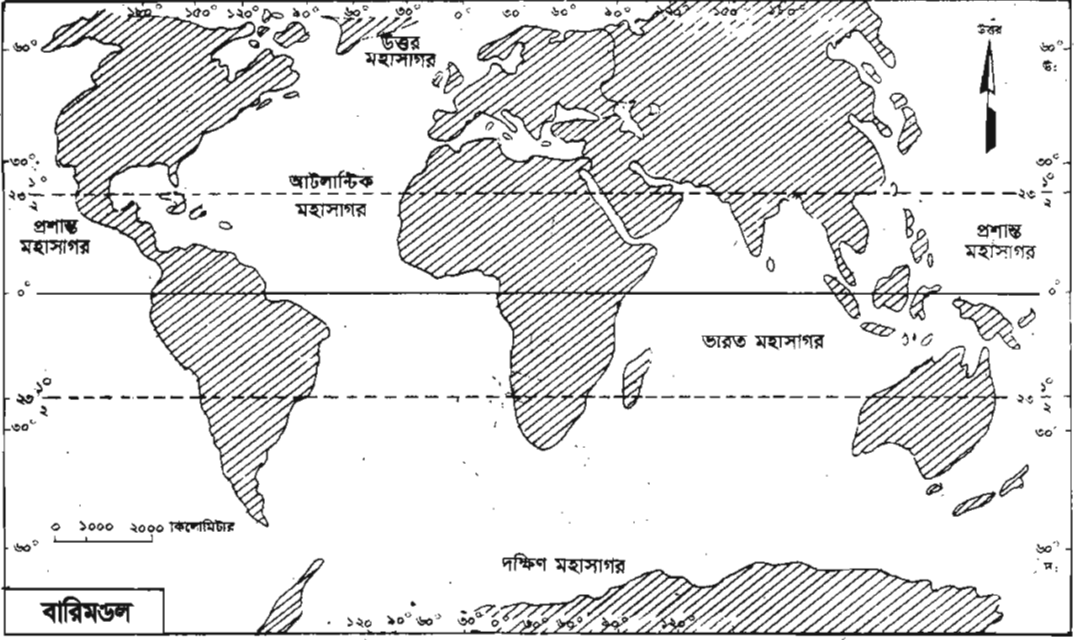
চিত্র ৪৮ : পৃথিবীর মহাসাগরসমূহের অবস্থান

১। বায়ুপ্রবাহ: প্রবল নিয়ত বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রপৃষ্ঠের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় সমুদ্রের ওপরের স্তরের পানিরাশিকে একই দিকে চালিত করে। সুতরাং বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রস্রোতের প্রধান কারণ। অয়ন বায়ু প্রবাহিত এলাকায় সমুদ্রস্রোত পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে এবং পশ্চিমা বায়ু প্রবাহিত এলাকায় সমুদ্রস্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় (চিত্র ৪৯)।

২। উষ্ণতার তারতম্য: অক্ষাংশভেদে মহাসাগরের উপরিভাগে উষ্ণতার তারতম্য হয়। অধিক উত্তাপে নিরক্ষীয় ও ক্রান্তীয় অঞ্চলের পানি বেশি উত্তপ্ত হয়ে আয়তনে বেড়ে যায়, হালকা হয় ও এর ঘনত্ব কমে যায়। কিন্তু উচ্চ ও মধ্য অক্ষাংশের দেশগুলো কম উত্তাপ পায় বলে সেখানে সমুদ্রের পানি ভারি হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের উষ্ণ ও হালকা পানি শীতল মেরু অঞ্চলের দিকে পৃষ্ঠপ্রবাহরূপে প্রবাহিত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলের এ শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য মেরু অঞ্চলের শীতল ও ভারি পানি অন্তঃপ্রবাহরূপে নিরক্ষীয় অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।
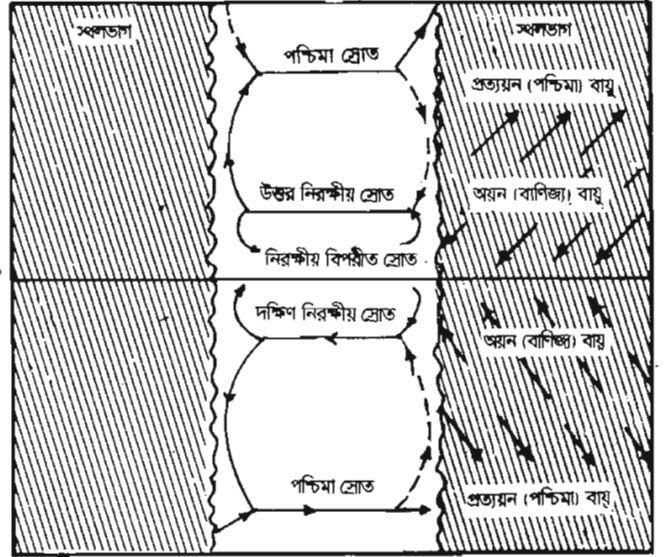
চিত্র ৪৯ : সমুদ্রস্রোতের ওপর বায়ুপ্রবাহের প্রভাব

৩। লবণাক্ততার তারতম্য: লবণাক্ততার ওপর পানির ঘনত্ব নির্ভর করে। লবণাক্ততা কম হলে পানি হালকা হয় এবং লবণাক্ততা বেশি হলে পানি ভারি হয়। হালকা পানি বহিঃস্রোত হিসেবে এবং ভারি পানি অন্তঃস্রোত হিসেবে প্রবাহিত হয় (চিত্র ৫০)।

৪। বাষ্পীভবনের তারতম্য: সমুদ্রের অধিক উত্তাপ বিশিষ্ট এলাকায় বাষ্পীভবন বেশি হয়, ফলে সেখানে পানির উচ্চতা কমে যায়। কাছাকাছি কম উত্তপ্ত এলাকা থেকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা পানি অধিক উত্তাপ বিশিষ্ট এলাকার দিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রের পানির সমতা রক্ষা করে।

৫। গভীরতার তারতম্য: অগভীর সমুদ্রের পানি তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত ও হালকা হয় এবং ওপরে উঠে আসে। তখন ওপরে উঠে আসা পানির স্থান পূরণের জন্য শীতল নিম্নগামী একটি পানির প্রবাহ সৃষ্টি হয়। ফলে সমুদ্রে উর্ধ্বগামী ও নিম্নগামী স্রোতের সৃষ্টি হয়।

৬। পৃথিবীর আবর্তন: পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করছে। এর ফলে সমুদ্রস্রোত উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়।

৭। স্থলভাগের অবস্থান: সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হওয়ার সময় সামনে কোনো স্থলভাগ থাকলে এর গতি বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং স্রোত দিক পরিবর্তন করে নতুন পথে প্রবাহিত হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত ব্রাজিলের পূর্বাংশের সেন্টরক অন্তরীপে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল দিয়ে এবং অন্য শাখা দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।
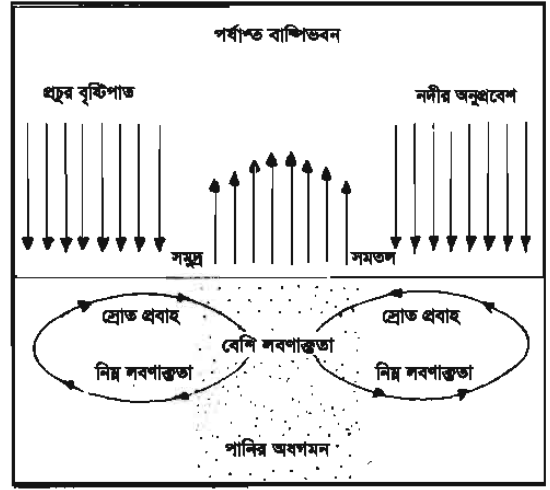
চিত্র ৫০ : সমুদ্র পানিতে বাষ্পীভবন ও লবণাক্ততার প্রভাব

বিভিন্ন মহাসাগরীয় স্রোত: সমুদ্রের পানি কখনই এক স্থানে স্থির থাকে না। সবগুলো সাগর ও মহাসাগরের পানি সব সময় পৃষ্ঠস্রোত বা অন্তঃস্রোত হিসেবে প্রবাহিত হচ্ছে। এ জন্য সমুদ্রস্রোতগুলোকে মহাসাগরীয় অবস্থান অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়।

(ক) আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত
(খ) প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত
(গ) ভারত মহাসাগরীয় স্রোত

উত্তর মহাসাগর বছরের বেশিরভাগ সময় বরফাচ্ছন্ন থাকে বলে সেখানে কোনো নিয়ত স্রোত প্রবাহিত হয় না।

আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত (Currents of the Atlantic Ocean)

আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিমে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ অবস্থিত। নিরক্ষরেখা আটলান্টিক মহাসাগরকে উত্তর ও দক্ষিণ অংশে বিভক্ত করেছে। সুতরাং এ মহাসাগরের স্রোতগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

(ক) দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত
(খ) উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

(ক) দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

১। কুমেরু স্রোত: প্রবল পশ্চিমা বায়ু দ্বারা তাড়িত হয়ে এন্টার্কটিকা মহাদেশের উত্তর দিক দিয়ে যে শীতল স্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে নিয়ত প্রবাহিত হচ্ছে তা কুমেরু স্রোত নামে পরিচিত। দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ দিক দিয়ে এ স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে।

২। বেঙ্গুয়েলা স্রোত: দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় কুমেরু স্রোতের যে শাখা উত্তর দিকে ঘুরে গেছে তা দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়। এটি 'বেঙ্গুয়েলা স্রোত' নামে পরিচিত। শীতল স্রোত থেকে উৎপত্তি লাভ করায় এ স্রোত শীতল। দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে এ স্রোত ক্রমশ পশ্চিম দিকে ঘুরে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিশেছে।

৩। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত: বেঙ্গুয়েলা স্রোতের বর্ধিত অংশ থেকে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের উৎপত্তি। এই স্রোত পৃথিবীর আবর্তন গতি ও দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে উত্তর-পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে নিরক্ষরেখা পর্যন্ত পৌঁছায়। নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে এটি দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে পরিচিত। এটি একটি উষ্ণ স্রোত।

৪। ব্রাজিল স্রোত: দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখাটি ব্রাজিলের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে তা 'ব্রাজিল স্রোত' নামে পরিচিত। উষ্ণ স্রোত থেকে উৎপত্তি লাভ করায় এবং ক্রান্তীয় অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এটি একটি উষ্ণ স্রোত। মকরক্রান্তি অতিক্রম করার পর পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এ স্রোতটি ক্রমশ পূর্ব দিকে বেঁকে কুমেরু স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

৫। ফকল্যান্ড স্রোত: আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করার পর কুমেরু স্রোতের একটি শাখা উত্তর দিকে বেঁকে ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ ও আর্জেন্টিনার মধ্য দিয়ে উপকূল বরাবর উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে। এই স্রোতটি ফকল্যান্ড স্রোত নামে পরিচিত। এটি একটি শীতল স্রোত।

(খ) উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

১। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত: পৃথিবীর আবর্তন গতি এবং উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ুর প্রভাবে নিরক্ষরেখার উত্তর দিয়ে যে উষ্ণ স্রোত পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে সেটি উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত নামে পরিচিত (চিত্র ৫১)। এটি একটি উষ্ণ স্রোত।

মধ্য আটলান্টিক অতিক্রম করার পর দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের উত্তর শাখা এসে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। প্রথম শাখাটি উত্তর দিকে বেঁকে উপসাগরীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। দ্বিতীয় শাখাটি প্রথমে ক্যারিবিয়ান সাগরে ও পরে মেক্সিকো উপসাগরে পৌঁছেছে।

২। নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত: উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্যভাগ দিয়ে একটি ক্ষীণ স্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। একে নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত বলে। এটি একটি উষ্ণ স্রোত।

৩। উপসাগরীয় স্রোত: উপসাগরীয় স্রোত বস্তুত দক্ষিণ ও উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের বর্ধিত অংশ থেকে সৃষ্টি। এই মিলিত স্রোত ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে এবং দ্বীপপুঞ্জগুলোতে বাধা পেয়ে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়। এর একটি শাখা মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি নদীর প্রবল জলরাশি এই স্রোতের বেগ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। অপরিসর ফ্লোরিডা প্রণালির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসে উত্তর আটলান্টিকে প্রবেশ করে। মেক্সিকো উপসাগরে উৎপত্তি লাভ করেছে বলে এটি 'উপসাগরীয় স্রোত' নামে পরিচিত। ফ্লোরিডা প্রণালির মুখে উপসাগরীয় স্রোতের বিস্তৃতি ৬৪ থেকে ৮০ কিলোমিটার, গভীরতা ৯১৪ মিটার, গতিবেগ ঘণ্টায় প্রায় ৮ কিলোমিটার এবং উষ্ণতা ৩০° সেলসিয়াস। এই স্রোতের বর্ণ গাঢ় নীল।

উত্তর আটলান্টিকের মাঝামাঝি স্থানে এ স্রোতের উষ্ণতা ও গভীরতা কমে যায়, কিন্তু প্রসারতা বেড়ে যায়। সেখানে এ স্রোত ঘণ্টায় প্রায় ২.৫ কিলোমিটার বেগে প্রবাহিত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল বরাবর উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে উপসাগরীয় স্রোত উত্তর আটলান্টিকের মধ্যভাগে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে।

(ক) উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ, (খ) পশ্চিম গ্রিনল্যান্ড স্রোত এবং (গ) ক্যানারী স্রোত।

৪। উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ: উপসাগরীয় স্রোতের প্রথম শাখাটি 'উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ' নামে পশ্চিম ইউরোপ, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও নরওয়ের পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে উষ্ণ স্রোত হিসেবে উত্তর সাগরে প্রবেশ করেছে।

৫। পশ্চিম গ্রিনল্যান্ড স্রোত: উপসাগরীয় স্রোতের দ্বিতীয় শাখাটি উত্তর দিকে বেঁকে আইসল্যান্ড ও গ্রিনল্যান্ডের দক্ষিণ পাশ দিয়ে অগ্রসর হয়ে গ্রিনল্যান্ড ও ব্যাফিন দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী ডেভিস প্রণালির মধ্য দিয়ে উষ্ণ পশ্চিম গ্রিনল্যান্ড স্রোত নামে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়েছে।
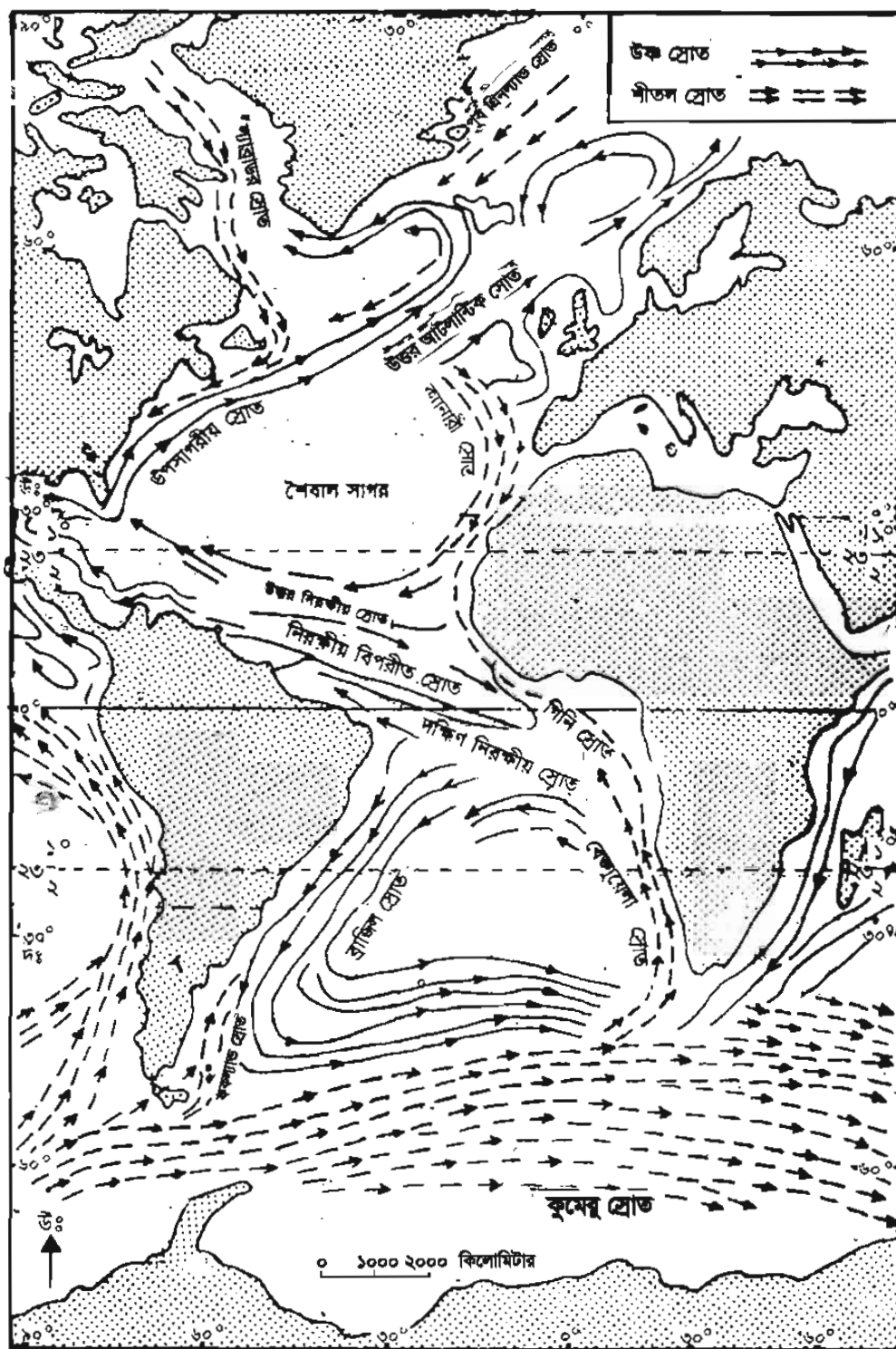
চিত্র ৫১ : আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতসমূহ

৬। ক্যানারী স্রোত: উপসাগরীয় স্রোতের তৃতীয় শাখাটি 'ক্যানারী স্রোত' নামে দক্ষিণ দিকে বেঁকে পর্তুগাল ও পশ্চিম আফ্রিকার পশ্চিম পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এ স্রোত পরে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। প্রথম শাখা অয়ন বায়ুর প্রভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে বেঁকে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এটি একটি শীতল স্রোত।

৭। গিনি স্রোত: ক্যানারী স্রোতের দ্বিতীয় শাখা পশ্চিম আফ্রিকার গিনি উপকূলের পাশ দিয়ে 'গিনি স্রোত' নামে দক্ষিণে নিরক্ষরেখা পর্যন্ত প্রবাহিত হয়েছে। সেখানে এ স্রোত নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোতের সঙ্গে মিশে গিনি উপসাগরে প্রবেশ করেছে। এটি একটি শীতল স্রোত।

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের প্রান্ত দিয়ে বিভিন্ন স্রোত প্রবাহের ফলে মহাসাগরের মাঝামাঝি স্থানে স্রোতবাহিত ডালপালা, ঘাস, শৈবাল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত হয়ে যে স্রোতহীন সাগরের সৃষ্টি হয়েছে তা 'শৈবাল সাগর' (Sargasso Sea) নামে পরিচিত (চিত্র ৫১)।

৮। ল্যাব্রাডর স্রোত: উত্তর মহাসাগর থেকে দুইটি শীতল স্রোত গ্রিনল্যান্ডের পূর্ব ও পশ্চিম পাশ দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করেছে। কানাডার ল্যাব্রাডর উপদ্বীপের উত্তরে এ দুইটি শীতল স্রোত মিলিত হয়ে ল্যাব্রাডর স্রোত নামে নিউফাউন্ডল্যান্ড ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়েছে। ল্যাব্রাডর স্রোত দক্ষিণে নিউইয়র্ক পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়ার পর উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়। উপসাগরীয় স্রোতের গাঢ় নীল পানি এবং ল্যাব্রাডর স্রোতের সবুজ পানি পাশাপাশি বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। উভয় বিপরীতধর্মী স্রোতের সীমান্ত হিমপ্রাচীর (Cold Wall) নামে পরিচিত।

বাণিজ্যের ওপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব

১। মধ্য অক্ষাংশ ও উচ্চ অক্ষাংশের সমুদ্রের পানি শীতকালে জমে যায়। ফলে তখন ঐসব সাগরের ওপর দিয়ে বাণিজ্য জাহাজ চলাচল করতে পারে না। কিন্তু যেখানে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হয় সেখানে বন্দরগুলো বরফমুক্ত থাকে এবং সারা বছর জাহাজ চলাচল করতে পারে।

২। স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চালিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে গন্তব্য বন্দরে পৌছানো যায়। কিন্তু স্রোতের প্রতিকূলে জাহাজ চালিয়ে যেতে অনেক বেশি সময়, শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয়।

৩। উষ্ণ স্রোতের গতিপথে জাহাজ চালানো নিরাপদ। শীতল স্রোতের সঙ্গে অনেক হিমশৈল ভেসে আসে। এ প্রকার হিমশৈলের সঙ্গে আঘাত লাগলে জাহাজের ক্ষতি হয় এবং জাহাজ ডুবে যায়। টাইটানিক জাহাজ এভাবেই আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে গিয়েছিল ।

৪। শীতল স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা হিমশৈল গলে গেলে হিমশৈলের সঙ্গে ভেসে আসা কাঁকর, বালি, কাদা প্রভৃতি সমুদ্রের নিচে জমে মগ্ন চড়ার সৃষ্টি করে। এ প্রকার মগ্ন চড়ায় প্রচুর মৎস্য খাদ্য পাওয়া যায় বলে প্রচুর মাছ শিকার করা যায়।

বারিমণ্ডল

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

বারিমণ্ডল: সব সময় পানিরাশি মিলিতভাবে পৃথিবীর যে প্রায় ৭১ শতাংশ অধিকার করে রয়েছে তাকে বারিমণ্ডল বলে। এর আয়তন প্রায় ৩৬ কোটি ২৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার।

পানিরাশি ও স্থলরাশি: ভূপৃষ্ঠের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৭১ ভাগ পানিরাশি এবং ২৯ ভাগ স্থলরাশির অন্তর্গত।

মহাসাগর: উন্মুক্ত বিস্তীর্ণ পানিরাশিকে মহাসাগর বলে। পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর আছে-প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর।

মহাসাগরগুলোর আয়তন: প্রশান্ত মহাসাগর ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার; আটলান্টিক মহাসাগর ৮ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার; ভারত মহাসাগর ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার; উত্তর মহাসাগর ১ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এবং দক্ষিণ মহাসাগর ১ কোটি ৪৭ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট।

মহাসাগরীয় স্রোত: মহাসাগরের ওপর দিয়ে নির্দিষ্ট ও নিয়মিত গতিতে এক স্থান থেকে অন্য স্থানের দিকে পানির প্রবাহকে মহাসাগরীয় স্রোত বা সমুদ্রস্রোত বলে।

সমুদ্রস্রোত সাধারণত তিন ভাগে বিভক্ত, যথা- (১) আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত, (২) প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত ও (৩) ভারত মহাসাগরীয় স্রোত।

উষ্ণ স্রোত সাধারণত পৃষ্ঠপ্রবাহরূপে এবং শীতল স্রোত সাধারণত অন্তঃপ্রবাহরূপে প্রবাহিত হয়।

সমুদ্রস্রোতের কারণ: বায়ুপ্রবাহ, উষ্ণতার তারতম্য, গভীরতার তারতম্য, লবণাক্ততার তারতম্য, বাষ্পীভবনের তারতম্য, পৃথিবীর আবর্তন ও স্থলভাগের অবস্থানের জন্য সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রস্রোতের ওপর সবচেয়ে বেশি প্রভাব রাখে।

দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত: দক্ষিণ আটলান্টিকের স্রোতগুলো বাম দিকে ঘুরে (বামাবর্তে বা ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে) প্রবাহিত হয়। কুমেরু স্রোত, ফকল্যান্ড স্রোত, বেঙ্গুয়েলা স্রোত, দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত, ব্রাজিল স্রোত দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবাহিত হচ্ছে। এর মধ্যে কুমেরু স্রোত, ফকল্যান্ড ও বেঙ্গুয়েলা স্রোত শীতল। অন্য স্রোতগুলো উষ্ণ।

উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত: উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতগুলো ডান দিকে ঘুরে (দক্ষিণাবর্তে বা ঘড়ির কাঁটার দিকে) প্রবাহিত হয়। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত, উপসাগরীয় স্রোত, উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ, পশ্চিম গ্রিনল্যান্ড স্রোত, ক্যানারী স্রোত, গিনি স্রোত, ল্যাব্রাডর স্রোত, নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের প্রধান স্রোত। এর মধ্যে ল্যাব্রাডর স্রোত, ক্যানারী স্রোত এবং গিনি স্রোত শীতল।

শৈবাল সাগর: উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের প্রান্ত দিয়ে বিভিন্ন স্রোত প্রবাহের ফলে পানির আবর্তের মধ্যে কোনো স্রোত থাকে না। স্রোতহীন এই পানিতে ভাসমান আগাছা ও শৈবাল সঞ্চিত হয়। একে শৈবাল সাগর বলে।

সমুদ্রস্রোতের প্রভাব: শীতকালে উচ্চ অক্ষাংশের সাগর বরফে আবৃত হয় এবং তখন সেখানে বাণিজ্য জাহাজ চলাচল করতে পারে না। ফলে উচ্চ অক্ষাংশের সাগরের তীরবর্তী বন্দর শীতকালে ব্যবসা বাণিজ্যে বাধাপ্রাপ্ত হয়। উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত সাগরে শীতকালে বরফাবৃত হয় না বলে সেখানকার বন্দরে বাণিজ্য জাহাজ চলাচল করতে পারে। শীতল স্রোতে ভেসে আসা হিমশৈলের আঘাতে জাহাজ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। ভূপৃষ্ঠের শতকরা প্রায় কত অংশ বারিমণ্ডল দ্বারা বেষ্টিত?

ক. ৩০ খ. ৪৫

গ. ৬০ ঘ. ৭০

২। লবণাক্ততা কীভাবে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি করে?

ক. লবণাক্ততার ওপর পানির ঘনত্ব নির্ভর করে

খ. লবণাক্ত পানি বেশি গতিশীল হয়

গ. লবণাক্ততার সঙ্গে বায়ুপ্রবাহের সম্পর্ক আছে

ঘ. লবণাক্ত পানি হালকা হয়

প্রদত্ত সারণির ভিত্তিতে ৩ এবং ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মহাসাগর	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	গড় গভীরতা (মিটার)
প্রশান্ত	১৬ কোটি ৬০ লক্ষ	৪২৭০
ভারত	৭ কোটি ৩৬ লক্ষ	৩৯৬২
আটলান্টিক	৮ কোটি ২৪ লক্ষ	৩৯৩২
দক্ষিণ	১ কোটি ৪৭ লক্ষ	১৪৯

৩। কোন মহাসাগরের অনেকগুলো প্রায় বেষ্টিত সাগর রয়েছে?

ক. প্রশান্ত

খ. ভারত

গ. আটলান্টিক

ঘ. দক্ষিণ

৪। নিচের কোন উক্তিটি সঠিক?

ক. প্রশান্ত মহাসাগর ভারত মহাসাগর থেকে প্রায় আড়াই গুণ বড়

খ. প্রশান্ত মহাসাগর ভারত মহাসাগর থেকে প্রায় দ্বিগুণ বড়

গ. আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগর থেকে প্রায় দেড় গুণ বড়

ঘ. আটলান্টিক মহাসাগর ভারত মহাসাগর থেকে প্রায় দ্বিগুণ বড়

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আনিস ও শাহীনা কক্সবাজারে সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে এসেছে। উভয়ই সমুদ্র সৈকতে হাঁটতে গিয়ে লক্ষ করল বিশাল বিশাল ঢেউ তাদের পায়ের কাছে এসে আছড়ে পড়ছে। আনিস এর কারণ জানতে চাইলে শাহীনা এর জবাবে সমুদ্রস্রোতের কথা উল্লেখ করেন। আনিস আবার প্রশ্ন করেন, বায়ুপ্রবাহ কী এ স্রোত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে? শাহীনা বলেন, এ স্রোত ছাড়াও পৃথিবীর সকল সাগর ও মহাসাগরের স্রোতের জন্যও বায়ুপ্রবাহ একটি প্রধান নিয়ামক।

ক. সমুদ্রস্রোত কাকে বলে?

খ. বায়ুপ্রবাহ ছাড়া সমুদ্রস্রোত উৎপত্তির অন্য যে কোনো একটি কারণ বর্ণনা কর।

গ. মানচিত্র অঙ্কন করে আটলান্টিক মহাসাগরের তিনটি স্রোত চিহ্নিত কর।

ঘ. ‘বায়ুপ্রবাহই সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তির প্রধান কারণ’–এর স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

তৃতীয় খণ্ড

আঞ্চলিক ভূগোল

REGIONAL GEOGRAPHY

অঞ্চল শব্দটি দ্বারা সর্বজনীনভাবে সমরূপীয় এক বিস্তৃত এলাকাকে বোঝানো হয়। কিছু সুনির্দিষ্ট উপাদানের ভিত্তিতে সমশ্রেণীর এলাকাগুলোকে সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত করে পারিপার্শ্বিক এলাকা থেকে সেটিকে পৃথক করাই অঞ্চল ধারণার উদ্দেশ্য। অবশ্য 'অঞ্চল' শব্দটি ব্যাপক অর্থে সচরাচর ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক অঞ্চল, রাজনৈতিক অঞ্চল, সাংস্কৃতিক অঞ্চল প্রভৃতি বিভিন্নভাবে অঞ্চলের শ্রেণীবিভাগ করা হয়। প্রাকৃতিক অঞ্চলে পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, নদী, হ্রদ, সাগর প্রভৃতি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসবই প্রকৃতির দান। এখানে মানুষের কোনো ভূমিকা নেই। পক্ষান্তরে রাজনৈতিক অঞ্চল (চিত্র ৫২) বলতে বিভিন্ন দেশের সীমানা এবং সরকারের সার্বভৌম এলাকাকে বোঝানো হয়। সাংস্কৃতিক অঞ্চল কোনো মানবগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। একইভাবে, শিল্প অঞ্চল বলতে মানুষের সৃষ্ট বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনকারী অনেকগুলো শিল্পের সমাবেশকে বোঝায়। সুতরাং রাজনৈতিক অঞ্চল, সাংস্কৃতিক অঞ্চল, শিল্প অঞ্চল প্রভৃতি নির্দিষ্ট উপাদানের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে।
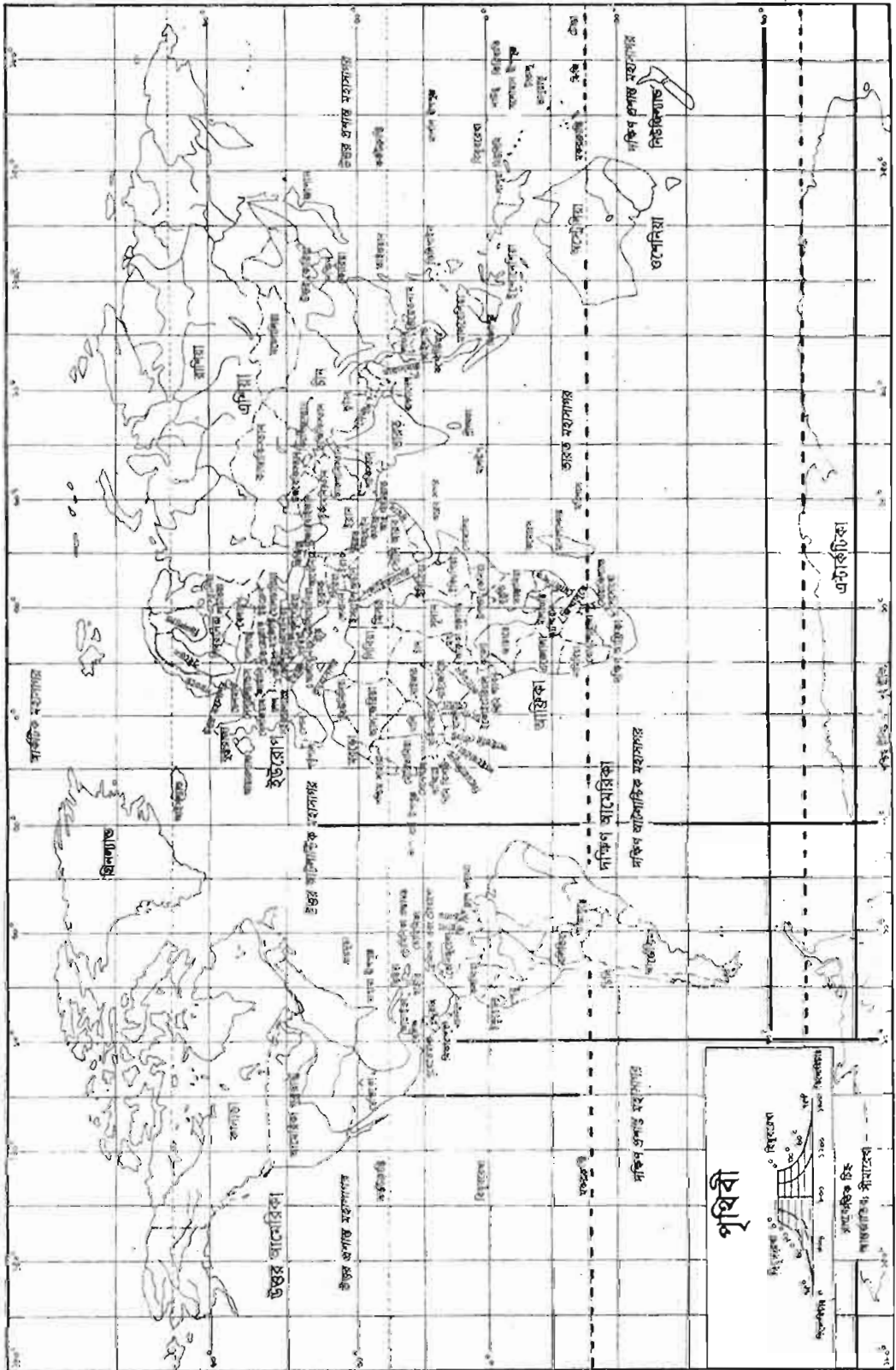
চিত্র ৫২ : পৃথিবীর রাজনৈতিক অঞ্চলসমূহ

প্রথম অধ্যায়

ইউরোপ মহাদেশ

THE CONTINENT OF EUROPE

অবস্থান: ৩৫° উত্তর অক্ষরেখা থেকে ৭১° উত্তর অক্ষরেখা এবং ২৫° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা থেকে ৬৬° পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে ইউরোপ মহাদেশ অবস্থিত। ২০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা এবং ৫৫° উত্তর অক্ষরেখা এ মহাদেশের প্রায় মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে। এ মহাদেশের উত্তরে উত্তর মহাসাগর; দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণ সাগর, পূর্বে কাস্পিয়ান সাগর, ইউরাল নদী ও ইউরাল পর্বত এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত। ইউরাল পর্বত এশিয়া ও ইউরোপকে পৃথক করেছে।

আয়তন: পৃথিবীর মহাদেশগুলোর মধ্যে আয়তনের দিক থেকে ইউরোপ মহাদেশের স্থান তৃতীয়। এর আয়তন ২,৩২,২৭,৪৯৬ বর্গ কিলোমিটার। ইউরোপ আয়তনের দিক থেকে এশিয়ার প্রায় ০.২৪ অংশ, আফ্রিকার ০.৩৫ অংশ, উত্তর আমেরিকার ০.৪৩ অংশ, দক্ষিণ আমেরিকার ০.৫৯ অংশ ছোট, অস্ট্রেলিয়ার ১.৩৭ গুণ এবং এন্টার্কটিকার ৭.৪৫ গুণ বড়।

উপকূল: আয়তনের তুলনায় ইউরোপের তটরেখা যথেষ্ট ভগ্ন এবং সুদীর্ঘ। এই মহাদেশের মোট তটরেখা ৪১,২০৪ কিলোমিটার অর্থাৎ প্রতি ২৪২ বর্গ কিলোমিটার আয়তনে ১ কিলোমিটার তটরেখা; অনেক জায়গায় মহাদেশের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত সাগর, উপসাগর প্রবেশ করেছে। ইউরোপের কোনো অংশই সমুদ্র থেকে ১,৬৯০ কিলোমিটারের বেশি দূরে অবস্থিত নয়। ফলে ইউরোপের উপকূলে অনেক বন্দর ও স্বাভাবিক পোতাশ্রয় গড়ে উঠেছে। এ মহাদেশের উপকূলে অনেক উপদ্বীপ, দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে।

উত্তর উপকূলে শ্বেত সাগর, বোথনিয়া উপসাগর, বাল্টিক সাগর, উত্তর সাগর, আইসল্যান্ড দ্বীপ, স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ (নরওয়ে ও সুইডেন), ডেনমার্ক উপদ্বীপ প্রধান। এ ছাড়া নোভায়া জেমলিয়া ও পিটসবার্জেন দ্বীপ রয়েছে। পশ্চিম উপকূলে বিস্কে উপসাগর এবং আইবেরিয়া উপদ্বীপ (স্পেন-পর্তুগাল)। দক্ষিণ উপকূলে ভূমধ্যসাগর, জেনোয়া উপসাগর, আড্রিয়াটিক সাগর, এজিয়ান সাগর, মর্মর সাগর, কৃষ্ণ সাগর ও আজভ সাগর, কর্সিকা দ্বীপ, সার্দিনিয়া দ্বীপ, সিসিলি দ্বীপ, ইতালি উপদ্বীপ, বলকান উপদ্বীপ এবং ক্রিমিয়া উপদ্বীপ অবস্থিত। পূর্ব দিকে এশিয়া মহাদেশ থাকায় এখানে একমাত্র স্থলবেষ্টিত কাস্পিয়ান সাগর রয়েছে।

ভূপ্রকৃতি: ভূপ্রাকৃতিক গঠন অনুসারে ইউরোপ মহাদেশকে চার ভাগে ভাগ করা যায়।

১। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের পার্বত্য মালভূমি
২। মধ্য ইউরোপের বিস্তীর্ণ সমভূমি
৩। মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের মালভূমি এবং
৪। দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্যভূমি।

১। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের পার্বত্য মালভূমি: স্ক্যান্ডিনেভিয়া উপদ্বীপ (নরওয়ে ও সুইডেন), স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডের উত্তরাংশ এই অঞ্চলের অন্তর্গত। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল কঠিন শিলা দ্বারা গঠিত পার্বত্যভূমি ছিল। বহিস্থ শক্তিগুলোর প্রভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে তা মালভূমি অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। স্ক্যান্ডিনেভিয়া মালভূমির উত্তরে কিওলেন এবং দক্ষিণে ডোভার ফেল্স পর্বত অবস্থিত। এই অঞ্চলের ভূভাগ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ঢালু। স্কটল্যান্ড মালভূমি গ্লেনমোর নামক স্রস্ত উপত্যকা দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত; যুক্তরাজ্যের উত্তরাংশ স্কটিশ উচ্চভূমি এবং দক্ষিণাংশে গ্রাম্পিয়ান পর্বতমালা নামে পরিচিত। গ্রাম্পিয়ান পর্বতের বেন নেভিস (১,৩৪৪ মিটার) যুক্তরাজ্যের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ।

২। মধ্য ইউরোপের বিস্তীর্ণ সমভূমি: পশ্চিমে বিস্কে উপসাগরের উপকূল থেকে পূর্বে ইউরোপের পূর্ব সীমা পর্যন্ত এ বিশাল সমভূমি বিস্তৃত। প্রকৃতপক্ষে এ সমভূমি মধ্য এশিয়ার সমভূমির সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এটি পৃথিবীর বৃহত্তম সমভূমি। উত্তর ফ্রান্স, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস (হল্যান্ড), জার্মানি, পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া,

বেলারুশ, ইউক্রেন এবং রাশিয়ার অধিকাংশ স্থান এ সমভূমির অন্তর্গত। প্রায় সমতল এ সমভূমির উচ্চতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ১৫২ মিটারের বেশি নয়। অতীতে হিমবাহ প্রবাহিত হয়েছিল বলে এ সমভূমিতে বহু হিমবাহ তলানি ও গ্রাবরেখা দেখতে পাওয়া যায়।

৩। মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের মালভূমি: ছোটবড় পাঁচটি বিক্ষিপ্ত মালভূমি নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। আইবেরিয়া উপদ্বীপের মেসেটা মালভূমি, ফ্রান্সের মধ্য মেসেটা মালভূমি, জার্মানির ব্যাভেরিয়া মালভূমি এবং চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়ার বোহেমিয়া মালভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত।
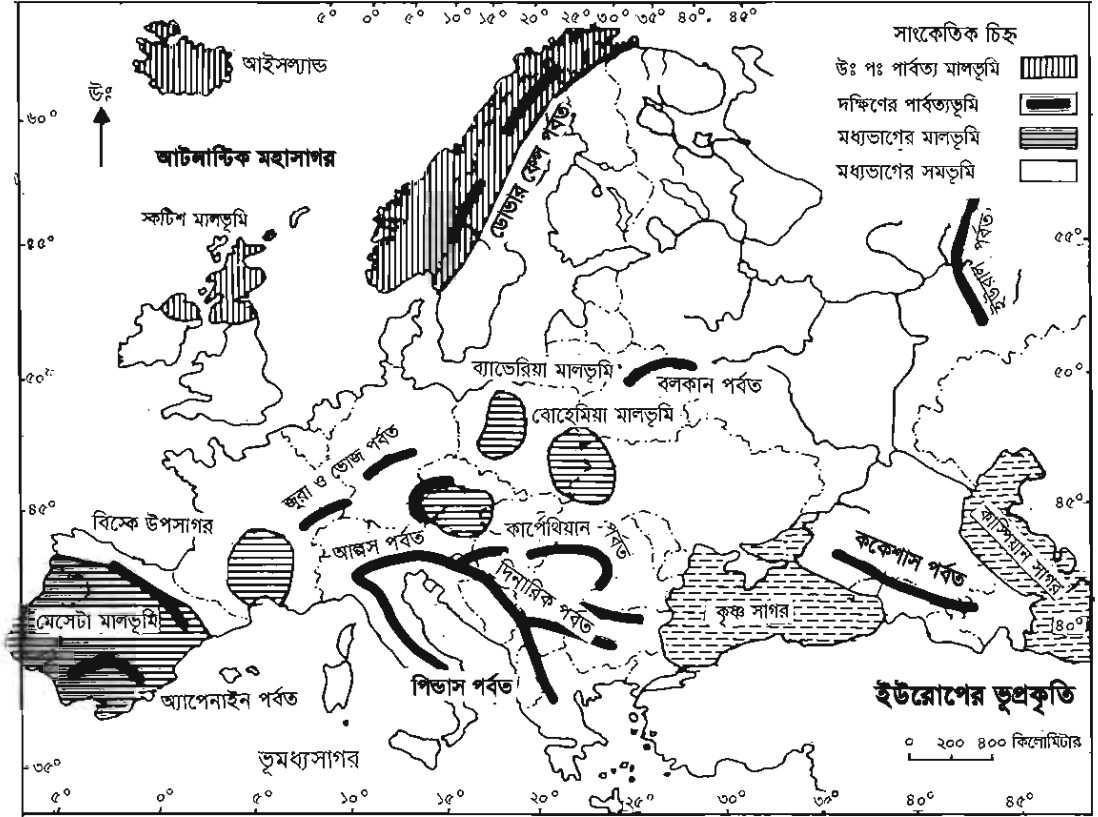
চিত্র ৫৩ : ইউরোপের ভূপ্রকৃতি

৪। দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্যভূমি: এ পার্বত্যভূমির কেন্দ্রে আল্পস পর্বত অবস্থিত। আল্পস পর্বতমালা প্রায় ১,১১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৫৬ থেকে ৬৪ কিলোমিটার প্রশস্ত। এই পর্বতমালা থেকে দক্ষিণ ইউরোপের বিভিন্ন দিকে শাখা পর্বত বিস্তৃত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্বে বলকান উপদ্বীপে দিনারিক ও পিন্ডাস পর্বত; দিনারিকের পূর্বে বলকান পর্বত; আল্পস থেকে পূর্বে চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়া, পশ্চিম ইউক্রেন ও মধ্য-পূর্ব রুমানিয়ায় কার্পেথিয়ান পর্বত, দক্ষিণ রুমানিয়ায় ট্রান্সসিলভানিয়ান পর্বত; কৃষ্ণ সাগরের পূর্বে ককেশাস পর্বত, জুরা পর্বত ও ভোজ পর্বত ফ্রান্স এবং সুইজারল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যবর্তী সীমানা নির্দেশ করেছে। দক্ষিণ ফ্রান্সে এভারজেন ও সিভেনিজ পর্বত অবস্থিত। দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রান্স ও ইতালির সীমান্তে অবস্থিত মাউন্ট ব্লাঙ্ক (৪,৮০৭ মিটার) আল্পসের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। এ শৃঙ্গ সারা বছর তুষার আবৃত থাকে। ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে পিরেনিজ পর্বত, উত্তর স্পেনে ক্যান্টাব্রিয়ান পর্বত এবং দক্ষিণ স্পেনে সিয়েরা নেভাডা উচ্চভূমির মধ্যে স্পেনের মেসেটা মালভূমি অবস্থিত। আল্পস পর্বতের একটি শাখা অ্যাপেনাইন নামে ইতালির মধ্যভাগ দিয়ে দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছে।

কার্পেথিয়ান ও দিনারিক পর্বতের মধ্যে দানিয়ুব নদী উপত্যকায় হাঙ্গেরি সমভূমি, আল্পস ও অ্যাপেনাইনের মধ্যে লোম্বার্ডি সমভূমি, বলকান পর্বত ও ট্রান্সসিলভানিয়ান পর্বতের মধ্যে রুমানিয়া সমভূমি অবস্থিত। ইতালির ভিসুভিয়াস, সিসিলি দ্বীপের এটনা, লিপারী দ্বীপের স্ট্রম্বোলী এবং আইসল্যান্ডের হেকলা উল্লেখযোগ্য আগ্নেয়গিরি।

জলবায়ু: ইউরোপ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত। কিন্তু সমুদ্র থেকে দূরত্ব, উষ্ণ স্রোতের প্রভাব, মেরুবৃত্তের অবস্থান, পর্বতের অবস্থান প্রভৃতি কারণে ইউরোপের বিভিন্ন অংশে জলবায়ুর তারতম্য দেখা যায়। উপরে বর্ণিত নিয়ামকগুলো বিবেচনা করে ইউরোপকে চারটি প্রধান জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

১। তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চল: নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যান্ড ও রাশিয়ার উত্তরাংশ মেরুবৃত্তের উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় এই এলাকা হিমমণ্ডলের অন্তর্গত এবং এ এলাকার জলবায়ু তুন্দ্রা জলবায়ু নামে পরিচিত। এখানে শীত ঋতু দীর্ঘ ও শীতের তীব্রতা বেশি। এ সময়ে প্রচুর তুষারপাত হয় এবং বছরে প্রায় নয় মাস ভূমি বরফাবৃত থাকে।

২। উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল: আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের নরওয়ে ও সুইডেনের দক্ষিণাংশ, জার্মানি, ফ্রান্স ও স্পেনের উত্তরাংশ, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক, যুক্তরাজ্য এবং আইসল্যান্ড এ অঞ্চলের অন্তর্গত। উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক প্রবাহ এ অঞ্চলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় এবং কোনো অংশই সমুদ্র থেকে দূরে না হওয়ায় এ অঞ্চলের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি। শীতের তীব্রতা বেশি নয়।
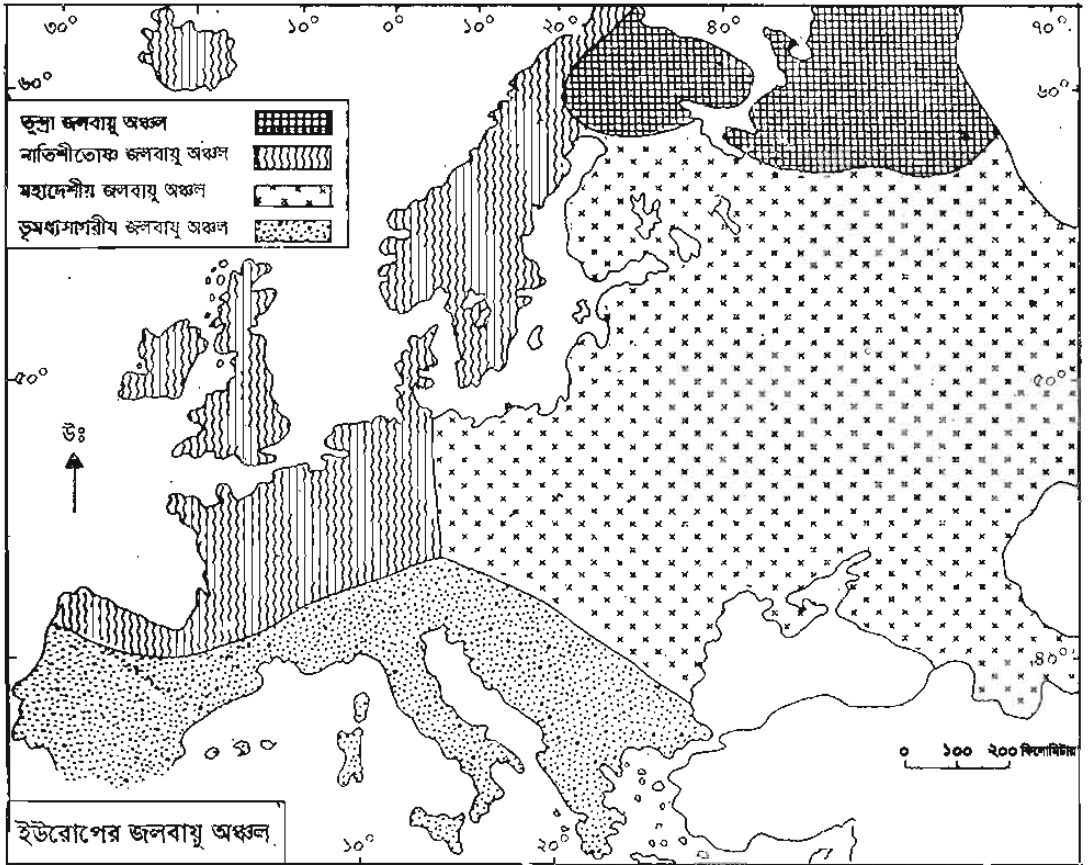
চিত্র ৫৪ : ইউরোপের জলবায়ু অঞ্চল

৩। পূর্ব ইউরোপের মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল: পূর্ব ইউরোপের পোল্যান্ড, দক্ষিণ ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, রুমানিয়া, বেলারুশ, রাশিয়া, ইউক্রেন, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান এ অঞ্চলের অন্তর্গত। এ অঞ্চল সমুদ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। উত্তরের শীতল বায়ু এ অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। শীতকালে শীতের তীব্রতা অনেক বেশি। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। পূর্ব দিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায়। এ জন্য এই অঞ্চলের জলবায়ুকে চরমভাবাপন্ন মহাদেশীয় জলবায়ু বলে।

৪। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল: দক্ষিণ ইউরোপের ভূমধ্যসাগরের অনতিদূরের পর্তুগাল, দক্ষিণ স্পেন, দক্ষিণ

ফ্রান্স, ইতালি, আলবেনিয়া, গ্রিস, ইউরোপীয় তুরস্ক এবং ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপ কর্সিকা, সার্দিনিয়া, সিসিলি ও ক্রীট এ অঞ্চলের অন্তর্গত। গ্রীষ্মকালে সূর্যকিরণ প্রখর হলেও সমুদ্রের প্রভাবে উষ্ণতা কম থাকে। শীতকালে শীতের প্রকোপ বেশি হয় না। প্রধানত শীতকালেই বৃষ্টি হয়, গ্রীষ্মকাল শুষ্ক থাকে।

রাজনৈতিক বিভাগ ও জনসংখ্যা: ইউরোপের ছোটবড় রাষ্ট্রগুলোর মোট সংখ্যা ৪৬টি। ১৯৯১ সালে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ১৫টি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি হয়। অনুরূপভাবে চেকোস্লোভাকিয়া ভেঙে চেক প্রজাতন্ত্র ও স্লোভাকিয়া নামক ২টি রাষ্ট্রে এবং যুগোস্লাভিয়া ভেঙে ৫টি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। পরের পৃষ্ঠায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আয়তন ও জনসংখ্যার সারণি দেওয়া হল।

চিত্র ৫৫ : ইউরোপের রাজনৈতিক বিভাগ

সারণি ৩ : ইউরোপের বিভিন্ন দেশের আয়তন, জনসংখ্যা, ঘনত্ব ও রাজধানী, ২০০৮

দেশের নাম	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যা (কোটি)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)	রাজধানী
(ক) উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল				
নরওয়ে	৩,২৩,৮০২	০.৪৬	১৪	অসলো
সুইডেন	৪,৪৯,৯৬৪	০.৯০	২০	স্টকহোম
যুক্তরাজ্য	২,৪৪,৮২০	৬.০৯	২৪৯	লন্ডন
আয়ারল্যান্ড	৭০,২৮০	০.৪২	৬০	ডাবলিন
আইসল্যান্ড	১০৩,০০০	০.০৩	৩	রিক্জাভিক
(খ) বাল্টিক অঞ্চল				
ফিনল্যান্ড	৩,৩৮,১৪৫	০.৫২	১৫	হেলসিংকি
এস্তোনিয়া	৪৫,২২৬	০.১৩	২৯	তাল্লিন
লাটভিয়া	৬৪,৫৮৯	০.২২	৩৪	রিগা
লিথুয়ানিয়া	৬৫,২০০	০.৩৬	৫৫	ভিলনিয়াস
(গ) সমভূমি অঞ্চল				
নেদারল্যান্ডস	৪১,৫২৬	১.৬৬	৪০০	আমস্টারডাম
বেলজিয়াম	৩০,৫২৮	১.০৪	৩৪১	ব্রাসেলস্
লুক্সেমবার্গ	২,৫৮৬	০.০৫	১৯৩	লুক্সেমবার্গ
ফ্রান্স	৬,৪৩,৪২৭	৬.৪১	১০০	প্যারিস
ডেনমার্ক	৪৩,০৯৪	০.৫৫	১২৮	কোপেনহেগেন
জার্মানি	৩,৫৭,০২১	৮.২৪	২৩১	বার্লিন
পোল্যান্ড	৩,১২,৬৮৫	৩.৮৫	১২৩	ওয়ারস্
(ঘ) পূর্ব অঞ্চল				
রাশিয়া	১,৭০,৭৫,২০০	১৪.০৭	৮	মস্কো
বেলারুশ	২,০৭,৬০০	০.৯৭	৪৭	মিনস্ক
ইউক্রেন	৬,০৩,৭০০	৪.৬০	৭৬	কিয়েভ
মোলডাভিয়া	৩৩,৮৪৩	০.৪৩	১২৭	কিশিনেভ
(ঙ) ট্রান্স ককেশিয়া অঞ্চল				
জর্জিয়া	৬৯,৭০০	০.৪৬	৬৬	তিবলিসি
আর্মেনিয়া	২৯,৮০০	০.৩০	১০১	ইয়েরেভান
আজারবাইজান	৮৬,৬০০	০.৮২	৯৫	বাকু
(চ) মধ্য ও দক্ষিণ অঞ্চল				
চেক প্রজাতন্ত্র	৭৮, ৮৬৬	১.০২	১২৯	প্রাগ
স্লোভাকিয়া	৪৮, ৮৪৫	০.৫৫	১১	ব্রাটিস্লাভা
রুমানিয়া	২,৩৭,৫০০	২.২২	৯	বুখারেস্ট
হাঙ্গেরি	৯৩,০৩০	১.০০	১০৭	বুদাপেস্ট
অস্ট্রিয়া	৮৩,৮৭০	০.৮২	৯৮	ভিয়েনা

দেশের নাম	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যা (কোটি)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)	রাজধানী
লিচেস্টেন	১৬০	০.০০৩	.০০০০১৯	ভাডাউজ
সুইজারল্যান্ড	৪১,২৯০	০.৭৬	১৭৭	বার্ন
পর্তুগাল	৯২,৩৯১	১.০৭	১১৬	লিসবন
স্পেন	৫,০৪,৭৮২	৪.০৫	৮০	মাদ্রিদ
অ্যান্ডোরা	৪৬৮	০.০০৭	১৫০	অ্যান্ডোরা লা ভিলা
ইতালি	৩,০১,২৩০	৫.৮১	১৯৩	রোম
ভ্যাটিক্যান *	০.১৮	০.০০০০৬৪৮	৩৬০০	ভ্যাটিক্যান সিটি
মোনাকো	২	০.০০৩	.০০১৫	মোনাকো
সানমেরিনো	৬১	০.০০৩	৫০২	সানমেরিনো
স্লোভানিয়া	২০,২৭৩	০.২০	৯৯	লুবজানা
ক্রোয়েশিয়া	৫৬,৫৪২	০.৪৫	৮০	জাগরেব
বসনিয়া ও হার্জিগোভিনা	৯১,১২৯	০.৪৬	৯০	সারায়েভো
সার্বিয়া	৭৭,৪৭৪	০.৮০	১০৩	বেলগ্রেড
মেসিডোনিয়া	২৫,৩৩৩	০.২১	৮২	স্কপি
আলবেনিয়া	২৮,৭৪৮	০.৩৬	১২৫	তিরানা
বুলগেরিয়া	১,১০,৯১০	০.৭৩	৬৬	সোফিয়া
গ্রিস	১,৩১,৯৪০	১.০৭	৮১	এথেন্স
মাল্টা	৩১৬	৪.০৪	১২৪৬	ভেলেটা
মোট	২,৩২,২৭,৪৯৬	৭৩.৪৯	৩২	---

উৎস: বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৮

* স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক, ১৯৯৪-৯৫

ইউরোপ

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

অবস্থান-আয়তন-উপকূল: ইউরোপ মহাদেশ নাতিশীতোষ্ণমন্ডলে অবস্থিত। ইউরোপের আয়তন ২,৩২,২৭,৪৯৬ বর্গ কিলোমিটার। ইউরোপের উপকূল যথেষ্ট ভগ্ন ও সুদীর্ঘ।

ভূপ্রকৃতি: ভূপ্রাকৃতিক গঠন অনুসারে ইউরোপ মহাদেশকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা- (১) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের পার্বত্য মালভূমি, (২) মধ্য ইউরোপের বিস্তীর্ণ সমভূমি, (৩) মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপের মালভূমি এবং (৪) দক্ষিণ ইউরোপের পার্বত্যভূমি।

জলবায়ু: জলবায়ু অনুসারে ইউরোপ মহাদেশকে (১) তুন্দ্রা অঞ্চল, (২) উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল, (৩) পূর্ব ইউরোপের মহাদেশীয় অঞ্চল ও (৪) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এই চার ভাগে বিভক্ত করা হয়।

রাজনৈতিক বিভাগ: ইউরোপ মহাদেশ ছোটবড় ৪৬টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে নরওয়ে, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও আইসল্যান্ড। বাল্টিক অঞ্চলে ফিনল্যান্ড, এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়া; সমভূমি অঞ্চলে নেদারল্যান্ডস, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, জার্মানি ও পোলান্ড; পূর্ব অঞ্চলে রাশিয়া,

বেলারুশ, ইউক্রেন ও মোলডাভিয়া; ট্রান্স ককেশিয়া অঞ্চলে জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান; মধ্য ইউরোপ অঞ্চলে চেক প্রজাতন্ত্র, স্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ড; ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে পর্তুগাল, স্পেন, ইতালি, ভ্যাটিক্যান, সানমেরিনো, আলবেনিয়া, গ্রিস ও মাল্টা অবস্থিত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। নিম্নের কোনগুলো ইউরোপের স্ক্যান্ডিনেভিয়ার রাজধানী?

ক. লন্ডন, ডাবলিন এবং এডিনবার্গ

খ. স্টকহোম, অসলো এবং হেলসিংকি

গ. প্যারিস, ব্রাসেলস এবং বন

ঘ. প্রাগ, বুখারেস্ট এবং ভিয়েনা

২। নিম্নের কোন ইউরোপীয় দেশে মহাদেশীয় জলবায়ু বিরাজ করে?

ক. ডেনমার্ক

খ. পর্তুগাল

গ. তুরস্ক

ঘ. জর্জিয়া

৩। ইউরোপের বিভিন্ন অংশের জলবায়ুর ভিন্নতার জন্য প্রধানত ভূমিকা রাখে–

i. ইউরোপের অক্ষরেখা ৩৫° উত্তর থেকে ৭১° উত্তর

ii. ইউরোপের দ্রাঘিমারেখা ২৫° পশ্চিম থেকে ৬৬° পূর্ব

iii. ইউরোপের বিভিন্ন অংশে ভূপ্রকৃতির তারতম্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii

খ. ii এবং iii

গ. i এবং iii

ঘ. i, ii এবং iii

সারণিটি পর্যবেক্ষণ কর এবং ৪ ও ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

দেশসমূহ	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যা (কোটি)
নরওয়ে	৩,২৩,৮০২	০.৪৬
নেদারল্যান্ডস	৪১,৫২৬	১.৬৬

উৎস: বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৮

৪। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে নেদারল্যান্ডস-এর জনসংখ্যা কত জন?

ক. ৩০৭

খ. ৩৩৭

গ. ৩৬৭

ঘ. ৩৯৭

৫। নরওয়ের আয়তন অনেক বেশি হলেও জনসংখ্যার ঘনত্ব এত কম হওয়ার পেছনে কোন কারণটি অধিক যুক্তিযুক্ত?

ক. দেশটি পর্বতময় ও এর জলবায়ু চরমভাবাপন্ন

খ. বছরের ছয় মাস দিন ও ছয় মাস রাত

গ. অন্য দেশগুলোর তুলনায় শিল্পে অনুন্নত

ঘ. উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাব

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সাদিব ঢাকা থেকে লন্ডনে পৌঁছে বিমানবন্দরের বাইরে এসে কনকনে শীতে কাঁপতে থাকে। লন্ডন প্রবাসী বন্ধুদের কাছ থেকে এ দেশের আবহাওয়া সম্পর্কে সে মোটামুটি ধারণা পেল। ইউরোপ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত একটি মহাদেশ হলেও সমুদ্র থেকে দূরত্ব, উষ্ণ স্রোতের প্রভাব, মেরুবৃত্তের অবস্থান, পর্বতের অবস্থান ইত্যাদির কারণে জলবায়ুর ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

ক. ইউরোপ মহাদেশকে কয়টি জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে?

খ. লন্ডন শহর কোন জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর।

গ. ইউরোপের মানচিত্র অঙ্কন করে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল চিহ্নিত করে এর বর্ণনা দাও।

ঘ. 'ইউরোপ মহাদেশ নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলে অবস্থিত হলেও জলবায়ুর মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়'। এর স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

এশিয়া মহাদেশ

THE CONTINENT OF ASIA

অবস্থান: আমরা এশিয়া মহাদেশে বাস করি। এ মহাদেশের দক্ষিণে বাংলাদেশ অবস্থিত। এশিয়া ১০° দক্ষিণ অক্ষরেখা থেকে ৮০° উত্তর অক্ষরেখা এবং ২৫° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ১৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই মহাদেশের পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিমে ইউরোপ মহাদেশ ও ভূমধ্যসাগর; দক্ষিণ-পশ্চিমে আফ্রিকা ও লোহিত সাগর; উত্তরে উত্তর মহাসাগর এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর অবস্থিত। ইউরোপ মহাদেশের সঙ্গে স্থলভাগ দ্বারা যুক্ত হওয়ায় এশিয়া ও ইউরোপকে একসঙ্গে ইউরেশিয়া বলা হয়। ইউরাল পর্বত, ইউরাল নদী ও কাস্পিয়ান সাগর, এশিয়া থেকে ইউরোপকে পৃথক করেছে।

আয়তন: এশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ। এর আয়তন ৪,৬৪,৮৯,৭২৯ বর্গ কিলোমিটার। এ মহাদেশ উত্তর-দক্ষিণে মোটামুটি ৮,৫২৮ কিলোমিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯,৬৫৪ কিলোমিটার। এশিয়া মহাদেশ আফ্রিকার প্রায় ১.৫ গুণ, উত্তর আমেরিকার প্রায় ১.৮২ গুণ, দক্ষিণ আমেরিকার প্রায় ২.৪ গুণ, ইউরোপের প্রায় ৪.১৯ গুণ, অস্ট্রেলিয়ার ৫.৭৩ গুণ এবং এন্টার্কটিকার ৩.১২ গুণ বড়।
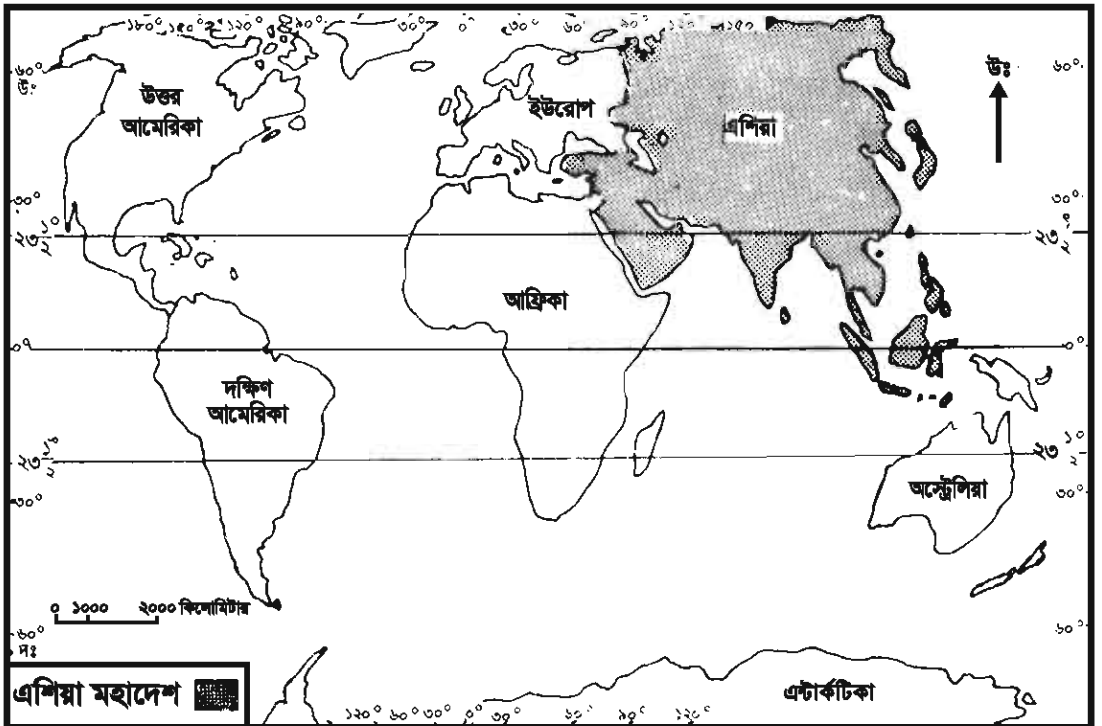
চিত্র ৫৬ : পৃথিবীর মানচিত্রে এশিয়া মহাদেশ

উপকূল: এশিয়া মহাদেশের উপকূল বেশি ভগ্ন নয়। ফলে আয়তনের তুলনায় এর উপকূল রেখা অনেক কম। এ মহাদেশের মোট তটরেখা ৫৭,৯২৪ কিলোমিটার, অর্থাৎ প্রতি ৭৭৩ বর্গ কিলোমিটারে ১ কিলোমিটার তটরেখা। উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য কম হওয়ায় এশিয়ায় উন্নত বন্দরের সংখ্যা অনেক কম।

ভূপ্রকৃতি: এশিয়া মহাদেশকে ভূপ্রাকৃতিক গঠন অনুসারে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়।

১। উত্তর এশিয়ার নিম্ন সমভূমি
২। মধ্য এশিয়ার উচ্চ মালভূমি ও পর্বতমালা
৩। দক্ষিণ এশিয়ার নিম্ন সমভূমি
৪। দক্ষিণ এশিয়ার মালভূমি এবং
৫। আগ্নেয় দ্বীপমালা।

১। উত্তর এশিয়ার নিম্ন সমভূমি: বেরিং প্রণালি থেকে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত একটি সরলরেখা অঙ্কন করলে এর উত্তরে বিশাল নিম্ন সমভূমি দেখা যায়। এ সমভূমি উত্তরের দিকে ক্রমশ ঢালু।

২। মধ্য এশিয়ার উচ্চ মালভূমি ও পর্বতমালা: মধ্য এশিয়ার পামীর মালভূমির উচ্চতা ৪,৮১৩ মিটার। এটি পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মালভূমি হওয়ায় একে 'পৃথিবীর ছাদ' বলে। পামীর থেকে বিভিন্ন দিকে পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত হয়েছে বলে একে 'পামীর গ্রন্থি' বলে। এখান থেকে তিয়েনশান পর্বতশ্রেণী উত্তর-পূর্ব দিকে গেছে। এ পর্বতশ্রেণীর শাখাগুলোর মধ্যে আলতাই, ইয়াব্লোনয় ও স্তানোভয় প্রধান। পামীর থেকে পূর্ব দিকে কুনলুন এর দক্ষিণ-পশ্চিমে কারাকোরাম এবং দক্ষিণে হিমালয় পর্বত অবস্থিত (চিত্র ৫৭)। কুনলুনের শাখা আলতিনতাগ ও তিয়েনশানের মধ্যে তারিম মালভূমি এবং কুনলুন ও হিমালয়ের মধ্যে তিব্বত মালভূমি অবস্থিত। হিমালয় পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশ্রেণী।
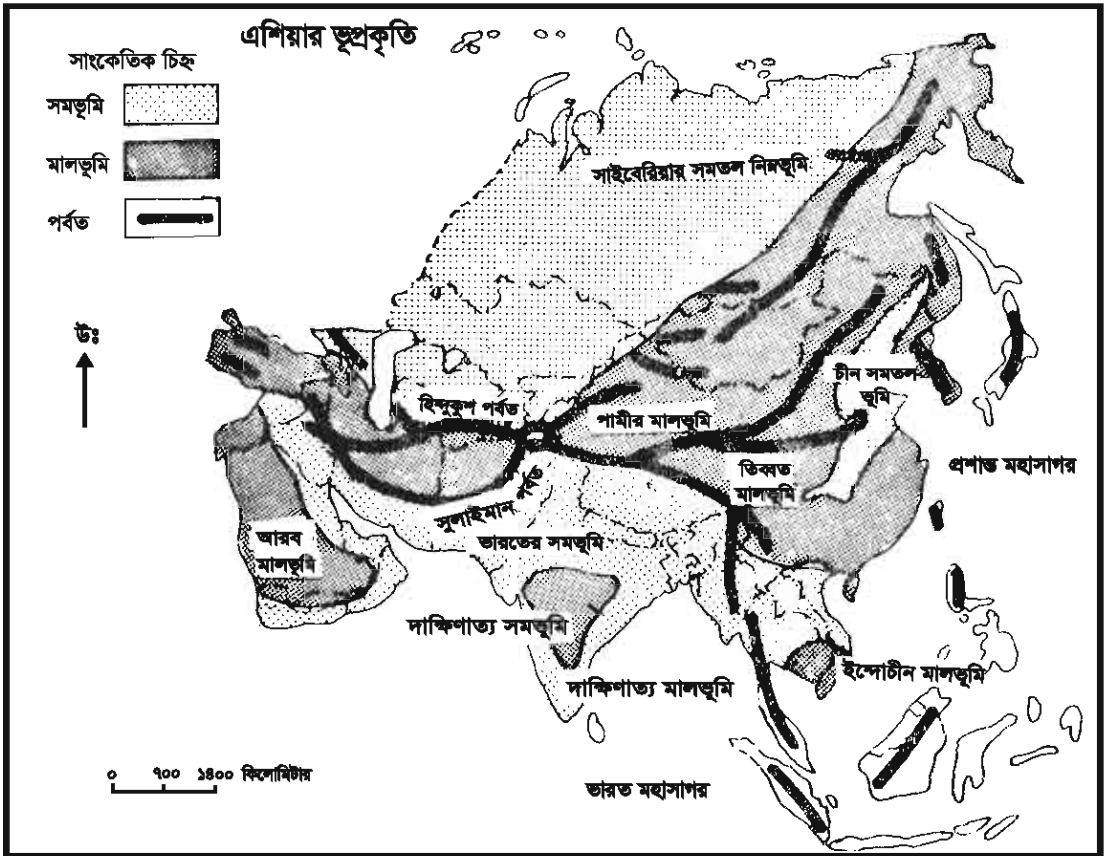
চিত্র ৫৭ : এশিয়ার ভূপ্রকৃতি

এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৪১৪ কিলোমিটার, বিস্তার ২৪১ থেকে ৪০২ কিলোমিটার। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট (৮,৮৮৪ মিটার) ছাড়াও আরো ২২টি শৃঙ্গ ৬,০১৬ মিটারের চেয়ে বেশি উঁচু। কারাকোরামের শৃঙ্গ K_2 বা গডউইন অস্টিন (৮,৬১৯ মিটার) পৃথিবীর দ্বিতীয় উচ্চতম শৃঙ্গ। হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত থেকে কয়েকটি শাখা দক্ষিণ দিকে বেঁকে মায়ানমারে প্রবেশ করেছে। এদের মধ্যে আরাকান ইয়োমা ও পেগু ইয়োমা প্রধান।

পামীর গ্রন্থি থেকে পশ্চিম দিকে হিন্দুকুশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে সুলাইমান ও ক্ষীরথর নামে দুইটি পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত। ইরানের উত্তরের এলবুর্জ এবং দক্ষিণের জাগ্রোস পর্বতশ্রেণীদ্বয় পশ্চিমে আর্মেনীয় গ্রন্থিতে মিলিত হয়েছে। এ উভয় পর্বতের মধ্যে ইরান মালভূমি অবস্থিত। আর্মেনীয় গ্রন্থি থেকে পন্টিক ও টোরাস পর্বত দুইটি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়েছে। এ পর্বতদ্বয়ের মধ্যে আনাতোলিয়া মালভূমি রয়েছে।

৩। **দক্ষিণ এশিয়ার নিম্ন সমভূমি:** ইরাকের তাইগ্রিস (দজলা)-ইউফ্রেতিস (ফোরাত) অববাহিকা; পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা এবং চীনের হোয়াংহো-ইয়াংসি-সিকিয়াং অববাহিকা নদীর পলি সঞ্চয়ের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস সমভূমি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, সিন্ধু সমভূমি দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, গঙ্গা সমভূমি পূর্ব দিকে, ব্রহ্মপুত্র সমভূমি প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ও পরে দক্ষিণ দিকে ঢালু হয়েছে। পলি দ্বারা গঠিত হওয়ায় এ এলাকাগুলো যথেষ্ট উর্বর।

৪। **দক্ষিণ এশিয়ার মালভূমি:** এশিয়ার দক্ষিণাংশের আরব, দাক্ষিণাত্য ও ইন্দোচীন মালভূমি প্রাচীন শিলা দ্বারা গঠিত। বিস্তৃত আরব মালভূমির অধিকাংশ স্থান অনুর্বর ও মরুময় এবং এ মালভূমি পূর্ব দিকে ঢালু। দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্বত, পূর্বে পূর্বঘাট পর্বত ও উত্তরে বিন্ধ্য পর্বত অবস্থিত। এ মালভূমির পূর্ব দিকে ঢালু। ইন্দোচীন মালভূমি দক্ষিণ দিকে ক্রমশ ঢালু।

৫। **আগ্নেয় দ্বীপমালা:** এশিয়ার পূর্ব দিকে উত্তর থেকে দক্ষিণে অ্যালিউসিয়ান, কিউরাইল, জাপান, রিউকিউ, ফিলিপাইন, বোর্নিও ও অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জগুলো পর্বতময়। এর অধিকাংশ দ্বীপেই আগ্নেয়গিরি রয়েছে।

নদী: গতিধারা অনুসারে এশিয়ার নদীগুলোকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) উত্তর সাগরে পতিত নদী: আলতাই পর্বত থেকে উৎপন্ন ওব (উপনদী ইরতিশসহ ৫,৫৬৯ কিলোমিটার) ও ইনিসি (উপনদী আংগারাসহ ৪,৯৮৯ কিলোমিটার) এবং বৈকাল হ্রদ থেকে উৎপন্ন লেনা (৪,২৬৪ কিলোমিটার) উত্তর সাগরে পড়েছে। এ নদীগুলোর মোহনা বছরের অধিকাংশ সময় বরফে আবৃত থাকে।

(খ) প্রশান্ত মহাসাগরে পতিত নদী: ইয়াব্লোনয় পর্বত থেকে উৎপন্ন আমুর নদী (৪,৩৪৪ কিলোমিটার) পূর্বে ওখটস্ক সাগরে পড়েছে। এ নদী বছরে প্রায় ছয় মাস বরফে আবৃত থাকে। হোয়াংহো (৪,৬৬৮ কিলোমিটার) কুনলুন পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে পূর্বে পীত সাগরে পড়েছে। ইয়াংসিকিয়াং (৫,৫২৫ কিলোমিটার) তিব্বত মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে পূর্ব চীন সাগরে পড়েছে। ইয়াংসিকিয়াং এশিয়ার দীর্ঘতম নদী। সিকিয়াং চীনের ইউনান মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে পড়েছে। মেকং নদী তিব্বত মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে পড়েছে। মেনাম নদী তিব্বত মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে শ্যাম উপসাগরে পড়েছে।

(গ) ভারত মহাসাগরে পতিত নদী: মায়ানমারের সালুইন (২,৮১৬ কিলোমিটার) তিব্বত মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে মার্তাবান উপসাগরে পড়েছে। ইরাবতী (২,০৯২ কিলোমিটার) ভারতের নাগা পর্বতে উৎপন্ন হয়ে মায়ানমারের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে মার্তাবান উপসাগরে পড়েছে। ব্রহ্মপুত্র (২,৮৬৯ কিলোমিটার) তিব্বতের মানস সরোবর নামক হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে তিব্বত, আসাম ও বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। গঙ্গা (২,৫০৫ কিলোমিটার) হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী নামক হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে ভারত ও বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এ নদীর নিম্নগতি পদ্মা নামে পরিচিত। সিন্ধু (২,৮৯৬ কিলোমিটার) তিব্বত মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে কাশ্মির ও পাকিস্তানের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে পড়েছে। তাইগ্রিস (দজলা, ১,৯০০ কিলোমিটার) ও ইউফ্রেতিস (ফোরাত) পূর্ব তুরস্কের আর্মেনীয় উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হয়েছে। এ দুই নদীর মিলিত স্রোত শাত-ইল-আরব নামে পারস্য উপসাগরে পড়েছে।

(ঘ) হ্রদে পতিত নদী: আমুদরিয়া পামীর মালভূমিতে উৎপন্ন হয়ে আরল হ্রদে এবং সিরদরিয়া তিয়েনশান পর্বতে উৎপন্ন হয়ে আরল হ্রদে পতিত হয়েছে। ইউরাল নদী ইউরাল পর্বত থেকে উৎপন্ন হয়ে কাস্পিয়ান সাগরে, তারিম নদী (২,৭৩৫ কিলোমিটার) কারাকোরাম পর্বতে উৎপন্ন হয়ে লপনর হ্রদে পতিত হয়েছে। হেলমন্দ নদী হিন্দুকুশ পর্বতে উৎপন্ন হয়ে হামুন হ্রদে, জর্ডান নদী লেবানন উচ্চভূমিতে উৎপন্ন হয়ে মরু সাগরে পড়েছে। এ ছাড়া বিশাল এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন অংশে অনেক ছোট ছোট নদী বিভিন্ন দিকে প্রবাহিত হয়েছে।

জলবায়ু: এশিয়া একটি বিস্তৃত মহাদেশ। এর ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যময়। তা ছাড়া বায়ুপ্রবাহের পথে বাধার সৃষ্টি হওয়ায় এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু অনুভূত হয়। জলবায়ু অনুসারে এ মহাদেশকে সাত ভাগে ভাগ করা হয়।

১। নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল: ৫° উত্তর ও ৫° দক্ষিণ অক্ষরেখার মধ্যে সিঙ্গাপুর, মালয় উপদ্বীপ এবং ইন্দোনেশিয়ায় নিরক্ষীয় জলবায়ু অনুভূত হয়। এখানে সারা বছর অধিক উত্তাপ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। শীত ও গ্রীষ্মের তাপের পার্থক্য কম।

২। মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল: এশিয়ার ক্রান্তীয় অঞ্চলে মহাদেশীয় ভূভাগের পূর্বাংশে দক্ষিণ ও পূর্বচীন, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড, মায়ানমার, বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান এই জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। গ্রীষ্মকালে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলে এ অঞ্চলে গ্রীষ্মে উত্তাপ অনেক কম থাকে। এখানে শীত ও গ্রীষ্ম কোনোটাই তীব্র নয়। জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র।
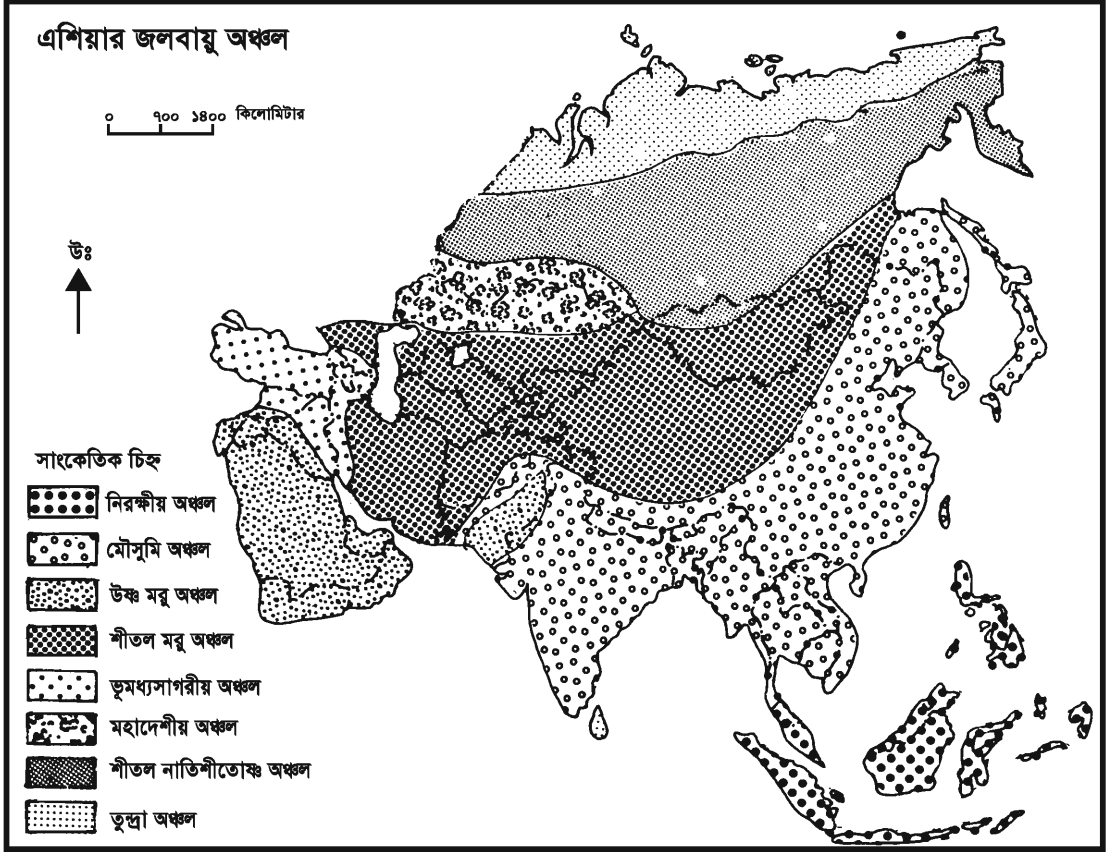
চিত্র ৫৮ : এশিয়ার জলবায়ু অঞ্চল

৩। মরু জলবায়ু অঞ্চল: শুষ্কতার প্রাধান্যই মরু জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। বৃষ্টিপাত না হওয়ায় বা খুব স্বল্প বৃষ্টিপাত হওয়ায় খরার প্রভাবে এই অঞ্চলে উদ্ভিদের স্বল্পতা দেখা যায়। মরু জলবায়ু অঞ্চলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়।

(ক) উষ্ণ মরু অঞ্চল: পাকিস্তান ও ভারতের থর মরুভূমি, পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কাতার, ওমান, ইয়েমেন, সৌদি আরব, জর্ডান এবং দক্ষিণ–পশ্চিম ইরাক এই জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানকার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। দিনে প্রচণ্ড গরম ও রাতে শীত অনুভূত হয়।

(খ) শীতল মরু অঞ্চল: মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলিয়া, চীনের সিনকিয়াং, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরান এই জলবায়ুর অন্তর্গত। সমুদ্র থেকে দূরে অবস্থিত হওয়ায় এই দেশগুলোতে বৃষ্টিপাত খুবই কম। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যথেষ্ট কমে যাওয়ায় এ অঞ্চলের বায়ু শুষ্ক। উচ্চতার জন্য এ অঞ্চলের জলবায়ু শীতল। এই শীতল শুষ্ক জলবায়ু অঞ্চলের মঙ্গোলীয় ও সিনকিয়াং অংশে গোবি মরুভূমি অবস্থিত।

৪। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল: পশ্চিম এশিয়ার তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, ইসরাইল ও উত্তর ইরাক ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ুর অন্তর্গত। এখানে শীতকালে বৃষ্টি হয়, গ্রীষ্মের দিনগুলো শুষ্ক থাকে।

৫। মহাদেশীয় জলবায়ু অঞ্চল: পশ্চিম সাইবেরিয়ার জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। এখানে শীতের প্রকোপ বেশি এবং প্রচুর তুষারপাত হয়। গ্রীষ্মকাল উষ্ণ কিন্তু স্বল্পকাল স্থায়ী, কদাচিৎ বৃষ্টিপাত হয়।

৬। শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু অঞ্চল: পূর্ব সাইবেরিয়ায় এ জলবায়ু অনুভূত হয়। এখানে শীতের প্রকোশ বেশি। শীতকালে মেরু অঞ্চল থেকে তীব্র শীতল বায়ু এ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিবর্তে তুষারপাত হয়। পশ্চিমাংশের চেয়ে পূর্বাংশ বেশি শীতল ও শুষ্ক।

৭। তুন্দ্রা জলবায়ু অঞ্চল: সাইবেরিয়ার উত্তরাংশে এ জলবায়ু অনুভূত হয়। এখানে শীত ঋতু দীর্ঘস্থায়ী এবং শীতের প্রকোপ খুব বেশি। ভারখয়ানস্ক পৃথিবীর শীতলতম স্থান। গ্রীষ্ম ঋতুতেও তুন্দ্রার উত্তরাংশে বরফ গলে না। এ অঞ্চল জনবসতির অনুপযোগী।

রাষ্ট্রীয় বিভাগ ও জনসংখ্যা: আলোচনার সুবিধার জন্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোকে–(১) সার্কভুক্ত দেশ, (২) দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া, (৩) দূরপ্রাচ্য ও সাইবেরিয়া, (৪) মধ্য এশিয়া এবং (৫) দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়া নামক পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক উন্নয়ন সংস্থা বা সার্ক (SAARC)–এর অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলোর মোট আয়তন ৪৫,৭৩,৮৯২ বর্গ কিলোমিটার এবং এ অঞ্চলে প্রায় ১৫০.৯৬ কোটিরও বেশি লোক বাস করে। সাতটি রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি স্বাধীন ও সার্বভৌম এবং আঞ্চলিক উন্নয়নে একে অপরকে সাহায্য করে।

দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ায় ১১টি রাষ্ট্রের মোট আয়তন ৪৫,১০,৫৬০ বর্গ কিলোমিটার এবং এখানে প্রায় ৫৮.৪৯ কোটি লোক বসবাস করে। প্রত্যেকটি রাষ্ট্র স্বাধীন ও সার্বভৌম।

দূরপ্রাচ্য ও সাইবেরিয়া অঞ্চলে ৮টি রাষ্ট্র আছে। এগুলোর মোট আয়তন প্রায় ২,৬৫,৬৯,৯৬৩ বর্গ কিলোমিটার এবং এখানে প্রায় ১৫৭.২৮ কোটি অধিবাসী বসবাস করে।

মধ্য এশিয়ার ৫টি রাষ্ট্রের মোট আয়তন ৩৯,৯৪,৪০০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৬.১৪ কোটি।

দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়ার ১৭টি রাষ্ট্রের মোট আয়তন ৬৮,৪০,৯১৪ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৩০.৩২ কোটি।

১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ১৫টি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এর মধ্যে এশিয়ার অন্তর্গত হয়েছে (১) সাইবেরিয়া (রাশিয়া প্রজাতন্ত্রের এশিয়ার অংশ), (২) কাজাখস্তান, (৩) উজবেকিস্তান, (৪) তুর্কমেনিস্তান, (৫) তাজিকিস্তান এবং (৬) কিরগিজস্তান। ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়ায় ইসরাইলের কয়েকটি এলাকা নিয়ে ফিলিস্তিন বা প্যালেস্টাইন নামে স্ব–শাসিত রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে।

সারণি ৪ : এশিয়ার বিভিন্ন দেশের আয়তন, জনসংখ্যা, ঘনত্ব ও রাজধানী, ২০০৮

দেশের নাম	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যা (কোটি)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)	রাজধানী
১। সার্কভুক্ত দেশসমূহ				
বাংলাদেশ *	১,৪৭,৫৭০	১৪.০৬	৯৫৩	ঢাকা
ভারত	৩২,৮৭,৫৯০	১১৪.৮০	৩৪৯	নয়াদিল্লি
পাকিস্তান	৮,০৩,৯৪০	১৬.৭৮	২০৯	ইসলামাবাদ
নেপাল	১,৪৭,১৮১	২.৯৫	২০০	কাঠমন্ডু
ভুটান •	৪৭,০০১	০.২৩	৪৯	থিম্পু
শ্রীলঙ্কা	৬৫,৬১০	২.১১	৩২২	কলম্বো
মালদ্বীপ ••	৭৫,০০০	০.০৩	৪	মালে
মোট	**৪৫,৭৩,৮৯২**	**১৫০.৯৬**	**৩৩০**	**––**

দেশের নাম	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যা (কোটি)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)	রাজধানী
২। দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া				
মায়ানমার	৬,৭৮,৫০০	৪.৭৮	৭২	পিয়েনমেন
থাইল্যান্ড	৫,১৪,০০০	৬.৫৫	১২৭	ব্যাংকক
কম্বোডিয়া	১,৮১,০৪০	১.৪২	৭৮	নমপেন
লাওস	২,৩৬,৮০০	০.৬৭	২৮	ভিয়েনতিয়েন
ভিয়েতনাম	৩,২৯,৫৬০	৮.৬১	২৬১	হ্যানয়
ইন্দোনেশিয়া	১৯,১৯,৪৪০	২৩.৭৫	১২৪	জাকার্তা
মালয়েশিয়া	৩,২৯,৭৫০	২.৫৩	৭৭	কুয়ালালামপুর
সিঙ্গাপুর	৬৯৩	০.৪৬	৬৬৩৮	সিঙ্গাপুর
ফিলিপাইন	৩,০০,০০০	৯.২৭	৩০৯	ম্যানিলা
ব্রুনেই	৫,৭৭০	০.৩৪	৬৬	বন্দর সেরীবেগাওয়ান
পূর্ব তিমুর	১৫,০০৭	০.১১	৭৩	দিলি
মোট	**৪৫,১০,৫৬০**	**৫৮.৪৯**	**১৩০**	––
৩। দূরপ্রাচ্য ও সাইবেরিয়া				
সাইবেরিয়া (রাশিয়া ** প্রজাতন্ত্রের এশিয়ার অংশ)	১,৪৭,৭৪,৪৬০	০.৯৯	৬৭	––
জাপান	৩,৭৭,৮৩৫	১২.৭৩	৩৩৭	টোকিও
উত্তর কোরিয়া	১,২০,৫৪০	২.৩৫	১৯৫	পিয়ংইয়ং
দক্ষিণ কোরিয়া	৯৮,৫৮০	৪.৯২	৫০০	সিউল
মঙ্গোলিয়া	১৫,৬৪,১১৬	০.৩০	২	উলান বাটোর
চীন	৯৫,৯৬,৯৬০	১৩৩.০০	১৩৯	বেইজিং
হংকং	১,০৯২	০.৭০	৬৪১০	ভিক্টোরিয়া
তাইওয়ান	৩৫,৯৮০	২.২৯	৬৩৬	তাইপে
মোট	**২,৬৫,৬৯,৯৬৩**	**১৫৭.২৮**	**৫৯**	––
৪। মধ্য এশিয়া				
কাজাখস্তান	২৭,১৭,৩০০	১.৫৩	৬	আসতানা
উজবেকিস্তান	৪,৪৭,৪০০	২.৮৩	৬৩	তাসখন্দ
তুর্কমেনিস্তান	৪,৮৮,১০০	০.৫২	১১	আশগাবাত
তাজিকিস্তান	১,৪৩,১০০	০.৭২	৫০	ডুশানবে
কিরগিজস্তান	১,৯৮,৫০০	০.৫৪	২৭	বিশকেক
মোট	**৩৯,৯৪,৪০০**	**৬.১৪**	**১৫**	––
৫। দক্ষিণ–পশ্চিম এশিয়া				
আফগানিস্তান	৬,৪৭,৫০০	৩.২৭	৫১	কাবুল
ইরান	১৬,৪৮,০০০	৬.৫৯	৪১	তেহরান
ইরাক	৪,৩৭,০৭২	২.৮২	৬৫	বাগদাদ
তুরস্ক	৭,৮০,৫৮০	৭.১৯	৯২	আঙ্কারা
সিরিয়া	১,৮৫,১৮০	১.৯৭	১০৬	দামেস্ক
লেবানন	১০,৪০০	০.৪০	৩৮৫	বৈরুত
জর্ডান	৯২,৩০০	০.৬২	৬৭	আম্মান

*উৎস : * বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক, ২০০৭/এপ্রিল ২০০৮*

*** স্ট্যাটিসটিক্যাল ইয়ার বুক, ১৯৯৪–৯৫*

দেশের নাম	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যা (কোটি)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)	রাজধানী
ইসরাইল	২০,৭৭০	০.৭১	৩৪১	জেরুজালেম
প্যালেস্টাইন	৬,২২০	০.৪১	৬৫৭	রামাল্লাহ
ইয়েমেন	৫,২৭,৯৭০	২.৩০	৪৪	সানা
সৌদি আরব	২১,৪৯,৬৯০	২.৮২	১৩	রিয়াদ
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৮৩,৬০০	০.৪৬	৫৫	আবুধাবী
বাহরাইন	৬৬৫	০.০৭	১০৫৩	মানামা
কাতার	১১,৪৩৭	০.০৯	৭৯	দোহা
ওমান	২,১২,৪৬০	০.২৬	১২	মাসকাত
কুয়েত	১৭,৮২০	০.২৬	১৪৬	কুয়েত
সাইপ্রাস	৯,২৫০	০.০৮	৮৬	নিকোশিয়া
মোট	**৬৮,৪০,৯১৪**	**৩০.৩২**	**৪৪**	--
সর্বমোট	**৪,৬৪,৮৯,৭২৯**	**৪০৩.১৯**	**৮৭**	--

উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৮

- ডেমোগ্রাফিক, সোস্যাল অ্যান্ড ইকোনোমিক ইন্ডিকেটরস, ২০০৪
- • এম পি এন ডি, ২০০৪

এশিয়া

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

অবস্থান ও আয়তন: এশিয়া পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাদেশ। এর উত্তরে উত্তর সাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিমে ইউরোপ মহাদেশ ও ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে আফ্রিকা ও লোহিত সাগর অবস্থিত। এশিয়ার মোট আয়তন ৪,৬৪,৮৯,৭২৯ বর্গ কিলোমিটার।

ভূপ্রকৃতি: এশিয়া মহাদেশকে (১) উত্তর এশিয়ার নিম্ন সমভূমি, (২) মধ্য এশিয়ার উচ্চ মালভূমি ও পর্বতমালা, (৩) দক্ষিণ এশিয়ার নিম্ন সমভূমি, (৪) দক্ষিণ এশিয়ার মালভূমি এবং (৫) আগ্নেয় দ্বীপমালা নামক পাঁচটি ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলে ভাগ করা হয়। এখানে পামীর ও আর্মেনীয় নামক দুইটি পর্বত গ্রন্থি রয়েছে। এ গ্রন্থি দুইটি থেকে বিভিন্ন দিকে পর্বতশ্রেণী বিস্তৃত হয়েছে। অধিক উচ্চতার জন্য পামীরকে 'পৃথিবীর ছাদ' বলা হয়। তিয়েনশান, আলতাই, ইয়াব্লোনয়, স্তানোভয়, কুনলুন, কারাকোরাম, হিমালয়, হিন্দুকুশ, সুলাইমান, ক্ষীরথর, এলবুর্জ, জাগ্রোস, পন্টিক, টোরাস এশিয়ার প্রধান পর্বতশ্রেণী। তিব্বত, তারিম, ইরান, আনাতোলিয়া, আরব, দাক্ষিণাত্য ও ইন্দোচীন এশিয়ার প্রধান মালভূমি এবং সাইবেরিয়া, তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস, সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র, হোয়াংহো-ইয়াংসি-সিকিয়াং অববাহিকা এশিয়ার প্রধান সমভূমি অঞ্চল।

নদী: উত্তর এশিয়ার ওব, ইনিসি, লেনা; পূর্ব এশিয়ার আমুর, হোয়াংহো, ইয়াংসিকিয়াং; দক্ষিণ এশিয়ার মেকং, মেনাম, সালুইন, ইরাবতী, ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, সিন্ধু; পশ্চিম এশিয়ার তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস এশিয়ার প্রধান নদী।

জলবায়ু: এশিয়া মহাদেশ যথেষ্ট বিস্তৃত হওয়ায় এর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন জলবায়ু অনুভূত হয়। এই মহাদেশকে (১) নিরক্ষীয় জলবায়ু, (২) মৌসুমি জলবায়ু, (৩) মরু জলবায়ু, (৪) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু, (৫) মহাদেশীয় জলবায়ু, (৬) শীতল নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, (৭) তুন্দ্রা জলবায়ু নামক সাত ভাগে বিভক্ত করা যায়।

রাষ্ট্রীয় বিভাগ: এশিয়া মহাদেশে ৪৮টি রাষ্ট্র রয়েছে। এর মধ্য (ক) দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক উন্নয়ন (সার্ক)-ভুক্ত দেশ ৭টি, (খ) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ১১টি, (গ) দূরপ্রাচ্য ও সাইবেরিয়ার অন্তর্গত ৮টি, (ঘ) মধ্য এশিয়ায় ৫টি, (ঙ) দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ১৭টি রাষ্ট্র রয়েছে।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

দেশসমূহ	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যা (কোটি)
বাংলাদেশ	১,৪৭,৫৭০	১৪.০৬
মায়ানমার	৬,৭৮,৫০০	৪.৭৮
ভারত	৩২,৮৭,৫৯০	১১৪.৮০
আফগানিস্তান	৬,৪৭,৫০০	৩.২৭

উপরের সারণিতে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে ১ থেকে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

১। **নিম্নের কোন দেশটি আয়তনে দ্বিতীয়?**
ক. বাংলাদেশ খ. মায়ানমার
গ. ভারত ঘ. আফগানিস্তান

২। **কোন দেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব সবচেয়ে কম?**
ক. বাংলাদেশ খ. মায়ানমার
গ. ভারত ঘ. আফগানিস্তান

৩। **সারণিতে উল্লিখিত দেশসমূহ একই মহাদেশে অবস্থিত হওয়ার ফলেও জনসংখ্যার ঘনত্বের মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়–**
ক. সমভাবাপন্ন জলবায়ুর কারণে খ. চরমভাবাপন্ন জলবায়ু ও ভূপৃষ্ঠের বৈচিত্র্যতার কারণে
গ. জাতিগত পার্থক্যের কারণে ঘ. ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে

৪। **সারণিতে বর্ণিত দেশগুলো এশিয়া মহাদেশের কোন অংশে অবস্থিত?**
ক. পূর্ব খ. পশ্চিম
গ. উত্তর ঘ. দক্ষিণ

সারণিতে দুইটি দেশের উপাত্ত দেখানো হয়েছে। সারণির তথ্য ব্যবহার করে ৫ এবং ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

জনসংখ্যা এবং রপ্তানি তথ্য, দক্ষিণ কোরিয়া এবং বাংলাদেশ, ২০০১

উপাত্ত	দক্ষিণ কোরিয়া	বাংলাদেশ
জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	৪৮	১৩৪
জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)	৪৯৩	১০০০
রপ্তানি (বিলিয়ন ডলার)	১৫৯	৬.৬
মাথাপিছু রপ্তানি (ডলার)	৩,৩০০	৫০

৫। উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে ২০০১ সালে নিম্নের কোন উক্তিটি সঠিক?

i. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা দক্ষিণ কোরিয়ার তুলনায় অর্ধেকের বেশি ছিল
ii. দক্ষিণ কোরিয়ার জনগণের মাথাপিছু রপ্তানির মূল্য বাংলাদেশের তুলনায় এক-পঞ্চমাংশ
iii. দক্ষিণ কোরিয়ার জনসংখ্যার ঘনত্ব বাংলাদেশের তুলনায় অর্ধেকের কম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii
খ. i এবং iii
গ. ii এবং iii
ঘ. i, ii এবং iii

৬। নিম্নের কোন তথ্যটি উল্লিখিত সারণি থেকে বের করা সম্ভব?

i. রপ্তানি মূল্য
ii. উভয় দেশের আয়তন
iii. পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় রপ্তানি আয়ের পরিবর্তন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii
খ. i এবং iii
গ. ii এবং iii
ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের প্রদত্ত মানচিত্র থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
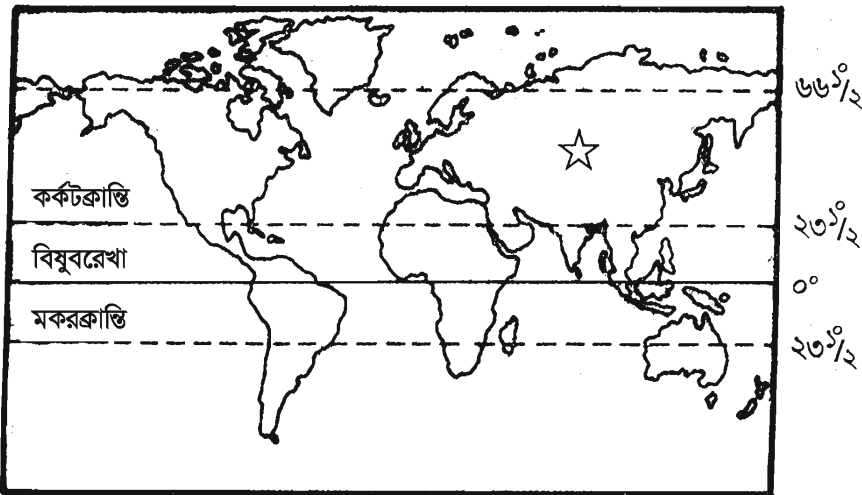
ক. তারকা চিহ্নিত মহাদেশটির নাম লেখ।
খ. এশিয়ার নদীবিধৌত সমতল ভূমি বর্ণনা কর।
গ. এশিয়ার মানচিত্র অঙ্কন করে ইউরোপের জলবায়ুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ এশিয়ার জলবায়ু অঞ্চল চিহ্নিত কর।
ঘ. এশিয়া মহাদেশের মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্ম কোনোটাই তীব্র না হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ কর।

তৃতীয় অধ্যায়

মালয়েশিয়া

MALAYSIA

পরিচিতি: দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণাংশ এবং বোর্নিও দ্বীপের সাবাহ ও সারাওয়াক নিয়ে মালয়েশিয়া গঠিত হয়েছে। মালয় উপদ্বীপকে পশ্চিম মালয়েশিয়া এবং সাবাহ ও সারাওয়াককে পূর্ব মালয়েশিয়া বলে।

মালয়েশিয়া বাংলাদেশের অন্যতম বন্ধু রাষ্ট্র। বিদেশি আধিপত্য ও শাসন থেকে মুক্ত হয়ে অধিবাসীরা অক্লান্ত পরিশ্রমে তাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ত্বরান্বিত করেছে। বাংলাদেশের সঙ্গে এ দেশের পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

অবস্থান: মালয়েশিয়ার উত্তরে দক্ষিণ চীন সাগর, পূর্বে সেলিবিস সাগর, দক্ষিণে জাভা সাগর এবং পশ্চিমে মালাক্কা প্রণালি অবস্থিত। দেশটি ২° দক্ষিণ অক্ষরেখা থেকে ৮° উত্তর অক্ষরেখা এবং ১০০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ১২০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত।

আয়তন ও অধিবাসী: মালয়েশিয়া ৩,২৯,৭৫০ বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট দেশ। এ দেশের জনসংখ্যা প্রায় ২.৫৩ কোটি। এ দেশে গড়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৭ জন। রাষ্ট্রীয় ভাষা মালয়। এই দেশে ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, কনফুসীয়, তাও, শিখ, বাহাই ও হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোক বাস করে। অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান।
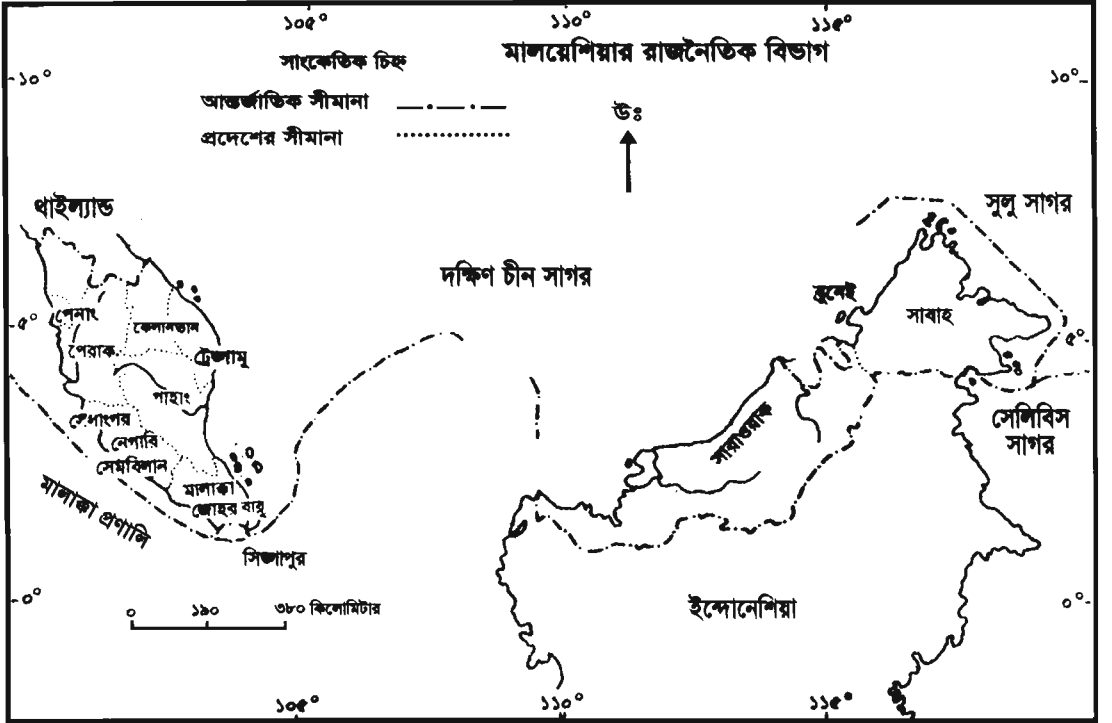
চিত্র ৫৯ : মালয়েশিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ

ভূপ্রকৃতি: মালয়েশিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল সমভূমি এবং মধ্যভাগ উঁচু মালভূমি দ্বারা গঠিত। মালয় উপদ্বীপের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলে সংকীর্ণ সমভূমি রয়েছে, দক্ষিণ উপকূলের সমভূমি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। সারাওয়াকের পশ্চিম উপকূলের দক্ষিণাংশ বেশ প্রশস্ত, উত্তরাংশ ক্রমশ সংকীর্ণ হয়েছে। সাবাহ এর উত্তরাংশে প্রশস্ত সমভূমি রয়েছে।

পার্বত্য বা পাহাড়িয়া মালয় উপদ্বীপে মাত্র কয়েকটি বড় আকারের সমতল ভূভাগ রয়েছে। প্রধান পার্বত্য জলবিভাজিকাটি পশ্চিম উপকূলের কাছে অবস্থিত। এর কয়েকটি অংশ ২,১০০ মিটারের চেয়ে বেশি উঁচু। উপকূল রেখার সমান্তরালভাবে অনেকগুলো শৈলশিরা রয়েছে।

প্রধান জলবিভাজিকার পশ্চিমের ভূভাগ তরঙ্গায়িত, উর্বর এবং সেখানে ব্যাপকভাবে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। কিন্তু একই জলবিভাজিকার পূর্ব দিকের এলাকা বনভূমি দ্বারা আবৃত পার্বত্যভূমি এবং কম উন্নত। মালয় উপদ্বীপের প্রধান পার্বত্য শৈলশিরাগুলো উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এবং প্রধানত গ্রানাইট শিলা দ্বারা গঠিত। অবশ্য পূর্ব দিকের কোনো কোনো পর্বত কোয়ার্জাইট ও শেল দ্বারা গঠিত। উপদ্বীপের পশ্চিমে খাড়া পার্শ্ব বিশিষ্ট চুনাপাথর দ্বারা গঠিত কয়েকটি ভূখন্ড রয়েছে। নবীন শিলা দ্বারা গঠিত ছোট ছোট অববাহিকাগুলো বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। কুয়ালালামপুরের কাছে এরূপ একটি অববাহিকা আছে।
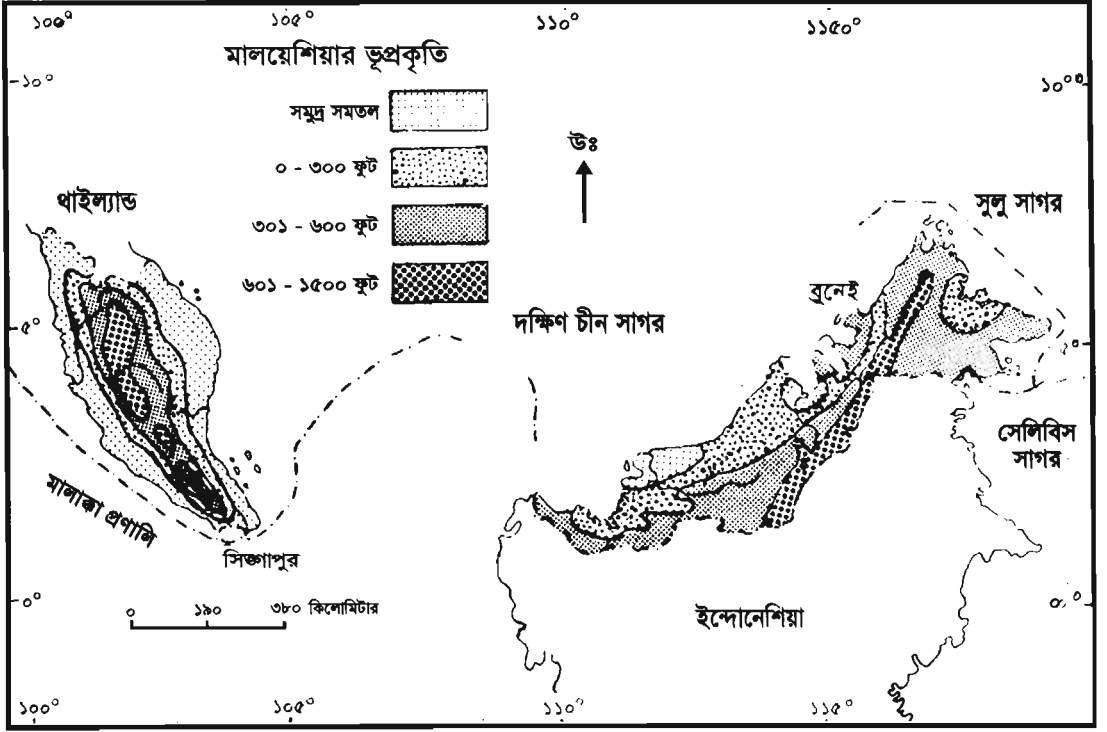
চিত্র ৬০ : মালয়েশিয়ার ভূপ্রকৃতি

উত্তর বোর্নিওর সাবাহ ও সারাওয়াক এলাকাদ্বয়কে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয়: (১) উপকূলবর্তী সমভূমি, (২) পাহাড়ের পাদদেশীয় এলাকা এবং (৩) পাহাড়ি এলাকা। উপকূল এলাকা পলি গঠিত সমভূমি, পাদদেশীয় এলাকা ছোট ছোট পাহাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পাশাপাশি শৈলশিরা শ্রেণী দ্বারা গঠিত পাহাড়ি এলাকা ১,৮০৫ মিটারের বেশি উঁচু। কিনাবালু শৃঙ্গের উচ্চতা ৪,০৫০ মিটার।

নদী: পেরাক, বার্নাম, মুয়ার নদী পশ্চিম মালয়েশিয়ার পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। কেলানতান, পাহাং ও ট্রেংগানু নদী দেশের পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলো নাতিদীর্ঘ।

জলবায়ু: মালয়েশিয়া নিরক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত। ফলে এখানকার জলবায়ু নিরক্ষীয় এবং সারা বছর বৃষ্টিপাত হয়। অধিকাংশ বৃষ্টিপাত পরিচলন বৃষ্টির আকারে সংঘটিত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হলেও দেশটি মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত।

উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে বৃষ্টিপাত হয়।

মালয় উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল সরাসরি উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের অন্তর্গত হওয়ায় সেখানে নভেম্বর থেকে মার্চ মাস

পর্যন্ত আর্দ্র ঋতু বর্তমান থাকে এবং পাশের সাগরগুলোর ওপর দিয়ে বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। মালয় উপদ্বীপের অধিকাংশ স্থানে গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ২,৫৪০ মিলিমিটার। কোনো কোনো উন্মুক্ত এলাকায় বৃষ্টিপাত ৬,৮৬০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আবৃত উপত্যকাগুলোতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১,৫২৪ মিলিমিটারে নেমে আসে। এ দেশে সাধারণত গড় তাপমাত্রা ২৫° থেকে ২৭° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। নিম্নভূমি অঞ্চলে সারা বছর ২৭° সেলসিয়াস গড় তাপমাত্রা অনুভূত হয়।
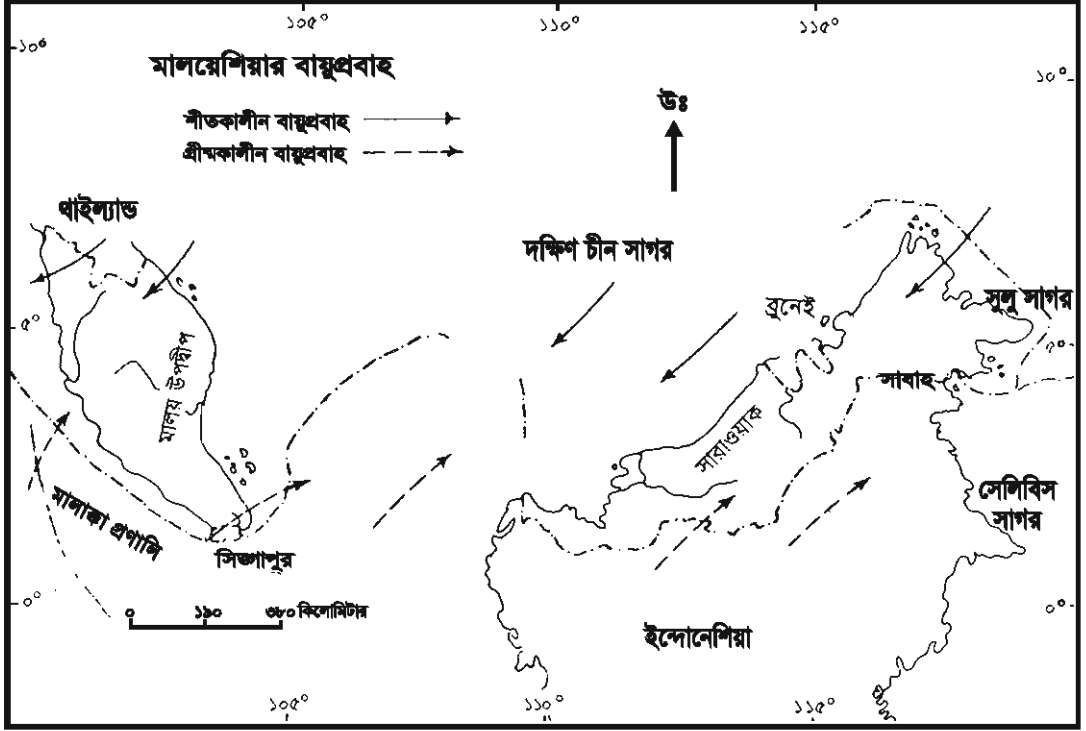
চিত্র ৬১ : মালয়েশিয়ার বায়ুপ্রবাহ

মালয়ের পশ্চিম উপকূল ভারত মহাসাগরীয় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত। মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে আর্দ্র ঋতু স্থায়ী হয়। সুমাত্রা দ্বীপ দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর গতিপথে অন্তরায় সৃষ্টি করায় মালয় উপদ্বীপের পশ্চিমাংশ আংশিকভাবে এই বায়ুর প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে বঞ্চিত থাকে। ফলে সুমাত্রা দ্বীপ ও মালয় উপদ্বীপের মধ্যবর্তী মালাক্কা প্রণালি এ সময় তুলনামূলকভাবে শান্ত থাকে। এ জন্য মালয় উপদ্বীপের পশ্চিমাংশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। এপ্রিল ও অক্টোবর মাস বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তনের সময়।

সাবাহ এর উত্তর উপকূলীয় এলাকায় ২৭° সেলসিয়াস গড় উষ্ণতা বিরাজ করে। সেখানে বছরে দুইটি ঋতু অনুভূত হয়-অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় এবং মে থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত সময়ে অপেক্ষাকৃত শুষ্কতা বিরাজ করে। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

প্রাকৃতিক উদ্ভিদ: মালয়েশিয়ার প্রাকৃতিক উদ্ভিদ নিবিড় ও চিরহরিৎ। এই বনভূমি সমুদ্র সমতল থেকে সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত বিস্তৃত। মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলে সমভূমি এলাকায় বিশাল স্রোতজ বা ম্যানগ্রোভ বনভূমি এবং পূর্ব উপকূলের বালুকাময় তীরভূমিতে ঝাউ জাতীয় 'ক্যাসিউয়া বাইনা' গাছের সংকীর্ণ বলয় গড়ে উঠেছে।

এ দেশের নিরক্ষীয় বনভূমিতে দীর্ঘ, সরল, শাখাপ্রশাখাহীন বহু প্রজাতির গাছগুলো অত্যন্ত নিবিড়ভাবে বেড়ে উঠেছে। গাছগুলোর প্রায় অর্ধেক ৩০ মিটারের বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট। বড় বড় গাছগুলো উঁচুতে উঠে ডালপালা মেলে পুরু পাতার যে চাঁদোয়া (Canopy) তৈরি করে তা ভেদ করে বৃষ্টির পানি নিচে এসে পৌঁছালেও সূর্যের আলো বনভূমির নিচে

আসতে পারে না। ফলে বনভূমির নিচে সারাদিন গোধূলি বেলার মতো অস্পষ্ট আলো বর্তমান থাকে। পত্র-পল্লবের এই চাঁদোয়ার নিচে বাঁশ, বেত ও লতা জাতীয় উদ্ভিদ জন্মে।

নিরক্ষীয় বনে বিভিন্ন প্রজাতির গাছ নিবিড়ভাবে বেড়ে ওঠার ফলে কোনো এক জায়গায় একই প্রজাতির অনেক গাছ দেখা যায় না। এ জন্য যে কোনো এক প্রজাতির গাছের গুঁড়ি বেশি সংখ্যায় সংগ্রহ করা খুবই কষ্টকর এবং বহু গাছ কেটে গুঁড়িগুলো বের করে আনতে অনেক গাছ নষ্ট হয়, যা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর। মালয়েশিয়ার বন থেকে আয়রন উড, রোজ উড, আবলুস, মেহগনি, রবার প্রভৃতি মূল্যবান শক্ত কাঠের গাছ ছাড়াও পাম, বাঁশ, মালয়ী বেত, মালাক্কা বেত সংগ্রহ করা হয়। বনের ঐরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রত্যক্ষভাবে বাণিজ্যে ব্যবহারের উপযোগী কোনো উদ্ভিদ পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না।

চিত্র ৬২ : মালয় উপদ্বীপের ভূমি ব্যবহার

কৃষিঃ মালয়েশিয়ার কৃষি পদ্ধতিকে দেশীয় কৃষি এবং আবাদি কৃষি নামক দুই ভাগে ভাগ করা হয়। উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলীয় উপত্যকাগুলোতে এবং পূর্ব উপকূলীয় এলাকায় ধান উৎপাদিত হয়। কৃষকরা কেবলমাত্র নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী ধান উৎপাদন করে। মালয়েশিয়ার প্রয়োজনীয় চালের তিন-অষ্টমাংশ (৩/৮ অংশ) বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। এ ছাড়া কৃষকরা তামাক, ইক্ষু, কর্পূর, সাগু, মশলা, কফি, কোকো, চা ও ট্যাপিওকা উৎপাদন করে। উপকূল ও উপত্যকাগুলো থেকে দূরবর্তী এলাকায় খুব কমই কৃষিকাজ করা হয়। বনের কোনো কোনো অংশে এখনও অনেক অনগ্রসরশীল সেমাং আদিবাসীরা বাস করে, যারা কৃষিকাজে অভ্যস্ত নয়। মালয়ীরা প্রধানত গ্রামে বাস করে। শহরগুলোতে যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে তা মূলত মালয়েশিয়ায় বসবাসকারী চৈনিকরা করেছে।

মালয়ে আবাদি কৃষি হিসেবে রবার চাষ শুরু হয়েছে ১৮৯৫ সাল থেকে। এখানে বড় বড় রবার খামারগুলোতে বাণিজ্যিক হারে রবার উৎপাদিত হয়। প্রধানত পশ্চিম উপকূলের নিচু পাহাড়ি এলাকায় ও নিচু সমতল ভূমিতে ৩০ লক্ষ একরেরও বেশি এলাকায় রবার চাষ করা হয়। বনের বড় বড় গুঁড়ি বিশিষ্ট গাছগুলো কেটে ফেলে এবং অন্যান্য উদ্ভিদ পুড়িয়ে ফেলে রবার চাষের উপযোগী জমি তৈরি করা হয়েছে। প্রবল বর্ষণে মাটি যেন ধুয়ে না যায় সেদিকে বিশেষ লক্ষ রাখা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, মাটি ক্ষয়রোধ করার জন্য কিছু অস্থায়ী আবরণ উদ্ভিদ উৎপাদন করতে হয়। সাত বছরের আগে কোনো গাছ থেকে রবার সংগ্রহ করা যায় না। অবশ্য ভালোভাবে উৎপাদন পাওয়ার জন্য আরো কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। রবার বাগানগুলো উপকূলের অদূরে, পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত, গাছের গোড়ায় জোয়ারের পানি ওঠে না, প্রয়োজনীয় শ্রমিক সহজলভ্য, উৎপাদিত রবার দ্রুত বন্দরে পাঠানো সম্ভব, বিদেশে রবারের প্রচুর চাহিদা প্রভৃতি কারণে মালয়েশিয়ায় রবার আবাদ যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে।

চিত্র ৬৩ : সাবাহ ও সারাওয়াকের ভূমি ব্যবহার

এ দেশে অন্যান্য আবাদি উদ্ভিদের মধ্যে নারকেল, পাম গাছ, আনারস ও তামাক উল্লেখযোগ্য। উপকূলীয় এলাকার বালুকাময় মাটিতে নারকেল গাছের চাষ প্রসার লাভ করেছে। এ ছাড়া ভোজ্য তেল প্রদায়ী আফ্রিকান পাম গাছের চাষ যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। অপেক্ষাকৃত অনুর্বর মাটিতে আনারস চাষ করা হয়। সাবাহ ও সারাওয়াকে রবার ও তামাক আবাদি ফসল হিসেবে উৎপাদন হয়। এ ছাড়া দেশের এই অংশে সাগু ও গোলমরিচ উৎপাদিত হয়।

চিত্র ৬৪ : গাছ থেকে রবার সংগ্রহ

খনিজ সম্পদ: আকরিক টিন মালয়েশিয়ার প্রধান খনিজ দ্রব্য। এ দেশে প্রচুর পরিমাণে টিন প্রস্তুতকারী মূল্যবান ধাতু রাং পাওয়া যায়। মালয় উপদ্বীপ থেকে আহরিত রাং এর প্রায় সবটুকুই পাললিক স্তর থেকে সংগ্রহ করা হয়। পশ্চিম উপকূলের উপত্যকাগুলোতে উন্নতমানের রাং সঞ্চিত রয়েছে। সংগৃহীত আকরিক রাং পরিশোধনের জন্য পেনাং এ পাঠানো হয়। টিনের পাত তৈরির জন্য এই রাং খুবই গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।

মালয় উপদ্বীপের প্রাচীন হ্রদ অববাহিকাগুলো থেকে কয়লা সংগ্রহ করা হয়। রেলইঞ্জিনে ও অন্যান্য স্বয়ংক্রিয় যানে এই কয়লা ব্যবহার করা হয়। সাবাহ এর পাহাড়ের পাদদেশীয় এলাকায় পেট্রোলিয়াম ক্ষেত্রগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। সারাওয়াকের পাহাড়ের পাদদেশীয় বলয়ের উর্ধ্বভঙ্গ ভাঁজে গুরুত্বপূর্ণ তেলক্ষেত্রগুলো অবস্থিত। এ ছাড়া মালয়েশিয়ায় সোনা ও আকরিক লোহা উত্তোলন করা হয়।

শিল্প: টিন পরিশোধন, টিন ও পেট্রোলিয়াম উত্তোলন ও রবারজাত দ্রব্য মালয়েশিয়ার প্রধান শিল্প। টিন উৎপাদনে এই দেশ পৃথিবীতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। মালয়েশিয়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ও ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য উৎপাদনে এই দেশ এশিয়ায় অন্যতম।
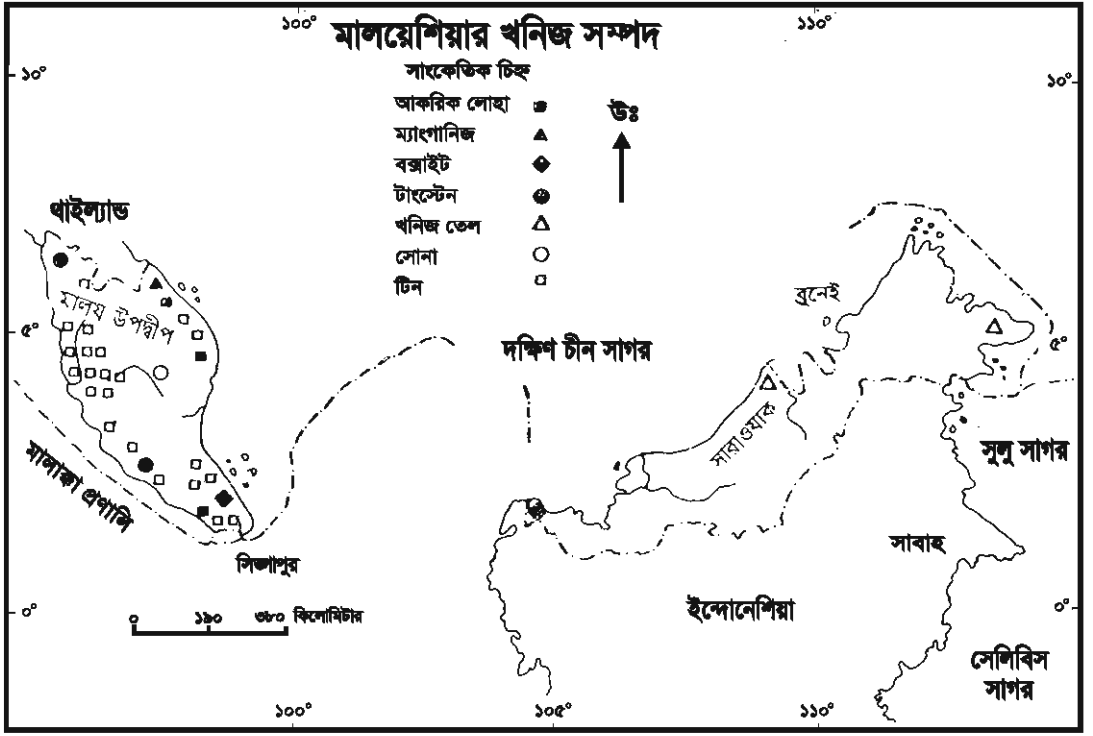
চিত্র ৬৫ : মালয়েশিয়ার খনিজ সম্পদ

পরিবহণ ও যোগাযোগ: এ দেশে স্থলপথে যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত আছে। সড়ক ও রেলপথ সব জায়গায় বিস্তৃত হয়েছে। মালয়েশিয়ায় প্রায় ২৫,৪৪৬ কিলোমিটার পাকা সড়ক এবং প্রায় ১,৪৮৮ কিলোমিটার রেলপথ রয়েছে। সড়ক ও
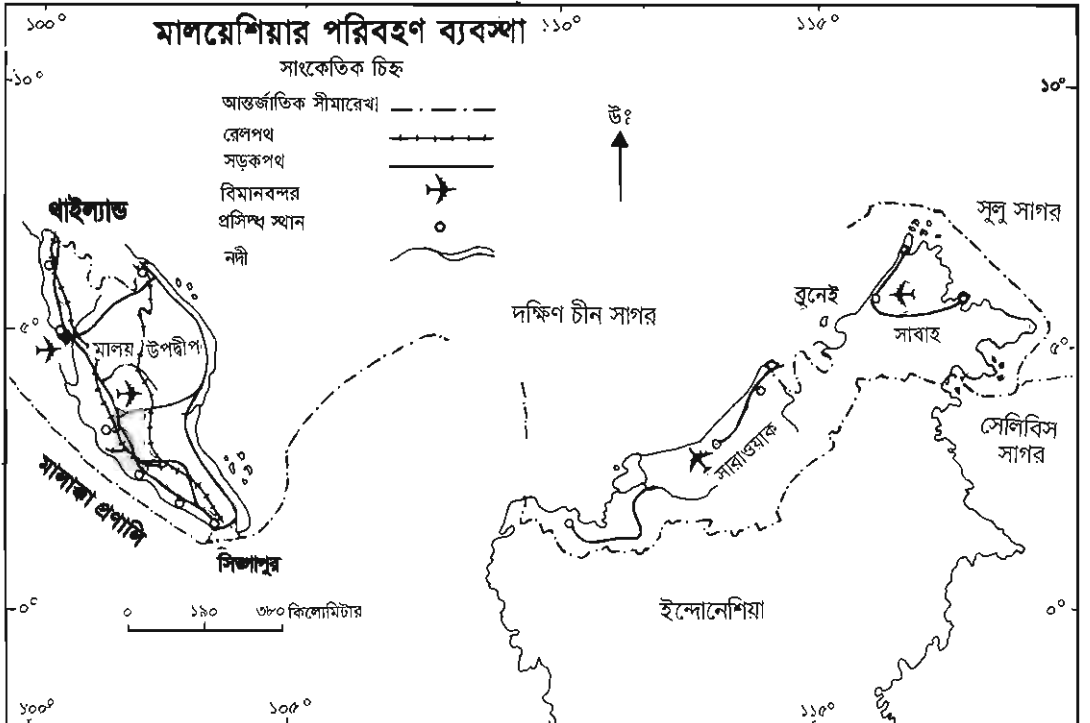
চিত্র ৬৬ : মালয়েশিয়ার পরিবহণ ব্যবস্থা

রেলপথ দ্বারা রবার বাগান এলাকা ও টিন, পেট্রোলিয়াম, কয়লা, সোনা, আকরিক লোহা উৎপাদনকারী ক্ষেত্রগুলো শোধনাগার, শহর, নগর, বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ দেশের রেলপথের সঙ্গে থাইল্যান্ডের রেলপথ যুক্ত হয়েছে। দেশের দুই বিচ্ছিন্ন অংশের মধ্যে সমুদ্রপথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য: মালয়েশিয়ার রপ্তানি দ্রব্যগুলোর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ হল রবার, টিন ও পাম তেল। এ ছাড়া তামাক, সাগু, বিভিন্ন প্রকার মশলা, নারকেল শাঁস ও তেল, কফি ও কুটির শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। সাম্প্রতিককালে যন্ত্রপাতি, কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক্স ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিদেশে রপ্তানি করার মাধ্যমে মালয়েশিয়া এশিয়ার অন্যতম একটি শিল্প সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে পরিচিত হয়েছে। আমদানি পণ্যের মধ্যে চাল প্রধান। এ ছাড়া কাপড় ও তৈরী পোশাক, কাগজ ও ওষুধ আমদানি করা হয়। এ দেশে উৎপন্ন রবারের অধিকাংশই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি করা হয়।

শহর, বন্দর ও বাণিজ্য কেন্দ্র: কুয়ালালামপুর মালয়েশিয়ার রাজধানী। জর্জটাউন পেনাং-এর প্রধান নগর। পেনাং দেশের অন্যতম প্রধান সমুদ্রবন্দর। ১৫১১ সালে স্থাপিত মালাক্কা প্রাচীন নগর। সুটেনহাম কুয়ালালামপুরের কাছে অবস্থিত বিশিষ্ট বন্দর। ক্ল্যাঙ্গ সর্ববৃহৎ বন্দর। ইপোহ টিন আহরণ কেন্দ্র ও প্রধান শহর। জেসেলটন সাবাহ এর পশ্চিম উপকূলের প্রধান নগর। সারাওয়াকের মিরি তেলক্ষেত্রগুলোর প্রধান কেন্দ্র। কুচিং ও সিবু গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর।

জনসংখ্যা ও উন্নয়নের ধারা

জনসংখ্যা: অধিক জন্মহার, কম মৃত্যুহার এবং অভিগমন জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক। এই দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.২৪%, জন্মহার ২৭.৯৫%, মৃত্যুহার ৫.৫৬%, শিশু মৃত্যুহার ২৪.৭%। জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থিতিশীল রাখার জন্য পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। পরিকল্পিতভাবে জনসম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনে ছোট পরিবার গঠন এবং জন্মহার কমিয়ে আনার জন্য জন্ম শাসনের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ দেশে ৫৭% মালয়ী ও অন্যান্য দেশীয় লোক, চৈনিক ৩২% এবং ভারতীয় ৯%। মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৮% শিক্ষিত। এদের মধ্যে পুরুষ ৮৬% এবং মহিলা ৭০%। ১০ বছর ও এর বেশি বয়সের অধিকাংশ লোকই লিখতে ও পড়তে পারে।

উন্নয়নের ধারা: ১৯৫৭ সালের ৩১ আগস্ট যুক্তরাজ্যের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর দেশটি ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির ধারা বেশি। শিল্পে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র কুটির শিল্পে উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সরকার যথেষ্ট সচেষ্ট। অধিবাসীরা উন্নয়ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে। দেশে শ্রমশক্তি কম থাকায় বন্ধু রাষ্ট্রগুলো থেকে জনশক্তি আমদানি করে কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশের বহুলোক মালয়েশিয়ায় চাকরি করে।

মালয়েশিয়া

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

অবস্থান ও আয়তন: মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য দেশ। এর উত্তরে দক্ষিণ চীন সাগর, পূর্বে সেলিবিস সাগর, দক্ষিণে জাভা সাগর এবং পশ্চিমে মালাক্কা প্রণালি রয়েছে। দেশটির আয়তন ৩,২৯,৭৫০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ২.৫৩ কোটি। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৭৭ জন।

ভূপ্রকৃতি: মালয়েশিয়ার উপকূলীয় অঞ্চল সমভূমি এবং মধ্যভাগ মালভূমি দ্বারা গঠিত। প্রধান জলবিভাজিকাটি পশ্চিম উপকূলের কাছে অবস্থিত। শৈলশিরাগুলো উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। সাবাহ ও সারাওয়াকে উপকূলবর্তী সমভূমি, পাহাড়ের পাদদেশীয় এলাকা এবং পাহাড়ি এলাকা রয়েছে। নদীগুলো নাতিদীর্ঘ।

জলবায়ু: মালয়েশিয়ায় সারা বছরই প্রায় বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর থেকে মার্চ মাসে সমুদ্রের ওপর দিয়ে বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। সুমাত্রা দ্বীপ অন্তরায় সৃষ্টি করায় দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের ফলে মে থেকে সেপ্টেম্বর মাসে মালয় উপদ্বীপের পশ্চিমাংশে বেশি বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয় না। অক্টোবর থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত উত্তর-পূর্ব মৌসুমি বায়ুপ্রবাহের সময় সাবাহ ও সারাওয়াকে প্রচুর বৃষ্টি হয়। সারা দেশে ২৫° থেকে ২৭° সেলসিয়াস গড় তাপমাত্রা অনুভূত হয়।

প্রাকৃতিক উদ্ভিদ: নিবিড় ও চিরহরিৎ বনভূমির দেশ মালয়েশিয়া। মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলের সমভূমিতে বিশাল ম্যানগ্রোভ বনভূমি এবং পূর্ব উপকূলের বালুকাময় এলাকায় ঝাউ জাতীয় 'ক্যাসিউয়া বাইনা' গাছের সংকীর্ণ বলয় গড়ে উঠেছে। মধ্যভাগের নিরক্ষীয় বনভূমিতে আয়রন উড, রোজ উড, আবলুস, মেহগনি, রবার প্রভৃতি মূল্যবান শক্ত কাঠের গাছ এবং পাম, বাঁশ, বেত প্রচুর জন্মায়।

কৃষি: মালয়েশিয়ার কৃষি পদ্ধতি দেশীয় কৃষি ও আবাদি কৃষি এই দুই ভাগে বিভক্ত। মালয় উপদ্বীপের পশ্চিম উপকূলীয় উপত্যকাগুলোতে এবং পূর্ব উপকূলীয় এলাকায় ধান উৎপাদিত হয়। এ ছাড়া কৃষকরা তামাক, ইক্ষু, কর্পূর, সাগু, মশলা, কফি, কোকো, চা ও ট্যাপিওকা উৎপাদন করে। আবাদি কৃষি হিসেবে রবার গাছের চাষ প্রসার লাভ করেছে। এ ছাড়া আবাদি উদ্ভিদের মধ্যে নারকেল, পাম, আনারস, তামাক উল্লেখযোগ্য। সাবাহ ও সারাওয়াকে আবাদি ফসল হিসেবে রবার ও তামাক উৎপন্ন হয়। দেশের এই অংশে সাগু ও গোলমরিচ উৎপন্ন হয়।

খনিজ সম্পদ: আকরিক টিন মালয়েশিয়ার প্রধান খনিজ দ্রব্য। সাবাহ এর পাহাড়ের পাদদেশীয় এলাকা থেকে পেট্রোলিয়াম উত্তোলন করা হয়। সারাওয়াকের পাহাড়ের পাদদেশীয় বলয়ে তেলক্ষেত্রগুলো অবস্থিত। মালয়েশিয়ায় সোনা ও আকরিক লোহা উত্তোলন করা হয়।

শিল্প: টিন পরিশোধন, টিন ও পেট্রোলিয়াম উত্তোলন ও রবারজাত দ্রব্য মালয়েশিয়ার প্রধান শিল্প। মালয়েশিয়া ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ও ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য উৎপাদনে এ দেশ এশিয়ায় অন্যতম।

বৈদেশিক বাণিজ্য: রবার, টিন ও পাম তেল এ দেশের গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি দ্রব্য। এ ছাড়া তামাক, সাগু, বিভিন্ন প্রকার মশলা, নারকেল শাঁস ও তেল, কফি, যন্ত্রাংশ, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ, ইলেকট্রনিক্স ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার কুটির শিল্পজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়। আমদানি পণ্যের মধ্যে চাল, কাপড়, তৈরী পোশাক, কাগজ ও ওষুধ অন্যতম।

জনসংখ্যা ও উন্নয়নের ধারা: জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান নিয়ামক অধিক জন্মহার, কম মৃত্যুহার ও অভিগমন। মালয়েশিয়ায় পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থিতিশীল রাখার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়া ছোট পরিবার গঠন এবং জন্মহার কমিয়ে আনার ক্ষেত্রে পরিকল্পিতভাবে জনসম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনে জন্ম শাসনের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশটি ১৯৫৭ সালে যুক্তরাজ্যের শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর ক্রমশ উন্নতির দিকে এগিয়ে চলেছে। মালয়েশিয়ায় কৃষিক্ষেত্রে উন্নতির ধারা সবচেয়ে বেশি। তবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে উন্নতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য সরকার বেশ সচেষ্ট।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ১ থেকে ৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

মালয়েশিয়া নিরক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত। এ দেশে শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে বৃষ্টিপাত হয়। এ দেশের পার্শ্ববর্তী সাগরগুলোর ওপর দিয়ে বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়। গড় তাপমাত্রা ২৫° থেকে ২৭° সেলসিয়াস-এর মধ্যে থাকে। আবহাওয়া এবং জলবায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের তুলনায় মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক। জনসংখ্যাকে জনসম্পদে পরিণত করার জন্য এ দেশের সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

১। মালয়েশিয়া নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হলেও এ দেশটি কোন জলবায়ু দ্বারা প্রবাহিত?

ক. মৌসুমি খ. ক্রান্তীয় সমুদ্র

গ. ক্রান্তীয় মহাদেশীয় ঘ. মৃদু উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ

২। কোন নিয়ামকটির প্রভাবে মালয়েশিয়ায় শীত ও গ্রীষ্মে বৃষ্টিপাত হয়?

ক. পার্শ্ববর্তী সাগরগুলো

খ. প্রবল বায়ুপ্রবাহ

গ. নিরক্ষরেখার অবস্থান

ঘ. মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ

৩। মালয়েশিয়ার উন্নয়নে কার্যকরী পদক্ষেপ হচ্ছে–

i. পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ

ii. ছোট পরিবার গঠন

iii. জন্ম শাসন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii এবং iii

৪। মালয়েশিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?

ক. ২.০৪%

খ. ২.১৪%

গ. ২.২৪%

ঘ. ২.৩৪%

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মালয়েশিয়া ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করে। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং শিল্পে অভূতপূর্ব উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আজ দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়ার একটি প্রধান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে মালয়েশিয়া পরিচিতি লাভ করেছে। বিগত শতাব্দীর ৮০ দশকে মালয়েশিয়া অর্থনৈতিক দিক থেকে বাংলাদেশের পর্যায়ে ছিল। কিন্তু ২০০৫ সালের চিত্র অনেকটা ভিন্ন, যা নিচের সারণিতে প্রদত্ত হল।

বৈশিষ্ট্য	মালয়েশিয়া	বাংলাদেশ
১। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৭৫%	২.০৫%
২। মাথাপিছু জাতীয় আয় (ইউ এস ডলার)	১২,৮০০	২,৩০০
৩। শ্রমশক্তি নিয়োগ		
(ক) কৃষি	১৩%	৬৩%
(খ) শিল্প	৩৬%	১১%
(গ) সেবা	৫১%	২৬%

উৎস : BBC World News website

ক. পূর্ব মালয়েশিয়ায় অবস্থিত দেশটির নাম কী?

খ. নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত হলেও মালয়েশিয়া কেন মৌসুমি বায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়?

গ. ২০০৫ সালে মালয়েশিয়ার অর্থনীতির তিনটি প্রধান খাতে শ্রমশক্তি নিয়োগ পরিস্থিতি ব্যাখ্যা কর এবং তা পাই চিত্রে প্রদর্শন কর।

ঘ. সারণিতে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সঙ্গে মালয়েশিয়ার তুলনা কর এবং মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

দক্ষিণ কোরিয়া

SOUTH KOREA

পরিচিতি: কোরিয়া পূর্ব এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। এই দেশটি ১৯৫২ সালে দুইটি ভাগে ভাগ হয়ে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থনৈতিকভাবে উত্তর কোরিয়াকে অনেক পিছনে ফেলে দক্ষিণ কোরিয়া খুব অল্প সময়ের মধ্যে ৬০ এর দশকে জাপানের পরেই এশিয়ার একটি উন্নত দেশ হিসেবে পরিচিত হয়। বর্তমানে দুইটি দেশের একত্রীকরণ প্রক্রিয়া চলছে।

অবস্থান: দক্ষিণ কোরিয়া ৩২°২০′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ৩৮° উত্তর অক্ষরেখা এবং ১২৪°৪০′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ১২৯°৩০′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। এ দেশের উত্তরে উত্তর কোরিয়া, পূর্বে জাপান সাগর, দক্ষিণে কোরিয়া প্রণালি এবং পশ্চিমে পীত সাগর অবস্থিত। জাপান সাগর ও পীত সাগর সংযোগকারী ১৯৩ কিলোমিটার প্রশস্ত কোরিয়া প্রণালি জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে অবস্থান করছে।

আয়তন ও অধিবাসী: দক্ষিণ কোরিয়ার মোট আয়তন ৯৮,৫৮০ বর্গ কিলোমিটার। এ দেশে প্রায় ৪ কোটি ৯২ লক্ষ লোক বাস করে। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে গড়ে বসতি ঘনত্ব ৫০০ জন। এ দেশের অধিবাসীরা মঙ্গোলীয় মানবগোষ্ঠীর অন্তর্গত।

চিত্র ৬৭ : দক্ষিণ কোরিয়ার রাজনৈতিক বিভাগ

ভূপ্রকৃতি: দক্ষিণ কোরিয়ার উত্তর-পূর্বাংশ পার্বত্য এলাকার অন্তর্গত। দেশের পার্বত্য অংশটি পশ্চিম উপকূলের চেয়ে পূর্ব উপকূলের কাছে। পার্বত্য এলাকা ক্রমশ নিচু হয়ে দেশের মাঝামাঝি পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূপ্রাকৃতিক গঠন অনুসারে দেশটিকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় : (১) উপকূলবর্তী সমভূমি অঞ্চল, (২) পর্বত পাদদেশীয় অঞ্চল এবং (৩) পার্বত্য অঞ্চল।

১। উপকূলবর্তী সমভূমি অঞ্চল: পূর্ব দিকের উপকূলবর্তী সমভূমি সংকীর্ণ। এ সমভূমি দক্ষিণ দিকে ক্রমশ প্রশস্ত হয়েছে। দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূল প্রশস্ত নিম্ন সমভূমি দ্বারা গঠিত। ভূমির স্বাভাবিক ঢাল পশ্চিম দিকে।

২। পর্বত পাদদেশীয় অঞ্চল: মাঝে মাঝে নদী উপত্যকা দ্বারা বিভক্ত ছোট ছোট পাহাড় ও টিলার সমন্বয়ে এ অঞ্চল গঠিত। উঁচুভূমিগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় রয়েছে। প্রবল বর্ষণের ফলে এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে।

৩। পার্বত্য অঞ্চল: কয়েকটি বিক্ষিপ্ত শৃঙ্গ, মালভূমি ও উপত্যকার সমন্বয়ে পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। এখানকার মাটি সুদৃঢ় গ্রানাইট শিলা দ্বারা গঠিত। পার্বত্য এলাকার প্রধান শৃঙ্গগুলো ২,৪০০ মিটারের বেশি উঁচু। কাইমা মালভূমি দক্ষিণে তাইহোকু পর্বতশ্রেণীর সঙ্গে মিশেছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে মালভূমি পৃথককারী প্রশস্ত নিম্ন ও দীর্ঘ সমভূমি সংযোগ স্থাপকপথরূপে দক্ষিণের সমভূমিকে পশ্চিমের সমভূমির সঙ্গে যোগ করেছে।

নদী: জাপান সাগরে পতিত নদীগুলো অপ্রশস্ত ও নাতিদীর্ঘ। পক্ষান্তরে, পীত সাগরের দিকে প্রবাহিত নদীগুলো অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং মোহনার কাছে ক্রমশ প্রশস্ত হয়েছে। পশ্চিমবাহী নদীগুলো অনেক দূর পর্যন্ত, বিশেষ করে জোয়ারের সময় নাব্য। পশ্চিম পাশের নদীগুলোতে জোয়ারের পানির উচ্চতা ১০ মিটার পর্যন্ত হয়। সোমাজিন, কুং, নাকটং, হ্যানয় ও পুখান এ দেশের প্রধান নদী।

চিত্র ৬৮ : দক্ষিণ কোরিয়ার ভূপ্রকৃতি

জলবায়ু: নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত দক্ষিণ কোরিয়ার জলবায়ুতে সমুদ্রের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্তমান। দেশের দক্ষিণাংশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র এবং অবশিষ্টাংশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন। সারাদেশের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রাধান্য রয়েছে। এ দেশে শীত ও গ্রীষ্মে পরস্পর বিপরীত দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে এবং শীতকালে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। জুন মাসে সবচেয়ে বেশি এবং এপ্রিল মাসে সবচেয়ে কম বৃষ্টিপাত হয়। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১২৭ সেন্টিমিটার। এশিয়ার মূল ভূভাগের ওপর দিয়ে আগত শুষ্ক মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না। শীতকালে সারাদেশে কমপক্ষে এক মাস গড় উত্তাপ হিমাঙ্কের নিচে নেমে যায়। সিউলে প্রায় দুই মাস উষ্ণতা হিমাঙ্কের নিচে থাকে। ভ্লাডিভস্টকের পার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে সমুদ্রের উত্তর দিক থেকে আগত বায়ুর প্রভাবে পূর্ব উপকূল অত্যন্ত শীতল হয় এবং তুষারপাত ঘটে। এ দেশ মার্চ মাসে মাঞ্চুরিয়ার ওপর দিয়ে আগত ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে। জুলাই ও আগস্ট মাস টাইফুন ঝড়ের সময়। এ সময় উপকূলীয় এলাকার ঘরবাড়ি ও নৌযানগুলো ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

প্রাকৃতিক উদ্ভিদ: দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাকৃতিক উদ্ভিদে বনভূমির প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। এখানে সরলবর্গীয় গাছ ও পাতাঝরা গাছের মিশ্রণ দেখা যায়। দেশের পার্বত্য এলাকায় পাতাঝরা গাছের বন এবং দক্ষিণের সমভূমি এলাকায় বৃষ্টিবহুল বন দেখা যায়। পার্বত্য এলাকার গাছগুলোতে গ্রীষ্মকালে ঘন সবুজ প্রশস্ত পাতা শোভা পায়; কিন্তু শীতকালে
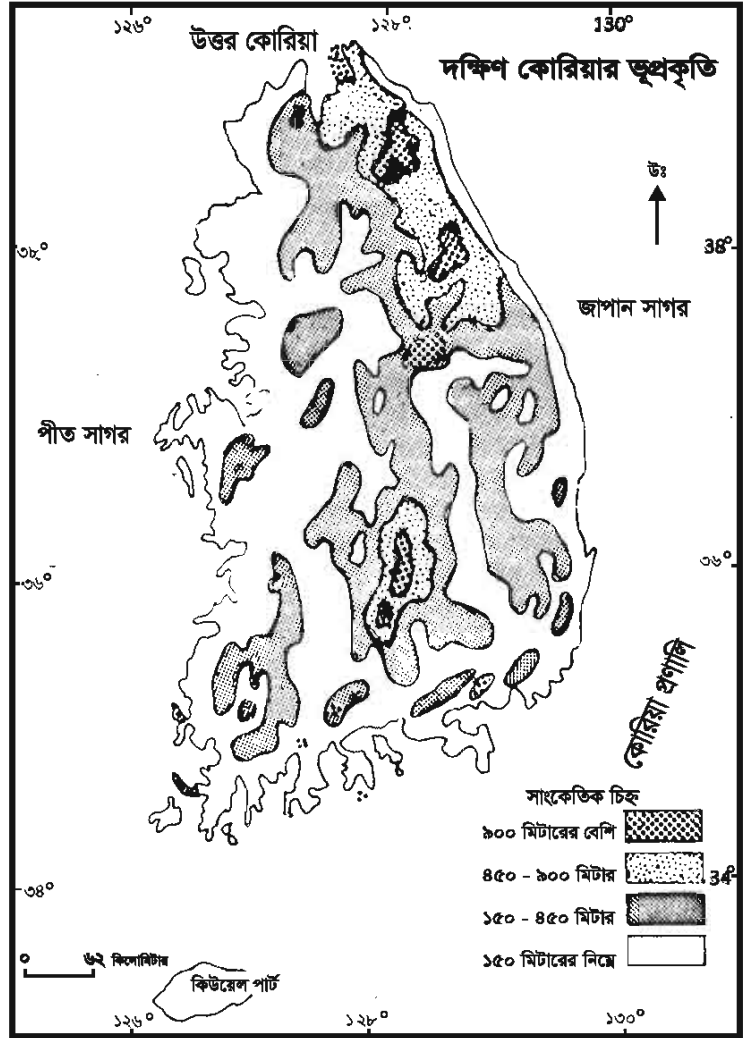
তা ঝরে পড়ে। এলম, মেপল, লিনডেন, বার্চ ও অ্যাশ ছাড়াও সোজা গুঁড়ির শক্ত লাল পাইন এসব বনে দেখা যায়। সাধারণত দেশের মোট ভূভাগের ৬৫ শতাংশ বনভূমির অন্তর্গত হলেও ব্যাপকভাবে গাছ কাটা ও অবহেলার ফলে অধিকাংশ এলাকা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে পুনরায় বনায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

কৃষি: দেশটির অধিকাংশই পর্বতময় ও বনভূমি দ্বারা আবৃত হলেও কৃষিপ্রধান। দেশের ২০.৬% জমি কৃষির অন্তর্গত। উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চলের ৮% এলাকায় এবং পার্বত্য নদী উপত্যকাগুলোতে ব্যাপকভাবে কৃষিকাজ করা হয়। অধিকাংশ লোক কৃষিজীবী; চাষাবাদ তাদের প্রধান উপজীবিকা। প্রধানত গ্রীষ্মের মৌসুমি বৃষ্টিপাতের ওপর নির্ভর করে গ্রীষ্মকালে কৃষকদের কর্মব্যস্ততা বেড়ে যায়। শুষ্ক ঋতুতে, বিশেষ করে শীতকালে কৃষিভূমিতে পানিসেচ করে চাষাবাদ করা হয়। দেশের ৮০% লোক চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত। মাছ শিকার গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় প্রধান পেশা।

এপ্রিল মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সবচেয়ে কম; কিন্তু এ বৃষ্টি ধান চাষের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রথম বৃষ্টির পর ধানের জমিগুলো চাষ দিয়ে বীজ বপন করা হয় এবং পরবর্তী বৃষ্টিপাতের দিনগুলোতে ধান গাছগুলো দ্রুত বেড়ে ওঠে। দেশের দক্ষিণ ও পশ্চিমে ধান চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অধিক (চিত্র ৬৯)। ধান এ দেশের প্রধান খাদ্যশস্য। এ ছাড়া এ দেশে জোয়ার, যব, গম, সয়াবিন, লালসীম বা ভাটকলাই উৎপন্ন হয়। অক্টোবর মাসে ধান সংগ্রহের পর যব ও গম উৎপাদনের জন্য জমি তৈরি করা হয়। জুন-জুলাই মাসে এ ফসল ঘরে তুলে বৃষ্টির দিনগুলোতে ধানের চারা রোপণ করা হয়। জোয়ার, যব ও গমের মিলিত উৎপাদন দেশে উৎপাদিত ধানের উৎপাদন থেকে বেশি।

বিশেষ করে অর্থকরী ফসল হিসেবে তুঁত, তুলা, তামাক, শন ও জিনসেং উৎপন্ন হয়। দক্ষিণ কোরিয়ায় প্রচুর সয়াবিন চাষ করা হয়। দেশের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে তুঁত গাছের চাষ করা হয়, ফলে এ দেশে রেশম উৎপাদন প্রসার লাভ করেছে। এ দেশে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপাদিত হয়। জিনসেং কোরিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য কৃষিজাত ফসল। এর শিকড়ের রস অনেক রোগ প্রতিরোধ করে, এ জন্য দেশে বিদেশে জিনসেং এর চাহিদা খুব বেশি। সরকারি তত্ত্বাবধানে জিনসেং ও তামাক উৎপাদন করা হয়।

দক্ষিণ কোরিয়ায় পশু চারণ প্রসার লাভ করেছে। দক্ষিণ কোরিয়ার গরুগুলো উন্নতজাতের। প্রতি বছর জাপানে অনেক গরু রপ্তানি করা হয়।

প্রাকৃতিক অঞ্চল (Natural Regions): ভূপ্রকৃতি এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে দক্ষিণ কোরিয়াকে পাঁচটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। নিচে এ অঞ্চলগুলো সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।
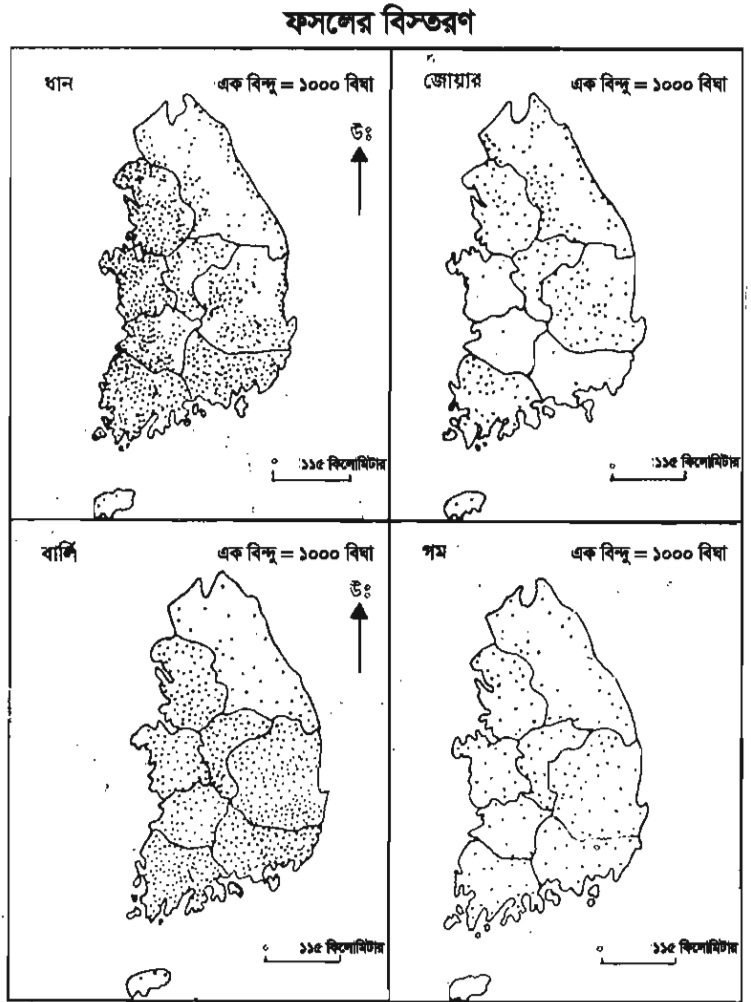
চিত্র ৬৯ : দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধান ফসলসমূহ

১। **পার্বত্য অঞ্চল:** বন্ধুর ও যাতায়াতের জন্য কষ্টকর এ অঞ্চলে পশ্চাৎপদ দেশীয় আদিবাসীদের হালকা বসতি রয়েছে।

মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনিওয়ালা দুইটি বা তিনটি কক্ষের বাড়িতে এসব লোকেরা বসবাস করে। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আদিবাসীরা পার্বত্য উপত্যকাগুলোতে খুব কমই চাষাবাদ করতে উদ্যোগী হয়। প্রচুর গাছ কেটে ফেলার ফলে বনভূমির পরিমাণ অনেক হ্রাস পেয়েছে।

২। **পূর্বাংশের উপকূলীয় ফালি অঞ্চল:** দেশের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন সংকীর্ণ এ উপকূলীয় অংশে বসবাসকারী গ্রামবাসীদের প্রধান উপজীবিকা মাছ শিকার। ছোট ছোট নৌকার সাহায্যে প্রাচীন পদ্ধতিতে তারা উপকূলের অদূরে মাছ শিকার করে। উপকূলীয় এলাকার পিছনের সংকীর্ণ কৃষি বলয়ে তারা নিজেদের জন্য ধান ও জোয়ার চাষ করে। এ উপকূলে জোয়ার-ভাঁটার প্রভাব কম।

৩। **দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল:** ন্যাকনোং অববাহিকা বেষ্টনকারী পর্বত পাদদেশীয় এলাকা নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। দেশের এ অংশে রেশম চাষ যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে। এখানে উন্নত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। পুসান সমুদ্রবন্দর এ অঞ্চলে অবস্থিত।

৪। **দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল:** কৃষি অববাহিকাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত দেশের এ অংশ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বছরে দুইটি ফসল জন্মে। অক্টোবর মাসে ধান এবং জুন মাসে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার আগেই গম অথবা যব সংগ্রহ করা হয়। এখানে রেশম চাষও গুরুত্ব লাভ করেছে।

৫। **উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল:** দক্ষিণ কোরিয়ার এ অঞ্চল খুবই ছোট। প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয় বলে এখানকার কৃষি অববাহিকাগুলো থেকে বছরে মাত্র একটি ফসল ওঠে। এখানে প্রধানত গম, জোয়ার ও সয়াবিন উৎপন্ন হয়। এটি দক্ষিণ কোরিয়ার খনি এলাকা।

খনিজ: দক্ষিণ কোরিয়ায় খনিজ সম্পদের পরিমাণ কম। এ দেশে স্বল্প পরিমাণে চুনাপাথর, টাংস্টেন, রুপা, দস্তা, আকরিক লোহা, তামা, সীসা, গ্রাফাইট ও কয়লা পাওয়া যায়। এসব খনিজের মধ্যে কয়লার উৎপাদন বেশি। এ দেশে অ্যানথ্রাসাইট কয়লা পাওয়া যায়।

চিত্র ৭০ : দক্ষিণ কোরিয়ার প্রাকৃতিক অঞ্চল

শিল্প: কয়লা ও আকরিক লোহা বর্তমান থাকায় দক্ষিণ কোরিয়ায় শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। সুতিবস্ত্র ও পশমিবস্ত্র শিল্পে দক্ষিণ কোরিয়া উন্নত। আমদানিকৃত তুলার সঙ্গে দেশীয় তুলা মিশিয়ে এ দেশে উন্নতমানের সুতিবস্ত্র তৈরি করে স্থানীয় চাহিদা পূরণ করা হয়। শীতকালে শীতের প্রকোপ বেশি হওয়ায় দেশে পশমিবস্ত্রের চাহিদা রয়েছে। ফলে দেশের প্রয়োজনে এখানে পশম শিল্প প্রসার লাভ করেছে। রেশম উৎপাদন ও রেশমিবস্ত্র তৈরি কুটির শিল্পের পর্যায়ে বিকাশ লাভ করেছে। এ ছাড়া পেট্রোকেমিক্যাল, রাসায়নিক তন্তু, যন্ত্রপাতি শিল্প,

সিমেন্ট শিল্প এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্প গড়ে উঠেছে।

পরিবহণ ও যোগাযোগঃ রেলপথ ও সড়কপথ এ দেশের প্রধান পরিবহণ মাধ্যম। উপকূলীয় সমভূমি এলাকায় এ উভয় প্রকার পরিবহণ ব্যবস্থা বিকাশ লাভ করেছে। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশে যোগাযোগ ব্যবস্থা সবচেয়ে উন্নত। প্রশস্ত করিডোরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বের রেলপথের সঙ্গে পশ্চিমাংশের রেলপথের সংযোগ সাধন করা হয়েছে। উত্তর কোরিয়ার মধ্য দিয়ে এ দেশের রেলপথ চীনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ দেশের প্রায় ৫৪,৬৮৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ এবং প্রায় ৩,১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ রয়েছে। এ ছাড়া পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সঙ্গে নৌপথে এবং দূরবর্তী দেশগুলোর সঙ্গে সমুদ্রপথ ও বিমানপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

চিত্র ৭১ : দক্ষিণ কোরিয়ার যোগাযোগ ব্যবস্থা

বৈদেশিক বাণিজ্যঃ বিপুল জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও দক্ষিণ কোরিয়ায় উৎপাদিত খাদ্যশস্যের বিপুল উদ্বৃত্ত অংশ ও শিল্প দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়। জাপান ও চীনের সঙ্গে এ দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক বেশি। এ ছাড়া তাইওয়ান, ফিলিপাইন, বাংলাদেশ, ভারত, মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ দেশগুলো ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার বাণিজ্য সম্পর্ক রয়েছে। উন্নতমানের পোশাক, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার যন্ত্রাংশ ও জাহাজ শিল্প আধুনিক দক্ষিণ কোরিয়াকে এশিয়ার অন্যতম একটি প্রধান সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তুলেছে। চাল, সয়াবিন, রেশম ও মাছ এ দেশের অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্য। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে লোহা, ইস্পাতজাত কলকব্জা, কাগজ, ওষুধ এবং উন্নতমানের তুলা প্রধান।

শহর ও বন্দরঃ সিউল দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী। পুসান প্রাচীনতম ও বৃহত্তম বন্দর। সমৃদ্ধ ও উন্নতির দিক থেকে দেশের অন্যান্য শহর ও গ্রামগুলোর চেয়ে এ দুইটি নগরী সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইনচন দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর। তায়েগু, তেজন, কোয়াংজু ও মোকপো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহর।

জনসংখ্যা ও উন্নয়নের ধারা

জনসংখ্যাঃ ১৯৯৫ সালের জুলাই এর তথ্য অনুসারে এই দেশে ০-১৪ বছর বয়সের জনসংখ্যা ২৪%, ১৫-৬৪ বছর বয়সের জনসংখ্যা ৭১% এবং ৬৫ ও উর্ধ্ব বয়সের জনসংখ্যা ৫%। দক্ষিণ কোরিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.০৪%, জন্মহার ১৫.৬৩%, মৃত্যুহার ৬.১৮%, নিট অভিগমন হার ০.৯%, শিশু মৃত্যুহার ২০.৯%, গড় আয়ু ৭০-৮০ বছর।

এ দেশে বিভিন্ন উপজাতীয় পশ্চাৎপদ লোক বসবাস করে। চৈনিকদের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০ জন। ১০ বছর-এর উর্ধ্ব বয়সের প্রায় সকলেই লিখতে ও পড়তে পারে। মোট জনসংখ্যার ৯৫% শিক্ষিত।

উন্নয়নের ধারা: ১৯৪৮ সালের ১৫ আগস্ট বিদেশি শাসন থেকে দক্ষিণ কোরিয়া মুক্ত হয়েছে। এরপর দেশটি ক্রমশ অর্থনীতির দিক থেকে উন্নতি লাভ করেছে। এ দেশের গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নতির পশ্চাতে রয়েছে রপ্তানিমুখী অর্থনীতির পরিকল্পিত উন্নয়ন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯১ সাল এর মধ্যবর্তী সময়ে বার্ষিক গড় প্রকৃত জিডিপি ১০% বৃদ্ধি পেয়েছে। সুদৃঢ় শ্রম বাজার, মুদ্রাস্ফীতির ওপর প্রবল চাপ এবং ব্যাংকে মুদ্রা সঞ্চয়ের দ্রুত বৃদ্ধির মাধ্যমে এ দেশের অর্থনীতিকে চাঙা রাখা সম্ভব হয়েছে। এ দেশের প্রায় ২ কোটি লোক শ্রম শক্তির অন্তর্গত। চাকরি ও অন্যান্য কাজে ৫২%, খনিজ উত্তোলন ও শিল্পে ২৭% এবং কৃষি, মাছ শিকার ও বনজ দ্রব্য সংগ্রহের কাজে ২১% লোক নিয়োজিত রয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়া

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

অবস্থান ও আয়তন: দক্ষিণ কোরিয়া পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ। এর উত্তরে উত্তর কোরিয়া, পূর্বে জাপান সাগর, দক্ষিণে কোরিয়া প্রণালি ও পশ্চিমে পীত সাগর অবস্থিত। কোরিয়া প্রণালি জাপান থেকে দক্ষিণ কোরিয়াকে পৃথক করেছে। এ দেশের মোট আয়তন ৯৮,৫৮০ বর্গ কিলোমিটার। এ দেশে প্রায় ৪ কোটি ৯২ লক্ষ লোক বাস করে। বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৫০০ জন।

ভূপ্রকৃতি: ভূপ্রাকৃতিক গঠন অনুসারে এ দেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয় : (১) উপকূলবর্তী সমভূমি অঞ্চল, (২) পর্বত পাদদেশীয় অঞ্চল, (৩) পার্বত্য অঞ্চল।

জলবায়ু: দেশের দক্ষিণাংশের জলবায়ু উষ্ণ ও আর্দ্র এবং অবশিষ্টাংশ সমভাবাপন্ন। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে এবং শীতকালে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বায়ু প্রবাহিত হয়। গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। এশিয়ার মূল ভূভাগের ওপর দিয়ে আগত শীতের শুষ্ক মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত হয় না। মার্চ মাস স্থল ঘূর্ণিঝড়ের এবং জুলাই থেকে আগস্ট টাইফুন ঝড়ের সময়।

প্রাকৃতিক উদ্ভিদ: দক্ষিণ কোরিয়ায় সরলবর্গীয় ও পাতাঝরা গাছের মিশ্রণ দেখা যায়। পার্বত্য এলাকায় পাতাঝরা গাছের এবং দক্ষিণের সমভূমি এলাকায় বৃষ্টিবহুল বন রয়েছে।

কৃষি: দেশের মাত্র ২০.৬% জমি কৃষিকাজের অন্তর্গত। ধান প্রধান কৃষিজাত ফসল; দেশের পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলে গ্রীষ্মকালে আর্দ্র কৃষি পদ্ধতিতে ধান চাষ করা হয়। বিশেষ অর্থকরী ফসল হিসেবে তুঁত, সয়াবিন, তুলা, তামাক, শন ও জিনসেং উৎপন্ন হয়।

খনিজ সম্পদ: এ দেশে স্বল্প পরিমাণে চুনাপাথর, রুপা, দস্তা, টাংস্টেন, আকরিক লোহা, তামা, সীসা, গ্রাফাইট ও কয়লা পাওয়া যায়। এ দেশে অ্যানথ্রাসাইট কয়লা উত্তোলন করা হয়।

শিল্প: কয়লা ও আকরিক লোহা বর্তমান থাকায় এ দেশে শিল্প দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে। সুতিবস্ত্র ও পশমিবস্ত্র প্রধান শিল্প। রেশমিবস্ত্র তৈরি কুটির শিল্প হিসেবে বিকাশ লাভ করেছে। রাসায়নিক তন্তু, পেট্রোকেমিক্যাল, যন্ত্রপাতি শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্প প্রসার লাভ করেছে।

পরিবহণ ও যোগাযোগ: পরিবহণ ও যোগাযোগের জন্য রেলপথ ও সড়কপথ ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়। দেশের দক্ষিণাংশে যোগাযোগ ব্যবস্থা বেশি উন্নত। সমুদ্রপথে বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য: চাল, সয়াবিন, রেশম, মাছ, উন্নতমানের পোশাক, ইলেকট্রনিক্স, কম্পিউটার, যন্ত্রাংশ বিদেশে রপ্তানি এবং লোহা, ইস্পাতজাত কলকব্জা, কাগজ, ওষুধ ও উন্নতমানের তুলা আমদানি করা হয়।

জনসংখ্যা ও উন্নয়নের ধারা: ১৯৯৫ সালের তথ্য অনুসারে দক্ষিণ কোরিয়ার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.০৪%, জন্মহার ১৫.৬৩%, মৃত্যুহার ৬.১৮%, নিট অভিগমন হার ০.৯%, শিশু মৃত্যুহার ২০.৯% এবং গড় আয়ু ৭০ থেকে ৮০ বছর। দেশটি ১৯৪৮ সালে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে ক্রমশ অর্থনীতির দিক থেকে উন্নতি লাভ করেছে। ১৯৮৬

থেকে ১৯৯১ এর মধ্যবর্তী সময়ে বার্ষিক গড় প্রকৃতি জিডিপি বৃদ্ধি পেয়েছে ১০%। দক্ষিণ কোরিয়ার অর্থনীতিকে চাঙা করে রেখেছে সে দেশের সুদৃঢ় শ্রম বাজার, মুদ্রাস্ফীতির ওপর প্রবল চাপ এবং ব্যাংকে মুদ্রা সঞ্চায়ের দ্রুত বৃদ্ধি। এ দেশে প্রায় ২ কোটি লোক শ্রম শক্তির অন্তর্গত।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। কোরিয়া প্রণালি নিচের কোন দুইটি সাগর সংযোগকারী?

ক. পীত সাগর ও দক্ষিণ চীন সাগর
খ. জাপান সাগর ও পীত সাগর
গ. জাপান সাগর ও সুলু সাগর
ঘ. কাস্পিয়ান সাগর ও লোহিত সাগর

দক্ষিণ কোরিয়ার জনসংখ্যার বয়স কাঠামোর লেখচিত্রটি পর্যবেক্ষণ কর এবং ২ থেকে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
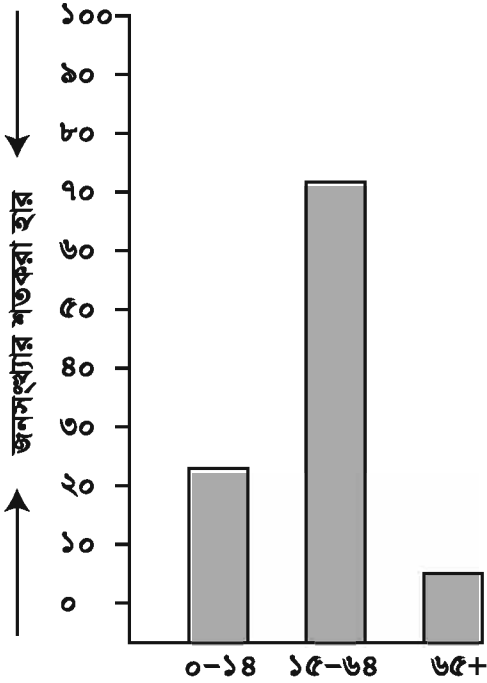
২। প্রদত্ত চিত্রে দক্ষিণ কোরিয়ার বয়স কাঠামো প্রদর্শন করা হয়েছে–

ক. স্তম্ভ লেখচিত্রে
খ. পাই গ্রাফে
গ. রৈখিক লেখচিত্রে
ঘ. জনসংখ্যা পিরামিডে

৩. দক্ষিণ কোরিয়ায় কোন বয়সী লোকসংখ্যার পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?

ক. শিশু
খ. শিশু কিশোর
গ. মধ্যবয়সী
ঘ. বৃদ্ধ

৪। **দক্ষিণ কোরিয়ার ক্ষেত্রে কোন উক্তিটি সঠিক?**

i. ০–১৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনসংখ্যার আধিক্য

ii. ১৫–৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম জনসংখ্যার আধিক্য

iii. ৬৫ বছর–এর উর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার পরিমাণ কম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii এবং iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দক্ষিণ কোরিয়ার জলবায়ুতে সমুদ্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এ দেশে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়। এশিয়ার মূল ভূভাগের ওপর দিয়ে আগত শুষ্ক মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় না। এই সময়ে কৃষিভূমিতে পানিসেচ করে চাষাবাদ করা হয়। প্রচণ্ড শীত অনুভূত অঞ্চলে বছরে মাত্র একটি ফসল ওঠে। অন্য অঞ্চলে বছরে দুইটি ফসল জন্মে। এর পরেও দক্ষিণ কোরিয়ায় দেশীয় চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য রপ্তানি করে থাকে। একই সঙ্গে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ প্রাপ্তি দক্ষিণ কোরিয়ার শিল্প উন্নতিকে ত্বরান্বিত করছে।

ক. দক্ষিণ কোরিয়ার জলবায়ু কীরূপ?

খ. দক্ষিণ কোরিয়ার উদ্ধৃত খাদ্যশস্য উৎপাদনের একটি অবদান ব্যাখ্যা কর।

গ. বাংলাদেশের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার জলবায়ুর গুরুত্বপূর্ণ সাদৃশ্য চিহ্নিত করে তালিকা প্রস্তুত কর।

ঘ. কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সুবিধা দক্ষিণ কোরিয়ার শিল্পে দ্রুত বিকাশ ঘটায় তা বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

মধ্যপ্রাচ্য

MIDDLE EAST

পরিচিতি: আফগানিস্তান, ইরান, ইরাক, কুয়েত, বাহরাইন, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ওমান, ইয়েমেন, সৌদি আরব, জর্ডান, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, ইসরাইল, লেবানন, তুরস্ক, সাইপ্রাস ও মিসর দেশগুলো মিলিতভাবে 'মধ্যপ্রাচ্য' নামে পরিচিত।

অবস্থান: মধ্যপ্রাচ্যের উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগর; পশ্চিমে এজিয়ান সাগর, ভূমধ্যসাগর, লিবিয়া ও লোহিত সাগর; দক্ষিণে সুদান, আরব সাগর ও পারস্য উপসাগর এবং পূর্বে পাকিস্তান অবস্থিত। সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য ১৩° উত্তর অক্ষরেখা থেকে ৪২° উত্তর অক্ষরেখা এবং ২৫° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৭৪° পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। ৫০° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে দিয়ে অতিক্রম করেছে।

আয়তন ও জনসংখ্যা: সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যের মোট আয়তন ৭৮,৪২,৩৬৪ বর্গ কিলোমিটার। অঞ্চলটি পূর্ব-পশ্চিমে ৪,৫০৫ কিলোমিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে ৩,৩৭৯ কিলোমিটার প্রসারিত। এই অঞ্চলে ১৮টি রাষ্ট্র আছে। একমাত্র ইসরাইল ছাড়া অন্য সব রাষ্ট্র মুসলিম শাসিত। ইসরাইল ইহুদি রাষ্ট্র। আয়তনের দিক থেকে সৌদি আরব প্রথম, ইরান দ্বিতীয়, মিসর তৃতীয়, তুরস্ক চতুর্থ এবং আফগানিস্তান পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে। বর্তমানে এই অঞ্চলের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩৮.৪৯ কোটি এবং গড়ে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বসতির ঘনত্ব ৪৯ জন। নীল নদের অববাহিকা এবং তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস অববাহিকায় বসতির ঘনত্ব অনেক বেশি। জনসংখ্যার দিক থেকে মিসর প্রথম, তুরস্ক দ্বিতীয়, ইরান তৃতীয়, আফগানিস্তান চতুর্থ এবং ইরাক ও সৌদি আরব পঞ্চম। আবার বসতি ঘনত্বের দিক থেকে বাহরাইন প্রথম, প্যালেস্টাইন দ্বিতীয়, লেবানন তৃতীয়, ইসরাইল চতুর্থ এবং কুয়েত পঞ্চম। ১১৫ পৃষ্ঠায় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের আয়তন ও জনসংখ্যার সারণি দেওয়া হল।

অধিবাসী,ধর্ম ও ভাষা: মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ অধিবাসী ককেশীয়। এখানে ইসলাম, খ্রিস্টান, ইহুদি এবং দ্রুজ ধর্মাবলম্বী লোক বাস করলেও মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯৬ জন। এদের মধ্যে সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান রয়েছে। অধিবাসীরা স্থানভেদে আরবি, ফারসি ও পস্তু ভাষায় কথা বলেন। ইংরেজি জানা লোকের সংখ্যা খুবই কম।

ভূপ্রকৃতি: ভূপ্রাকৃতিক গঠন অনুসারে মধ্যপ্রাচ্যকে প্রধানত (১) পার্বত্য অঞ্চল, (২) মালভূমি ও উচ্চভূমি অঞ্চল এবং (৩) সমভূমি অঞ্চল এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়।

১। পার্বত্য অঞ্চল: পামীর মালভূমি থেকে পশ্চিম দিকে প্রসারিত হিন্দুকুশ পর্বত আফগানিস্তানের উত্তরাংশে অবস্থিত। ইরানের উত্তরে এলবুর্জ এবং দক্ষিণের জাগ্রোস পর্বত দুইটি পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে আর্মেনীয় গ্রন্থিতে মিশেছে। আর্মেনীয় গ্রন্থি থেকে পশ্চিম দিকে বেরিয়ে আসা পন্টিক ও টোরাস পর্বত দুইটি যথাক্রমে তুরস্কের উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত।

২। মালভূমি ও উচ্চভূমি অঞ্চল: উত্তরে হিন্দুকুশ ও এলবুর্জ এবং দক্ষিণে জাগ্রোস পর্বতের মধ্যে অবস্থিত ইরান মালভূমি প্রকৃতপক্ষে বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান ও ইরানের অধিকাংশ এলাকা দখল করেছে। এই মালভূমির উচ্চতা ৯০২ থেকে ১,৫০৪ মিটার ও গড় উচ্চতা ১,২০০ মিটার এবং এর মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত নিচু।

পন্টিক ও টোরাস পর্বতদ্বয়ের মধ্যে আনাতোলিয়া মালভূমি অবস্থিত। এর গড় উচ্চতা ৭৫০ মিটার। এই মালভূমি ক্রমশ পশ্চিম দিকে ঢালু হয়েছে।

আরব মালভূমি প্রায় সমগ্র আরব উপদ্বীপ ও সিনাই উপদ্বীপ নিয়ে গঠিত। এর পশ্চিমাংশ যথেষ্ট উঁচু এবং পূর্বে পারস্য উপসাগরের দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে সমভূমির সঙ্গে মিশেছে। পূর্ব মিসরে নীল নদের পূর্বে কিছু উঁচুভূমি রয়েছে।

৩। সমভূমি অঞ্চল: ইরাকের তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিসের মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়া এবং মিসরের নীল নদের অববাহিকা
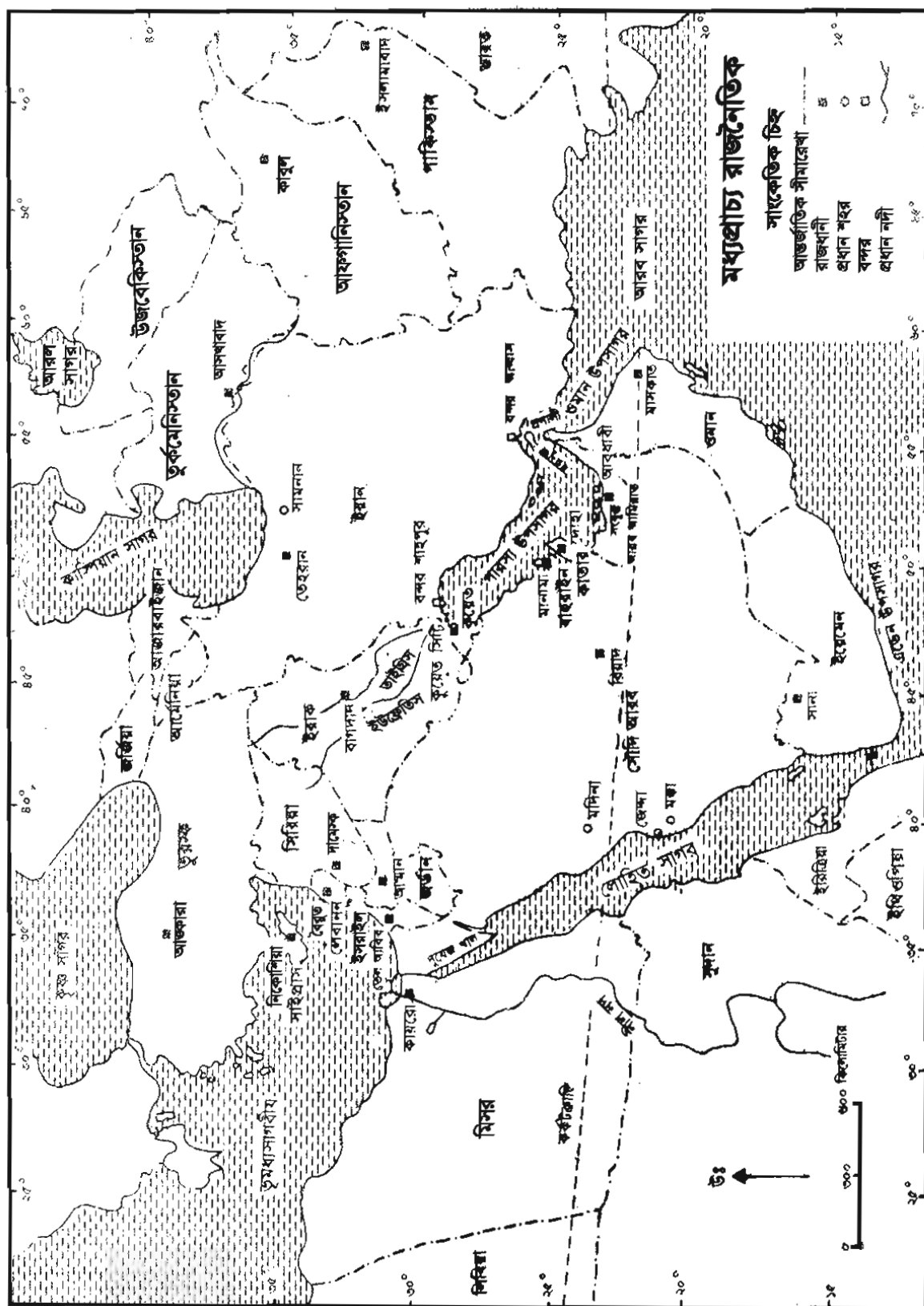
চিত্র ৭২ : মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র

সারণি ৫ : মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের আয়তন, জনসংখ্যা, ঘনত্ব ও রাজধানী, ২০০৮

দেশের নাম	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যা (কোটি)	জনসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কিলোমিটার)	রাজধানী
১। পূর্বাঞ্চল				
আফগানিস্তান	৬,৪৭,৫০০	৩.২৭	৫১	কাবুল
ইরান	১৬,৪৮,০০০	৬.৫৯	৪১	তেহরান
মোট	**২২,৯৫,৫০০**	**৯.৮৬**	**৪৩**	--
২। মধ্য অঞ্চল				
ইরাক	৪,৩৭,০৭২	২.৮২	৬৫	বাগদাদ
কুয়েত	১৭,৮২০	০.২৬	১৪৬	কুয়েত
বাহরাইন	৬৬৫	০.০৭	১০৫৩	মানামা
কাতার	১১,৪৩৭	০.০৯	৭৯	দোহা
সংযুক্ত আরব আমিরাত	৮৩,৬০০	০.৪৬	৫৫	আবুধাবী
মোট	**৫,৫০,৫৯৪**	**৩.৭০**	**৬৭**	--
৩। দক্ষিণ অঞ্চল				
সৌদি আরব	২১,৪৯,৬৯০	২.৮২	১৩	রিয়াদ
ইয়েমেন	৫,২৭,৯৭০	২.৩০	৪৪	সানা
ওমান	২,১২,৪৬০	০.২৬	১২	মাসকাত
মোট	**২৮,৯০,১২০**	**৫.৩৮**	**১৯**	--
৪। পশ্চিমাঞ্চল				
তুরস্ক	৭,৮০,৫৮০	৭.১৯	৯২	আঙ্কারা
সিরিয়া	১,৮৫,১৮০	১.৯৭	১০৬	দামেস্ক
জর্ডান	৯২,৩০০	০.৬২	৬৭	আম্মান
লেবানন	১০,০০০	০.৪০	৩৮৫	বৈরুত
ইসরাইল	২০,৭৭০	০.৭১	৩৪১	জেরুজালেম
প্যালেস্টাইন	৬,২২০	০.৪১	৬৫৯	রামাল্লাহ
মিসর	১০,০১,৪৫০	৮.১৭	৮২	কায়রো
সাইপ্রাস	৯,২৫০	০.০৮	৮৬	নিকোশিয়া
মোট	**২১,০৬,১৫০**	**১৯.৫৫**	**৯৩**	--
সর্বমোট	**৭৮,৪২,৩৬৪**	**৩৮.৪৯**	**৪৯**	--

উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৮

মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সমভূমি অঞ্চল। নদীবিধৌত এ সমভূমিদ্বয় পলিমাটি সমৃদ্ধ হওয়ায় যথেষ্ট উর্বর। কাস্পিয়ান সাগরের পাশে উত্তর ইরানের সমভূমি এবং পারস্য উপসাগরের পূর্বে দক্ষিণ ইরানের সমভূমি অবস্থিত। পারস্য উপসাগরের পশ্চিমে সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কুয়েতের সমভূমি। আরব উপদ্বীপের পশ্চিমে লোহিত সাগরের
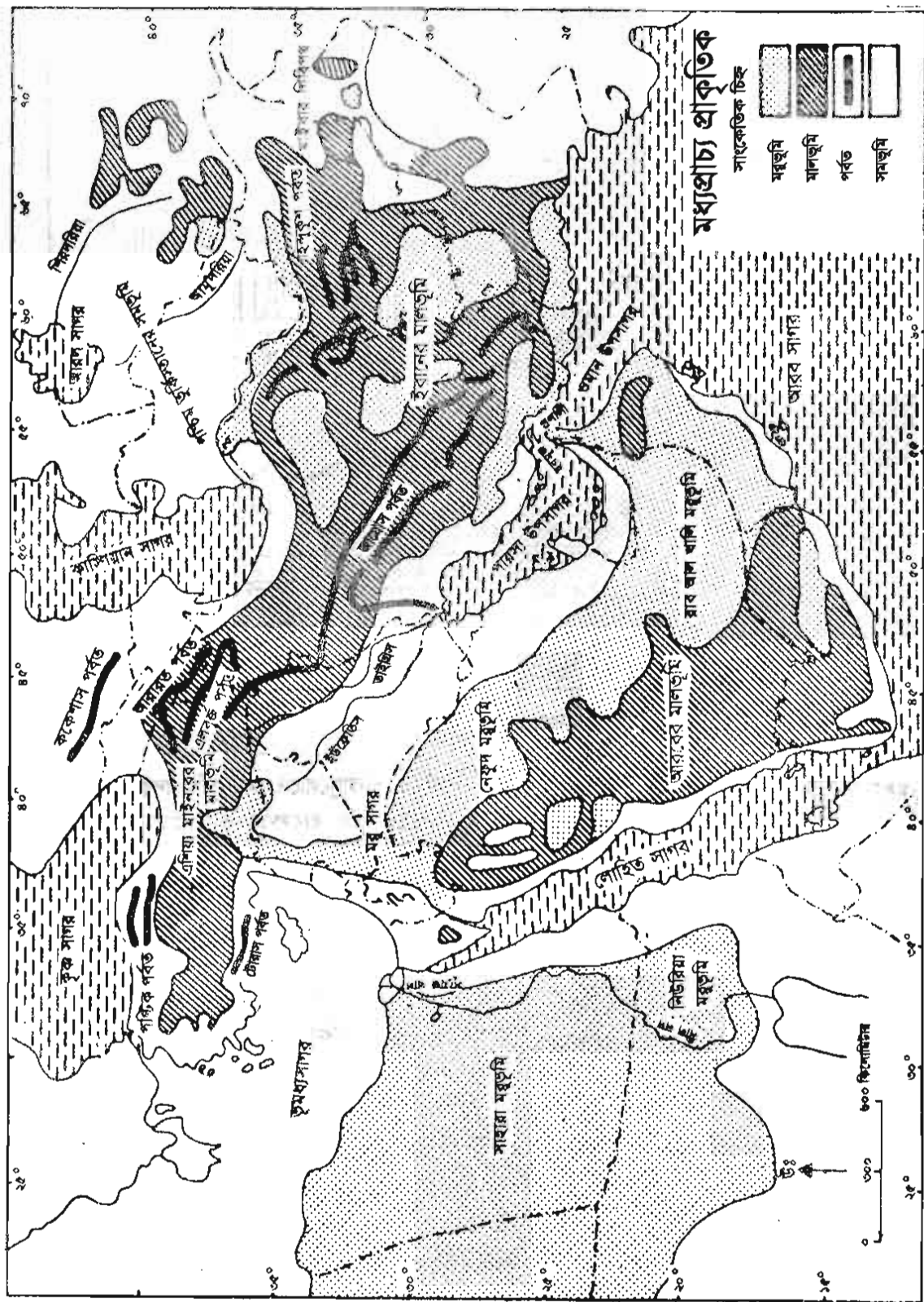
চিত্র ৭৩ : মধ্যপ্রাচ্যের প্রাকৃতিক গঠন

পাশে দীর্ঘ সংকীর্ণ সমভূমি এবং উত্তর আফগানিস্তানে আমুদরিয়ার দক্ষিণ পাশে স্বল্প পরিসর সমভূমি রয়েছে। নীল অববাহিকা মিসরের প্রধান সমভূমি অঞ্চল।

জলবায়ু: মধ্যপ্রাচ্যের সংকীর্ণ পশ্চিম উপকূলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয়; অন্য সব জায়গায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুবই কম। শীত ও গ্রীষ্ম ঋতুর উত্তাপের ব্যাপক পার্থক্য ও চরমভাবাপন্ন জলবায়ু এ অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। আফগানিস্তানে স্বল্প পরিমাণ বর্ষণের অধিকাংশই তুষার আকারে পতিত হয়। শীতকালে ইরান মালভূমিতে তীব্র শীত অনুভূত হয় এবং রাতে তুষার পড়ে। গ্রীষ্মকালে আকাশ মেঘশূন্য ও বাতাস শুষ্ক থাকে বলে তখন অধিক উত্তাপ অনুভূত হয়। ইরাকে শীতকালে ভূমধ্যসাগর থেকে আসা ঘূর্ণিবায়ুর প্রভাবে বৃষ্টি হয়। প্রচণ্ড উত্তাপ গ্রীষ্মকালের বৈশিষ্ট্য। তুরস্কের ভূমধ্যসাগর উপকূল উষ্ণ। এজিয়ান সাগর উপকূলের উপত্যকাগুলো শীতল। গ্রীষ্মকাল উষ্ণ, শীতকালে শীতের তীব্রতা অধিক। সিরিয়া উপকূলে শীতকালে বৃষ্টি হয়। কিন্তু দেশের অভ্যন্তর বৃষ্টিহীন ও শুষ্ক হওয়ায় দক্ষিণ সিরিয়ায় মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে। জর্ডানে গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিহীন এবং শীতকালে বৃষ্টি হয়। লেবানন, প্যালেস্টাইন ও ইসরাইলে ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু পরিলক্ষিত হয়। সৌদি আরব বৃষ্টিহীন, শুষ্ক ও মরুময় দেশ।

জলবায়ু অঞ্চল: সমুদ্র থেকে দূরত্ব, মহাদেশীয় অবস্থান ও স্থানীয় ভূমিরূপের প্রভাবের ফলে সমগ্র মধ্যপ্রাচ্যে তিন প্রকার জলবায়ু অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছে।

১। **উষ্ণ মরু জলবায়ু অঞ্চল:** আরব উপদ্বীপ ও মিসর এ জলবায়ুর অন্তর্গত। দক্ষিণ সিরিয়া ও দক্ষিণ ইরাক, জর্ডান, সৌদি আরব, ইয়েমেন, ওমান, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও কাতারে শীত ও গ্রীষ্মের উষ্ণতার তারতম্য খুব বেশি এবং বাতাস প্রায় সব সময় জলীয়বাষ্পহীন অবস্থায় থাকে। ঘূর্ণিবায়ুর প্রভাবে কদাচিৎ বৃষ্টি হয়।

২। **শীতল মরু জলবায়ু অঞ্চল:** ইরান ও আফগানিস্তান এ জলবায়ুর অন্তর্গত। পর্বত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত হওয়ায় জলীয়বাষ্প প্রবেশ করতে পারে না, ফলে এই অঞ্চল বৃষ্টিহীন। উচ্চতা বেশি হওয়ায় এখানে জলবায়ু বেশ শীতল। শীত ও গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য খুব বেশি হওয়ায় জলবায়ু চরমভাবাপন্ন।
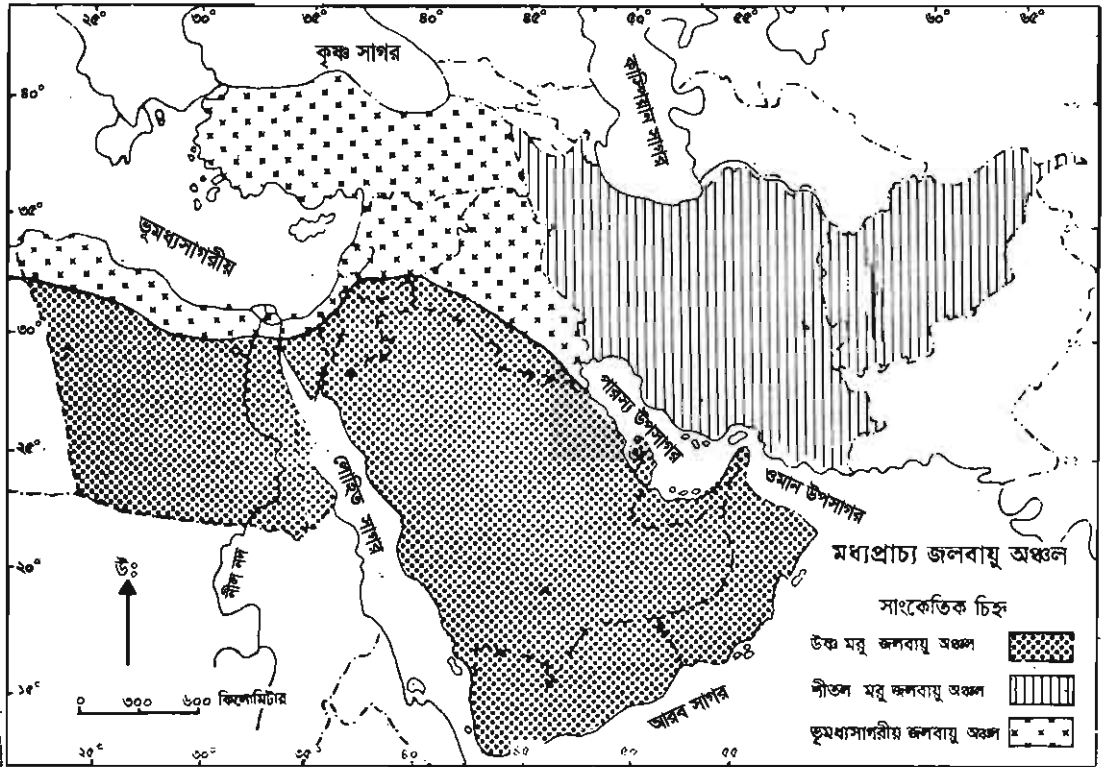
চিত্র ৭৪ : মধ্যপ্রাচ্যের জলবায়ু অঞ্চল

৩। **ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল:** তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন, প্যালেস্টাইন, ইসরাইল, সিনাই উপদ্বীপ, সাইপ্রাস দ্বীপ ও মিসরের অংশবিশেষে এই জলবায়ু অনুভূত হয়। পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে এখানে শীতকালে বৃষ্টি হয়। স্থলভাগ থেকে আগত শুষ্ক অয়ন বায়ুর প্রভাবে এখানে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয় না। সাগর থেকে কোনো অংশই দূরে অবস্থিত না হওয়ায় এই অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন নয়।

কৃষি ব্যবস্থা: সমভূমির পরিমাণ কম থাকায় মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশে কৃষিকাজ উন্নতি ও প্রসার লাভ করেনি। একমাত্র নদী উপত্যকা ও বদ্বীপ অঞ্চলে কৃষিকাজ প্রসার লাভ করেছে। মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ স্থানে শুষ্ক কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। নদী উপত্যকাগুলোতে সেচ কৃষি পদ্ধতি প্রচলিত আছে। ইরানে কৃষি ব্যবস্থায় ভূমি আবর্তন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

অধিবাসীদের প্রধান খাদ্যশস্য গম। এ অঞ্চলের প্রতিটি দেশে গম চাষ করা হয়। এ ছাড়া স্থানভেদে যব, ভুট্টা, ধান, জোয়ার, বীট, তুলা, তামাক, খেজুর, রেশম ও বিভিন্ন প্রকার ফল উৎপন্ন হয়। অনুকূল পরিবেশে পশুপালন ব্যবস্থা দেখা যায়।

আফগানিস্তানের এক-পঞ্চমাংশ জমি কৃষিকাজের অন্তর্গত রয়েছে। সে দেশে উত্তরের সমভূমি ও নদী উপত্যকাগুলোতে চাষাবাদ করা হয়। মাঝে মাঝে কৃষিভূমিতে পানিসেচ করার প্রয়োজন হয়। গম, যব, ধান, ভুট্টা, বীট, তুলা ও তামাক ছাড়াও এ দেশে আঙুর, বেদানা, নাশপাতি, আখরোট প্রভৃতি ফল উৎপন্ন হয়। পশম ও মাংসের জন্য এ দেশে পশুপালন করা হয়।

ইরানের মোট ভূভাগের শতকরা প্রায় ১০ ভাগ কৃষিভূমির অন্তর্গত। কাস্পিয়ান সাগর ও পারস্য উপসাগর উপকূল ছাড়া অন্য স্থানে সেচের সাহায্যে চাষাবাদ করা হয়। গম, ধান, ভুট্টা, ফল, তুলা, তামাক, আঙুর ও চা ইরানের প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য। শুষ্ক পাহাড়িয়া তৃণভূমিতে মেষ ও ছাগল পালিত হয়। এ দেশে মাছ শিকার পদ্ধতি উন্নতি লাভ করেছে।
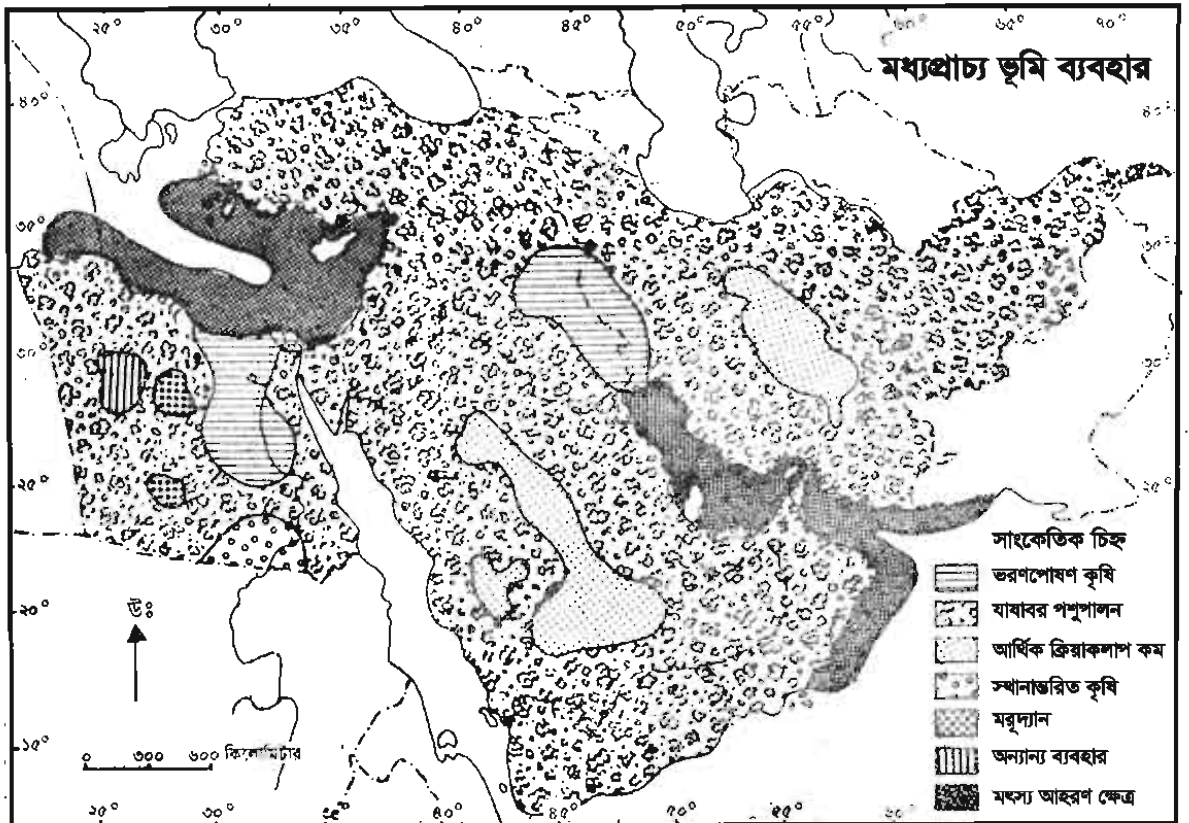
চিত্র ৭৫ : মধ্যপ্রাচ্যের ভূমি ব্যবহার

ইরাক কৃষিপ্রধান দেশ, কিন্তু কৃষিযোগ্য ভূমির এক-ষষ্ঠমাংশ মাত্র ব্যবহার করা হয়। পলিযুক্ত মাটি থাকা সত্ত্বেও এ দেশে উৎপাদনের পরিমাণ কম। দেশের দক্ষিণে যব, ধান ও খেজুর এবং উত্তরে যব, গম ও রসাল ফল উৎপন্ন হয়। বাণিজ্যিক ফসলের মধ্যে খেজুরের পরই তুলার স্থান। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যবর্তী এলাকায় উৎকৃষ্ট তুলা জন্মায়। কুর্দিস্তানে প্রচুর তামাক উৎপন্ন হয়। বাগদাদ অঞ্চলে রেশম কীটের জন্য তুঁত গাছের চাষ করা হয়।

তুরস্কের মোট ভূভাগের শতকরা প্রায় ৩০ ভাগ অংশে কৃষিকাজ করা হয়। কৃষি অধিবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। মালভূমি অংশে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য 'মোহেইর' (Mohair) নামক ছাগলের পশম ও চামড়া। অনুকূল পরিবেশে গম ও অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হয়। উপকূল অঞ্চলে তামাক, জলপাই, রেশম, ডুমুর, আঙুর, মনাক্কা, বাদাম, অন্যান্য শুষ্ক ফল এবং তুলা উৎপন্ন হয়।

সিরিয়া কৃষিপ্রধান দেশ। পানিসেচের সাহায্যে ইউফ্রেতিস উপত্যকায় কৃষিকাজ করা হয়। উপকূলে তামাক এবং উত্তর সিরিয়ায় তুলা জন্মায়। তৃণভূমি অঞ্চলে উট, ঘোড়া, মেষ. ছাগল ও দুম্বা পালিত হয়। মরূদ্যানে প্রচুর খেজুর জন্মায়।

লেবাননের পার্বত্য উপত্যকা প্রগাঢ় কৃষি এলাকায় পরিণত হয়েছে। এখানে গম, যব, তামাক, আঙুর, জলপাই ও কমলালেবু উৎপন্ন হয়। পশ্চিমের উপকূলবর্তী সমভূমি ও বেকা উপত্যকায় কৃষিকাজ করা হয়। উপকূলে প্রচুর তামাক জন্মায়।

জর্ডানে কৃষি ব্যবস্থা প্রসার লাভ করেনি। গম, যব, ভুট্টা, শালগম, ওট, আঙুর ও জলপাই কিছু পরিমাণে জন্মে। ইসরাইলের উপকূলবর্তী সমভূমি অঞ্চলে চাষাবাদ প্রসার লাভ করেছে। উর্বর কৃষিভূমিতে গম, যব, জোয়ার, আলু, জলপাই, কমলালেবু, ডুমুর ও আঙুর উৎপন্ন হয়। প্যালেস্টাইনে পানির স্বল্পতা কৃষি ব্যবস্থায় অন্তরায়ের সৃষ্টি করেছে। দক্ষিণের সমভূমিতে শীতকালে গম ও যব এবং গ্রীষ্মকালে ভুট্টা ও শালগম জন্মায়। উত্তরাংশে প্রগাঢ় ফল চাষ প্রসার লাভ করেছে। এ দেশে প্রচুর ফল উৎপন্ন হয়।

সৌদি আরবের উঁচুভূমি ও মরূদ্যানে কৃষিকাজ করা হয়। খেজুর, গম, যব, ভুট্টা ও জোয়ার এ দেশের প্রধান ফসল। অনুকূল পরিবেশে কফি চাষ করা হয়।

প্রাকৃতিক উদ্ভিদ: আরব মরুভূমি থেকে আফগানিস্তানের প্রান্তভাগ পর্যন্ত উষ্ণ ও শীতল মরুভূমি অঞ্চলে কাঁটা জাতীয় গুল্ম ও তৃণ ছাড়া আর কোনো প্রাকৃতিক উদ্ভিদ জন্মায় না। ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত ছোট গাছ জন্মায়। কিন্তু গ্রীষ্মকাল বৃষ্টিহীন হওয়ায় এখানে কোনো তৃণভূমি নেই। ইরান ও তুরস্কের উত্তরাংশে নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র সরলবর্গীয় উদ্ভিদ জন্মায়। ইরানের শুষ্ক মালভূমিতে কাঁটাঝোপ প্রধান উদ্ভিদ। এই কাঁটাঝোপ থেকে গঁদ আহরণ করা হয়। এলবুর্জ পর্বত ও উপকূলীয় সমভূমিতে পাতাঝরা গাছ জন্মায়। এলবুর্জ পর্বতের ঢালের বনভূমি থেকে মূল্যবান গুঁড়ি কাঠ সংগ্রহ করা হয়। তুরস্কের উত্তরে, উত্তর-পশ্চিমে ও দক্ষিণে বনভূমি রয়েছে। পন্টিক পর্বতের পূর্বাংশের গভীর বনভূমি থেকে উৎকৃষ্ট ওক, বীচ, ফার, এলম, লাইম ও পাইন গাছ পাওয়া যায়। দক্ষিণের সমভূমি থেকে নরম ও শক্ত কাঠ সংগ্রহ করা হয়।

খনিজ সম্পদ: মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মূল্যবান খনিজ দ্রব্য সঞ্চিত রয়েছে। আফগানিস্তানে আকরিক লোহা, তামা, সীসা, রুপা, গন্ধক ও লবণ প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত থাকলেও উত্তোলন করা হয়নি। কুর্দিস্তানে আকরিক লোহা, হিন্দুকুশে তামা এবং হাজারায় সীসা সঞ্চিত রয়েছে। ইরান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ কিন্তু একমাত্র খনিজ তেল ছাড়া অন্যান্য খনিজ আহরণে উন্নতি হয়নি। এ দেশের অধিকাংশ তেলক্ষেত্র দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। মসজিদ-ই-সুলাইমান, হাফতখেল, গাচসারা, আগাজারি, নাফত এ সাফিদ ও লালি প্রসিদ্ধ তেলক্ষেত্র। ইরানের আবাদানে পৃথিবীর বৃহত্তর তেল শোধনাগার রয়েছে।

বিভিন্ন তেলক্ষেত্র থেকে পাইপযোগে আবাদানে তেল পাঠানো হয়। উত্তর-পশ্চিম ইরানে কয়লা ও আকরিক লোহা উত্তোলন করা হয়। এ দেশে সীসা, ম্যাংগানিজ, তামা, নিকেল, বোরাক্স, ক্রোমাইট, দস্তা, গন্ধক, লবণ, শিলা ও মর্মর পাথর পাওয়া যায়। পেট্রোলিয়াম ইরাকের প্রধান খনিজ সম্পদ। কিরকুক, খানাকিল, হাদিতা, হাববার্নিয়া, বসরা ও খুররম শাহ ও মোসুল তেলক্ষেত্র বিখ্যাত। কিরকুক থেকে ১,৮৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ পাইপযোগে ভূমধ্যসাগর উপকূলে ইসরাইলের হাইফা বন্দরে এবং লেবাননের ত্রিপলী বন্দরে পেট্রোলিয়াম নিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা হয়। দক্ষিণ ইরাকের নাফত খারেচ উল্লেখযোগ্য তেলক্ষেত্র। কিফরি লিগনাইট কয়লা উৎপাদন করে। এ দেশে স্বল্প পরিমাণ খনিজ লবণ ও

জিপসাম উত্তোলন করা হয়। তুরস্ক খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ। কয়লা, আকরিক লোহা, তামা, পেট্রোলিয়াম, ক্রোম, ম্যাংগানিজ, সীসা, দস্তা, অ্যান্টিমনি, রুপা, পারদ ও গন্ধক এ দেশের প্রধান খনিজ দ্রব্য। লেবাননে স্বল্প পরিমাণে লিগনাইট, এসফাল্ট ও বিটুমিন পাওয়া যায়। জর্ডানে পটাশ, লবণ ও ফসফেট খনি রয়েছে। ইসরাইলে স্বল্প পরিমাণে ম্যাংগানিজ, সোনা, তামা, ক্রোমিয়াম, সীসা ও ম্যাগনেসিয়াম উৎপন্ন হয়। এ ছাড়া গন্ধক, চুনাপাথর, জিপসাম পাওয়া যায়।
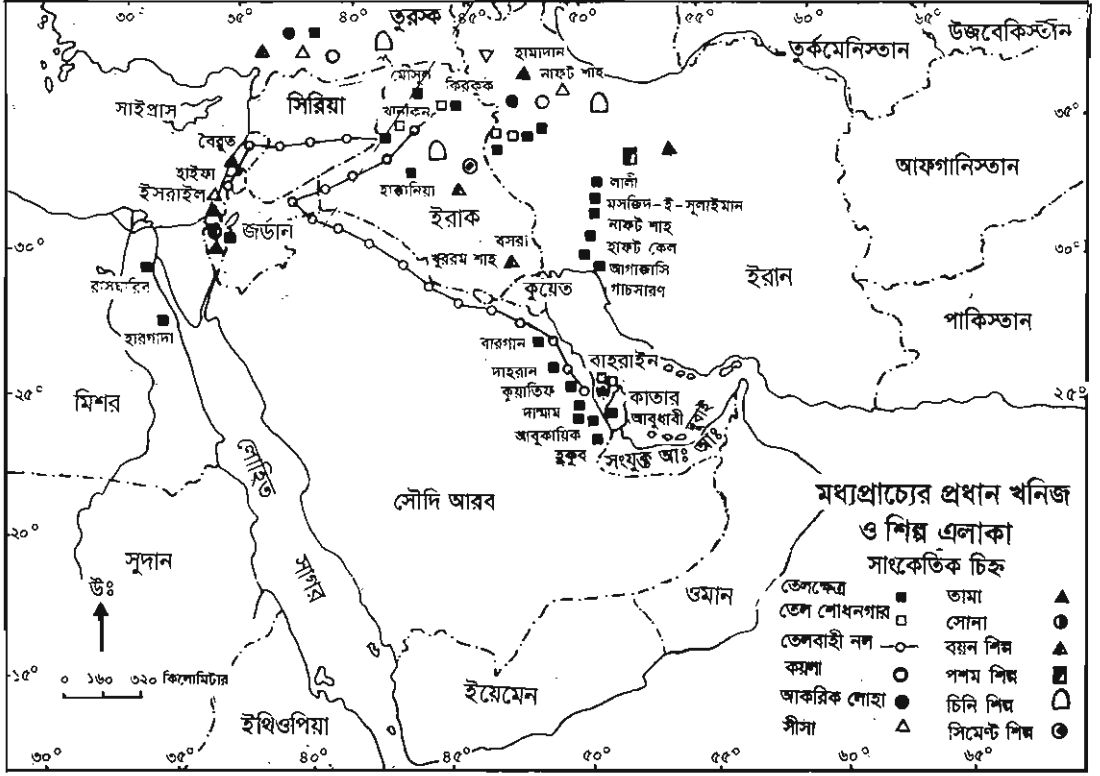
চিত্র ৭৬ : মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ ও শিল্প এলাকা

এ দেশে পটাশ, ব্রোমাইন ও পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়। সৌদি আরবের প্রধান খনিজ পেট্রোলিয়াম। শাওয়ার, আব কোয়াইক, দামমান, হুফুফ, সাফানিয়া, দাহরান, কাতিফ, খুরমানিয়া প্রধান তেলক্ষেত্র।

শিল্প: অধুনা মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শিল্প ক্রমশ বিকাশ লাভ করছে। ইরান আধুনিক যন্ত্র শিল্পে উন্নতি লাভ করেছে। এ দেশের বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে সিমেন্ট, চিনি, কার্পাস, রেশম ও পশম বয়ন ও তার্পিন প্রসিদ্ধ। এ দেশে সিগারেট, সাবান, কাচ, ফল ও চামড়া সংরক্ষণ শিল্প গড়ে উঠেছে। তাব্রিজ, ইস্পাহান, তেহরান, শাহবাদ, কেরমান, সমুসেদ প্রভৃতি প্রধান শিল্প শহর।

ইরাক যান্ত্রিক শিল্পে বিশেষ উন্নতি লাভ করেনি। এ দেশের শিল্পের মধ্যে বয়ন, সিমেন্ট, সাবান, সিগারেট ও উদ্ভিজ্জ তেল শিল্প উল্লেখযোগ্য। বয়নশিল্পের মধ্যে কম্বল, কার্পেট, পশম, কার্পাস, রেশমবস্ত্র প্রসিদ্ধ। বর্তমানে রাসায়নিক শিল্প, চিনি শিল্প ও তেল শোধনাগার শিল্প স্থাপিত হয়েছে। এ দেশের শতকরা প্রায় ৯০ ভাগ শিল্প বাগদাদে এবং অন্যান্য শিল্প মোসুল, কিরকুক ও বসরা অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তুরস্কের চিনি, কার্পাস বয়ন, পশম বয়ন, কাচ, ডুমুর সংরক্ষণ, দুগ্ধজাত দ্রব্য ও গোলাপ নির্যাস শিল্প বিকাশ লাভ করেছে। লেবাননে কার্পাস, রেশম, রেয়ন শিল্প গড়ে উঠেছে। বৈরুত ও ত্রিপলীতে ধাতুর কাজ কুটির শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। খাদ্যশস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ আর একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। জর্ডানে লবণ শোধন, তেল শোধন, ট্যানারি শিল্প প্রসার লাভ করেছে। এ ছাড়া এ দেশে খাদ্য ও ফল প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কার্পাস বয়নশিল্প রয়েছে।

ইসরাইলের হাইফা ও জেরুজালেমে কার্পাস ও পশম বয়নশিল্প রয়েছে। এখানে অনেক ক্ষুদ্র কারখানা ও কুটির শিল্প রয়েছে। মাজদাল এলাকায় ক্ষুদ্র বয়নশিল্প বিকাশ লাভ করেছে। নেজারথের লেস শিল্প প্রসিদ্ধ। নাথানিয়া ও জেরুজালেমে হীরা শিল্প এবং জেরুজালেমে কৃত্রিম দাঁত তৈরি শিল্প প্রসার লাভ করেছে। আমদানিকৃত দ্রব্যের সাহায্যে মোটরগাড়ি, ট্রাকটর, গৃহস্থালি দ্রব্য সংযোজন শিল্প গড়ে উঠেছে। এ দেশের হালকা শিল্পগুলো হল কাচ, কাগজ, সার, রাসায়নিক দ্রব্য, রবার ও প্লাস্টিক। প্যালেস্টাইন ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। জুডিয়ার বহু স্থানে কুটির শিল্প রয়েছে। গাজা ক্ষুদ্র বয়নশিল্পে প্রসিদ্ধ।

পরিবহণ ও যোগাযোগঃ মধ্যপ্রাচ্যে প্রাচীনকাল থেকেই উট, ঘোড়া, গাধা প্রভৃতি ভারবাহী পশুর ব্যবহার ছিল। সৌদি আরব, সিরিয়া, ইরাক, ইরান প্রভৃতি দেশের রাজধানী ও বন্দরের মধ্যে বণিকদের কাফেলা চলাচল করত।

বর্তমানে এসব দেশে প্রশস্ত পাকা সড়কপথে বাস, ট্রাক প্রভৃতির মাধ্যমে যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নতি লাভ করেছে। আফগানিস্তানে সড়কপথই প্রধান পরিবহণ মাধ্যম। এ দেশে প্রায় ৬,৭০০ কিলোমিটার সড়কপথ রয়েছে। পার্শ্ববর্তী দেশে বিমানপথে যাতায়াত করা হয়।

ইরানে প্রায় ২,৬০০ কিলোমিটার রেলপথ রয়েছে। পরিবহণের জন্য এ দেশের সড়কপথের গুরুত্ব বেশি। আনুমানিক ২৪,২০০ কিলোমিটার মোটর চলাচলের উপযোগী সড়কপথ এ দেশে রয়েছে। অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে মোটরপথ ও শকটপথের অবদান বেশি। তেহরান, তাব্রিজ, মেশদ এবং ইস্পাহান ইরানের প্রধান বিমানবন্দর। বিমানপথে বিদেশে যাতায়াত করা যায়।

ইরাকের তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীদ্বয় দেশের পরিবহণ ব্যবস্থায় প্রাণস্বরূপ। তাইগ্রিস সারা বছর নৌচলাচল যোগ্য। এর মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছে। রেলপথগুলো বসরা থেকে দেশের উত্তরে গেছে। এগুলো আংশিক মিটারগেজ। বাগদাদ থেকে মোসুল পর্যন্ত রেলপথটি স্ট্যান্ডার্ডগেজ।

তুরস্ক প্রধানত রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল। এ দেশে প্রায় ৭৪,০০০ কিলোমিটার সড়কপথ রয়েছে। বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্রগুলো রেল ও সড়কপথ দ্বারা যুক্ত। দেশের বিমানগুলো ইস্তাম্বুল, আঙ্কারা ও অন্যান্য শহরের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে। সিরিয়ায় সড়কপথ, রেলপথ ও বিমানপথ প্রসার লাভ করেছে। মরুপথে উটের কাফেলার সাহায্যে পণ্য পরিবাহিত হয়।

লেবাননে সড়কপথ, রেলপথ ও বিমানপথ রয়েছে। সমভূমি ও পর্বত উভয় অংশে সড়ক ও রেলপথ প্রসারিত। সমভূমি অঞ্চলে স্ট্যান্ডার্ডগেজ এবং পার্বত্য অঞ্চলে মিটারগেজ রেলপথ রয়েছে। বৈরুত প্রধান বিমানবন্দর।

জর্ডানে সড়কপথ, রেলপথ ও বিমানপথ রয়েছে। মালভূমির প্রধান পরিবহণ মাধ্যম উট। সড়কপথ প্রধানত বসতি এলাকার মধ্য দিয়ে গেছে। দেশের পশ্চিমাংশে দীর্ঘ রেলপথ ও এর কয়েকটি শাখা পথ রয়েছে। আম্মান প্রধান বিমানবন্দর।

ইসরাইলের সমভূমিতে সড়কপথগুলো সোজা ও প্রশস্ত। প্রায় ৩,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কপথ এই দেশে রয়েছে। ইসরাইলের রেলপথগুলো স্ট্যান্ডার্ডগেজ।

প্যালেস্টাইনঃ ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী আইজাক রাবীন এবং ফিলিস্তিন মুক্তি সংস্থার প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাতের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে ইসরাইলের দখলকৃত এলাকা সামারা, জেরিকো নামক দুইটি ছোট শহর এবং গাজা নিয়ে স্ব-শাসিত এলাকা প্যালেস্টাইন গঠিত হয়। সে সময় এর আয়তন ছিল ২,৪১০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ১৭.৩১ লক্ষ মাত্র। বর্তমানে প্যালেস্টাইনের আয়তন ৬,২২০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ০.৪১ কোটি। প্যালেস্টাইনকে প্রধানত সড়কপথ ও উটপথের ওপর নির্ভর করতে হয়।
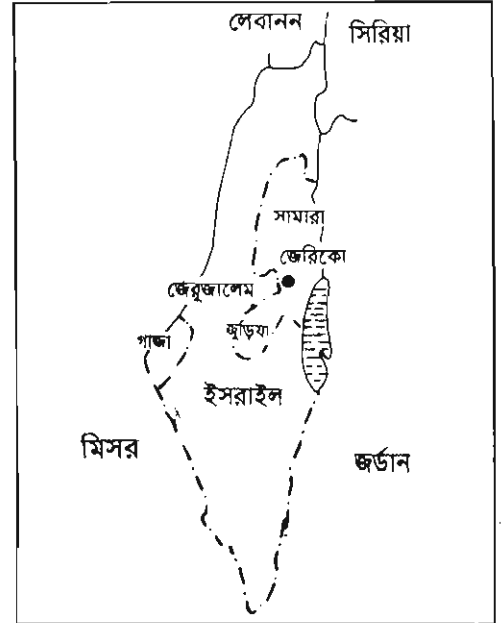
চিত্র ৭৭ : প্যালেস্টাইন

সৌদি আরবের প্রধান শহরগুলো উন্নত সড়কপথ দ্বারা যুক্ত। জেদ্দা থেকে মক্কা ও মদিনা মোটর যোগে যাতায়াত করা যায়। ইরাকের বাগদাদের নিকটবর্তী নাজাফ থেকে মদিনা পর্যন্ত মোটরপথ এবং পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দাহরান থেকে রাজধানী রিয়াদ পর্যন্ত রেলপথ রয়েছে।

মিসরের অধিকাংশ জনবসতি নীল নদের উপত্যকায় সীমাবন্ধ থাকায় এ নদ দেশের প্রধান পরিবহণ মাধ্যমে পরিণত হয়েছে। মিসরের সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আলেকজান্দ্রিয়া থেকে প্রধান রেলপথ কায়রো হয়ে আসোয়ান পর্যন্ত গেছে। সুয়েজ খালের পাশ দিয়ে অন্য একটি রেলপথ দক্ষিণের সুয়েজ বন্দরের সঙ্গে উত্তরের বন্দর সৈয়দ-এর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। কায়রো-সুয়েজ রেলপথটিও গুরুত্বপূর্ণ। মিসরে কাঁচা ও পাকা সড়কপথ এবং মরু এলাকায় উটপথ রয়েছে।

বৈদেশিক বাণিজ্য: মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে পেট্রোলিয়ামসহ অন্যান্য দ্রব্য যেমন, চামড়া, তুলা, কার্পেট, খেজুর, ফল, গঁদ, পশম, মর্মর পাথর, গালিচা প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। সুতিবস্ত্র, চা, চিনি, কাপড়, কলকব্জা, রেল ও মোটরগাড়ি, ভোগ্যপণ্য, মশলা, ওষুধ, কাগজ প্রভৃতি আমদানি করা হয়। যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, ফ্রান্স, ইতালি, জাপান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক রয়েছে।

জনশক্তি: কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবন্ধতা ও শ্রম শক্তির স্বল্পতা থাকায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে শ্রম শক্তি আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশ থেকে অনেক প্রকৌশলী, ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পারদর্শী কারখানা শ্রমিক, ড্রাইভার ও অদক্ষ শ্রমিক মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে গিয়ে তুলনামূলকভাবে উচ্চ পারিশ্রমিকে কাজ করছেন। প্রতি মাসে তাদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রায় দেশ উপকৃত হচ্ছে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে এবং জীবনযাত্রার মানও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মধ্যপ্রাচ্য

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

অবস্থান, আয়তন ও জনসংখ্যা: মধ্যপ্রাচ্যের উত্তরে কাস্পিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগর; পশ্চিমে এজিয়ান সাগর, ভূমধ্যসাগর, লিবিয়া ও লোহিত সাগর; দক্ষিণে সুদান, আরব সাগর ও পারস্য উপসাগর এবং পূর্বে পাকিস্তান অবস্থিত।

মধ্যপ্রাচ্যের মোট আয়তন ৭৮,৪২,৩৬৪ বর্গ কিলোমিটার এবং এই অঞ্চলে বসতির ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে মাত্র ৪৯ জন। এই অঞ্চলে ইসলাম, ইহুদি, খ্রিষ্টান, দ্রুজ ধর্মাবলম্বী লোক বসবাস করে। এদের মধ্যে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৯৬ জন।

ভূপ্রকৃতি: ভূপ্রাকৃতিক গঠন অনুসারে মধ্যপ্রাচ্যকে (১) পার্বত্য অঞ্চল, (২) মালভূমি ও উচ্চভূমি অঞ্চল এবং (৩) সমভূমি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়। আর্মেনীয় গ্রন্থি থেকে পূর্ব দিকে এলবুর্জ ও জাগ্রোস এবং পশ্চিম দিকে পন্টিক ও টোরাস পর্বত প্রসারিত হয়েছে। আনাতোলিয়া এবং আরব প্রধান মালভূমি অঞ্চল। মেসোপটেমিয়া এবং নীল অববাহিকা মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান সমভূমি অঞ্চল।

জলবায়ু: চরমভাবাপন্ন জলবায়ু মধ্যপ্রাচ্যের বৈশিষ্ট্য। এখানে শীত ও গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য প্রচুর এবং একমাত্র সংকীর্ণ পশ্চিম উপকূল ছাড়া অন্য সব জায়গায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ খুব কম। মধ্যপ্রাচ্যকে (১) উষ্ণ মরু, (২) শীতল মরু এবং (৩) ভূমধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়।

কৃষি: সমভূমির পরিমাণ কম থাকায় একমাত্র নদী উপত্যকা ও বদ্বীপ অঞ্চলে কৃষিকাজ প্রসার লাভ করেছে। গম প্রধান কৃষিজাত ফসল। এ ছাড়া এই অঞ্চলে যব, ভুট্টা, জোয়ার, ধান, বীট, তুলা, তামাক, খেজুর, রেশম এবং বিভিন্ন প্রকার ফল উৎপন্ন হয়।

প্রাকৃতিক উদ্ভিদ: উষ্ণ ও শীতল মরু অঞ্চলে কাঁটা জাতীয় গুল্ম ও তৃণ ছাড়া অন্য কোনো উদ্ভিদ জন্মায় না। ইরান ও তুরস্কের উত্তরাংশে নাতিশীতোষ্ণ মিশ্র সরলবর্গীয় উদ্ভিদ জন্মায়।

খনিজ সম্পদ: পেট্রোলিয়াম মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান খনিজ সম্পদ। এ ছাড়া স্থানভেদে আকরিক লোহা, তামা, সীসা, রুপা, সোনা, গন্ধক, লবণ, ম্যাংগানিজ, নিকেল, বোরাক্স, ক্রোমাইট, দস্তা, মর্মর পাথর, কয়লা, অ্যান্টিমনি, পারদ, এসফাল্ট, পটাশ, ফসফেট, চুনাপাথর, জিপসাম প্রভৃতি স্বল্প পরিমাণে উত্তোলন করা হয়।

শিল্প: বিভিন্ন দেশে কার্পাস বয়ন, পশম বয়ন, সিমেন্ট, দিয়াশলাই, সাবান, চিনি, রেশম, কার্পেট, সিগারেট, কাচ এবং চামড়া সংরক্ষণ শিল্প গড়ে উঠেছে। স্থানীয় চাহিদা পূরণে অধিকাংশ শিল্পজাত দ্রব্য ব্যবহার করা হয়।

পরিবহণ ও যোগাযোগ: সড়কপথ মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান পরিবহণ মাধ্যম। প্রত্যেকটি দেশের সড়কপথ উন্নত ও সারা বছর মোটর চলাচলের উপযোগী। রেলপথ সব দেশে বিকাশ লাভ করেনি। মিসর ও ইরাকের সীমিত এলাকায় নদীপথের মাধ্যমে পণ্য ও যাত্রী বাহিত হয়। প্রত্যেকটি দেশের রাজধানীর সঙ্গে অন্য দেশের বিমানপথে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়।

বৈদেশিক বাণিজ্য: পেট্রোলিয়াম মধ্যপ্রাচ্যের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। এ ছাড়া চামড়া, তুলা, কার্পেট, খেজুর, ফল, গঁদ, পশম, মর্মর পাথর, গালিচা প্রভৃতি রপ্তানি করা হয়। সুতিবস্ত্র, চা, চিনি, কাপড়, কলকব্জা, রেল ও মোটরগাড়ি, ভোগ্যপণ্য, পশম, ওষুধ, কাগজ প্রভৃতি আমদানি দ্রব্যের মধ্যে অন্যতম।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। মধ্যপ্রাচ্যে অমুসলিম শাসিত দেশ কোনটি?

ক. লেবানন

খ. তুরস্ক

গ. প্যালেস্টাইন

ঘ. ইসরাইল

২। মধ্যপ্রাচ্যের খনিজ সম্পদ সম্পর্কে নিম্নের কোন উক্তিটি সঠিক?

i. মধ্যপ্রাচ্য খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ

ii. মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ খনিজ সম্পদই কাঁচামাল হিসেবে রপ্তানি করা হয়ে থাকে

iii. বাংলাদেশ থেকে খনিজ তেল হাইফার মধ্য দিয়ে ইসরাইলে রপ্তানি করা হয়ে থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i

খ. ii

গ. iii

ঘ. i, ii এবং iii

নিম্নের সারণিটি ব্যবহার কর এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

দেশসমূহ	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	জনসংখ্যা (কোটি)
সৌদি আরব	২১,৪৯,৬৯০	২.৮২
ইয়েমেন	৫,২৭,৯৭০	২.৩০
ওমান	২,১২,৪৬০	০.২৬
কুয়েত	১৭,৮২০	০.২৬

উৎস : বিশ্ব জনসংখ্যা ডাটা শিট, ২০০৮

৩। **উপরের সারণিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশি কোন দেশে?**

ক. সৌদি আরব

খ. ইয়েমেন

গ. ওমান

ঘ. কুয়েত

৪। **সৌদি আরবে দক্ষ শ্রমিকের ব্যাপক চাহিদার ক্ষেত্রে নিম্নের কোন বক্তব্যটি অধিক যুক্তিযুক্ত?**

ক. উচ্চ পারিশ্রমিক, শ্রম শক্তির স্বল্পতা ও অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা

খ. শ্রমশক্তি, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের স্বল্পতা

গ. জনসংখ্যার স্বল্পতা, অনুন্নত কৃষি ও কারিগরি জ্ঞানের অভাব

ঘ. অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, কারিগরি ও প্রযুক্তিগত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। মধ্যপ্রাচ্যের বিশাল এলাকা জুড়ে রয়েছে সমভূমি এবং পর্বতমালা। এর মরু ও পার্বত্য অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। তথাপি মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে কিছু সমতল ভূমি এবং মালভূমি রয়েছে, যেখানে কৃষিকাজ করা হয়। আবদুল্লাহ তুরস্কের মালভূমি অঞ্চলের একজন কৃষক। তুরস্কসহ মধ্যপ্রাচ্যের আরো অনেক দেশে অন্যান্য পেশার পাশাপাশি কৃষি শ্রমিকের অভাব রয়েছে। এ অভাব পূরণে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ বহির্বিশ্ব থেকে জনশক্তি আমদানি করে থাকে।

ক. মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ স্থানে কী ধরনের কৃষি পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়?

খ. মধ্যপ্রাচ্যের জলবায়ু কেন চরমভাবাপন্ন?

গ. তুরস্কের জলবায়ু এবং মালভূমির বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আবদুল্লাহ কী ধরনের কৃষক তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ তাদের জনশক্তির অভাব পূরণে বহির্বিশ্ব থেকে জনশক্তি আমদানির পদক্ষেপটিকে তুমি কতটা সঠিক মনে কর? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাংলাদেশের পরিচয়

অবস্থান: এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। এ দেশ ২০°৩৪′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। বাংলাদেশের মাঝামাঝি স্থান দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে।

আয়তন: বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ১৯৯৬-৯৭ সালের তথ্য অনুসারে দেখা যায়, বাংলাদেশের নদী অঞ্চলের আয়তন ৯,৪০৫ বর্গ কিলোমিটার। বনাঞ্চলের আয়তন ২১,৬৫৭ বর্গ কিলোমিটার। নদী ও বনাঞ্চল বাদে বাংলাদেশের আয়তন ১,১৬,৫০৮ বর্গ কিলোমিটার। বাংলাদেশের দক্ষিণ অংশে উপকূল অঞ্চলে বিশাল এলাকা ক্রমান্বয়ে জেগে উঠছে। ভবিষ্যতে দক্ষিণ অংশের প্রসার ঘটলে বাংলাদেশের আয়তন আরো বৃদ্ধি পাবে।

সীমা: বাংলাদেশের একদিকে বঙ্গোপসাগর এবং অপর প্রায় তিনদিকেই পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের বিভিন্ন রাজ্য দ্বারা বেষ্টিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য; পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মায়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ অবস্থিত। বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখা ৪,৭১২ কিলোমিটার। এর মধ্যে ভারত-বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কিলোমিটার। বাংলাদেশ-মায়ানমার সীমারেখার দৈর্ঘ্য ২৮০ কিলোমিটার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কিলোমিটার (চিত্র ৭৮)।

ভূপ্রকৃতি (Physiography)

ভূপ্রকৃতি দেশের কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূপ্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বদ্বীপ। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা ও কুশিয়ারা নদী যথাক্রমে পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে একযোগে এ সুবিশাল দ্বীপের সৃষ্টি করেছে।

স্থায়ী বসবাসের জন্য সমভূমিই আদর্শ। বাংলাদেশের প্রায় সমগ্র অঞ্চল এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। বাংলাদেশে সামান্য পরিমাণে উচ্চভূমি রয়েছে। ভূপ্রকৃতির ভিত্তিতে বাংলাদেশকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

১। টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ

২। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ

৩। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি

নিচে এগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা দেওয়া হল (চিত্র ৭৯)।

১। টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ: বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব, উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। টারশিয়ারী যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ সকল পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো টারশিয়ারী যুগের পাহাড় নামে পরিচিত। পাহাড়গুলো আসামের লুসাই এবং মায়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয়।

এ পাহাড়গুলো বেলেপাথর, শেল ও কর্দম দ্বারা গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (ক) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ ও (খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ।

(ক) দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ: রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার পূর্বাংশ এ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। দক্ষিণ-পূর্বের এ পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা ৬১০ মিটার। ১,২৩০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট শৃঙ্গ কিওক্রাডং এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। সাম্প্রতিককালে বান্দরবানে আরো একটি শৃঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছে। এর নাম তাজিওডং (বিজয়) এবং উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। এটিই বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গা।

(খ) উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহঃ ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা জেলার উত্তরাংশ, সিলেট জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশ এবং মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার দক্ষিণের পাহাড়গুলোর উচ্চতা ২৪৪ মিটারের বেশি নয়। উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটার।
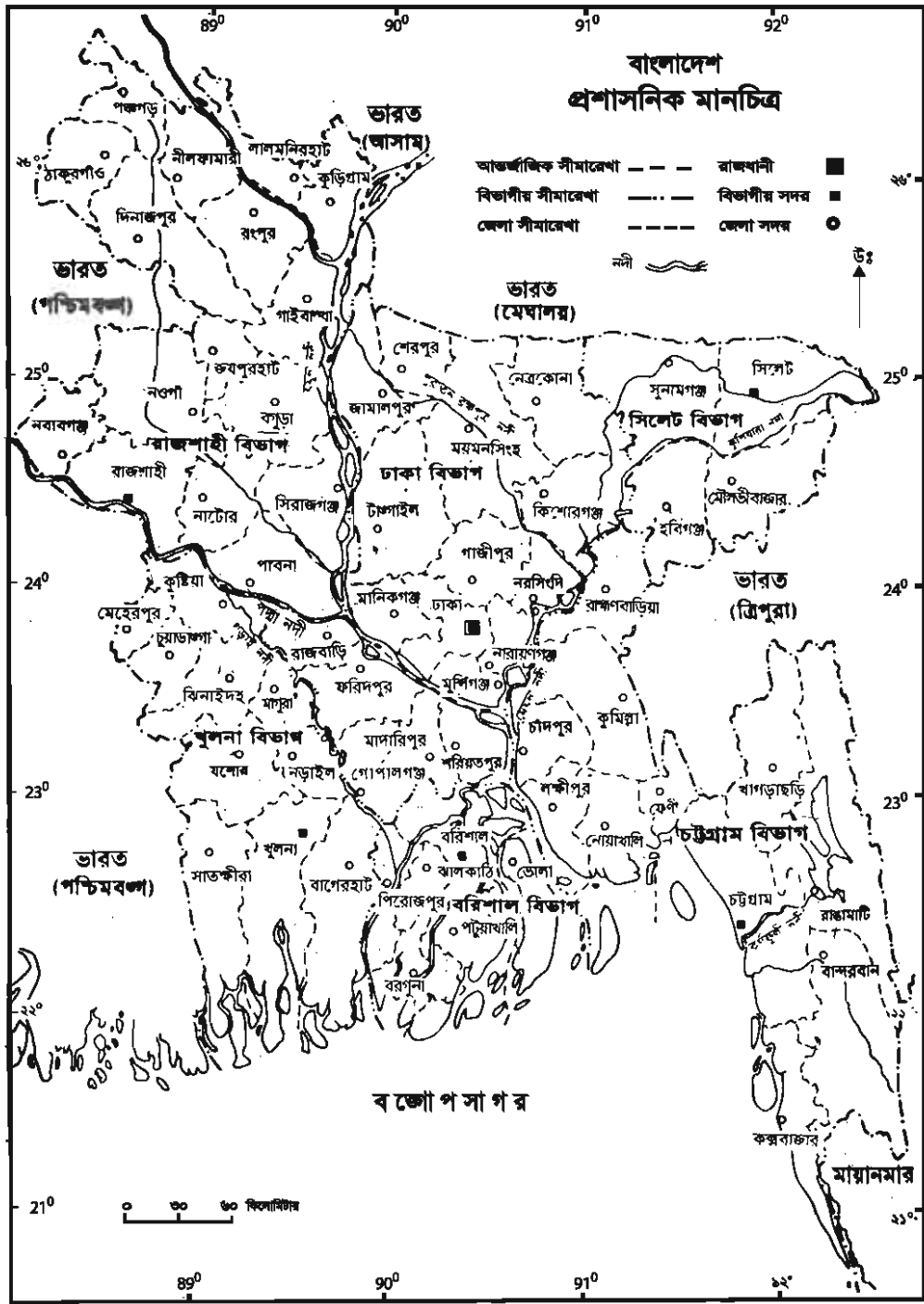
চিত্র ৭৮ : বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র

২। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহঃ আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বের সময়কে প্লাইস্টোসিনকাল বলা হয়। উত্তর-পশ্চিমাংশের বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই পাহাড় বা উচ্চভূমি এ অঞ্চলের অন্তর্গত। প্লাইস্টোসিনকালে এসব সোপান গঠিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। নিচে এসব উচ্চভূমির বর্ণনা দেওয়া হল।

(ক) বরেন্দ্রভূমিঃ দেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় ৯,৩২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বরেন্দ্রভূমি বিস্তৃত। প্লাবন সমভূমি হতে এর উচ্চতা ৬ থেকে ১২ মিটার। এ স্থানের মাটি ধূসর ও লাল বর্ণের।

(খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়ঃ টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় মধুপুর এবং গাজীপুর জেলায় ভাওয়ালের গড়
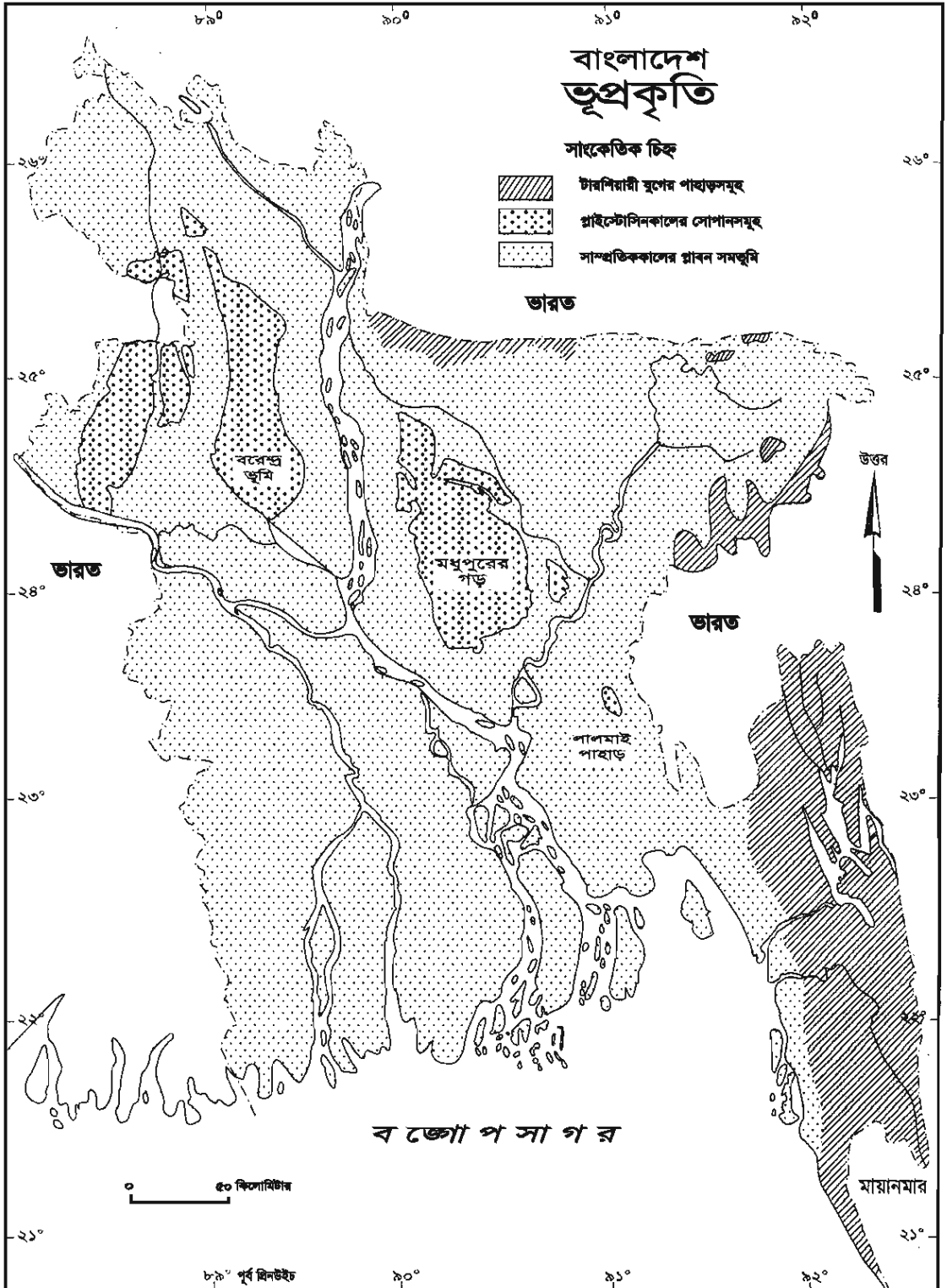
চিত্র ৭৯ : বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি

অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ৪,১০৩ বর্গ কিলোমিটার। সমভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। মাটির রং লালচে ও ধূসর।

(গ) লালমাই পাহাড়: কুমিল্লা শহর থেকে ৮ কিলোমিটার পশ্চিমে লালমাই থেকে ময়নামতি পর্যন্ত এ পাহাড়টি বিস্তৃত। এর আয়তন প্রায় ৩৪ বর্গ কিলোমিটার এবং গড় উচ্চতা ২১ মিটার।

৩। **সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি:** টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ছাড়া সমগ্র বাংলাদেশ নদীবিধৌত এক বিস্তীর্ণ সমভূমি। অসংখ্য ছোটবড় নদী, বাংলাদেশের সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। সমতল ভূমির ওপর দিয়ে এ নদীগুলো প্রবাহিত হওয়ার কারণে বর্ষাকালে বন্যার সৃষ্টি হয়। বছরের পর বছর এভাবে বন্যার সঙ্গে পরিবাহিত পলিমাটি সঞ্চিত হয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত হয়েছে। এ প্লাবন সমভূমির আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গ কিলোমিটার।

এ সমভূমি বাংলাদেশের উত্তর অংশ থেকে উপকূলের দিকে ক্রমনিম্ন। সুন্দরবন অঞ্চল প্রায় সমুদ্র সমতলে অবস্থিত। বাকি অঞ্চলগুলো যেমন, দিনাজপুরের উচ্চতা ৩৭.৫০ মিটার, বগুড়ার উচ্চতা ২০ মিটার, ময়মনসিংহের উচ্চতা ১৮ মিটার এবং নারায়ণগঞ্জ ও যশোরের উচ্চতা ৮ মিটার। এই অঞ্চলে বিক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য জলাভূমি ও নিম্নভূমি ছড়িয়ে আছে। এর কিছু সংখ্যক পরিত্যক্ত অশ্বখুরাকৃতি নদীখাত। স্থানীয়ভাবে এগুলোকে বিল, ঝিল ও হাওর বলে। এদের মধ্যে চলন বিল, মাদারিপুর বিল ও সিলেট অঞ্চলের হাওরসমূহ বর্ষার পানিতে পরিপূর্ণ হয়ে হ্রদের আকার ধারণ করে। সমগ্র সমভূমির মাটির স্তর খুব গভীর এবং ভূমি খুবই উর্বর।

সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন,

(ক) রংপুর ও দিনাজপুরের পাদদেশীয় সমভূমি।

(খ) ঢাকা, টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, পাবনা, জামালপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি ও সিলেটের অন্তর্গত বন্যা প্লাবন সমভূমি।

(গ) ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা ও ঢাকা অঞ্চলের অংশবিশেষ নিয়ে বদ্বীপ সমভূমি।

(ঘ) নোয়াখালি ও ফেনী নদীর নিম্নভাগ থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত বিস্তৃত চট্টগ্রামের উপকূলীয় সমভূমি।

(ঙ) খুলনা ও পটুয়াখালি অঞ্চল এবং বরগুনা জেলার কিয়দংশ নিয়ে স্রোতজ সমভূমি।

বাংলাদেশের এ অঞ্চলগুলোর মাটি খুব উর্বর বলে কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে তা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

নদী (Rivers)

বাংলাদেশে নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০। অধিক সংখ্যক নদী থাকার কারণে বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলা হয়। নদীবহুল বলে স্বাভাবিকভাবেই এ দেশের মানুষের জীবনযাত্রার ওপর নদীর প্রভাব রয়েছে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা ও কর্ণফুলী বাংলাদেশের প্রধান নদী। এ নদীগুলোর উপনদী ও শাখানদী রয়েছে। উপনদী ও শাখানদীসহ বাংলাদেশে নদীর মোট দৈর্ঘ্য হল প্রায় ২২,১৫৫ কিলোমিটার। নিচে বাংলাদেশের নদীগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল (চিত্র ৮০)।

পদ্মা: বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম নদী পদ্মা। গঙ্গা নদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। এরপর প্রথমে দক্ষিণ-পশ্চিম ও পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়ে ভারতের হরিদ্বারের নিকট সমভূমিতে পড়েছে। এরপর ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার রাজ্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান নামক স্থানে ভাগীরথী (হুগলি নদী) নামে এর একটি শাখা বের হয়ে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। গঙ্গা নদীর মূল প্রবাহ রাজশাহী অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে গঙ্গা নদীটি পদ্মা নামে প্রায় ১৪৫ কিলোমিটার পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমানা বরাবর এসে কুষ্টিয়ার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর দৌলতদিয়ার নিকট যমুনা নদীর সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত ধারা পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে

চাঁদপুরের কাছে মেঘনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। এই তিন নদীর মিলিত প্রবাহ মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে পদ্মা বিধৌত অঞ্চলের আয়তন হচ্ছে ৩৪,১৮৮ বর্গ কিলোমিটার।

কুমার, মাথাভাঙ্গা, ভৈরব, গড়াই, মধুমতী, আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি পদ্মা নদীর প্রধান শাখানদী এবং মহানন্দা প্রধান উপনদী। পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, কুলিক ও ট্যাংগন মহানন্দার উপনদী।
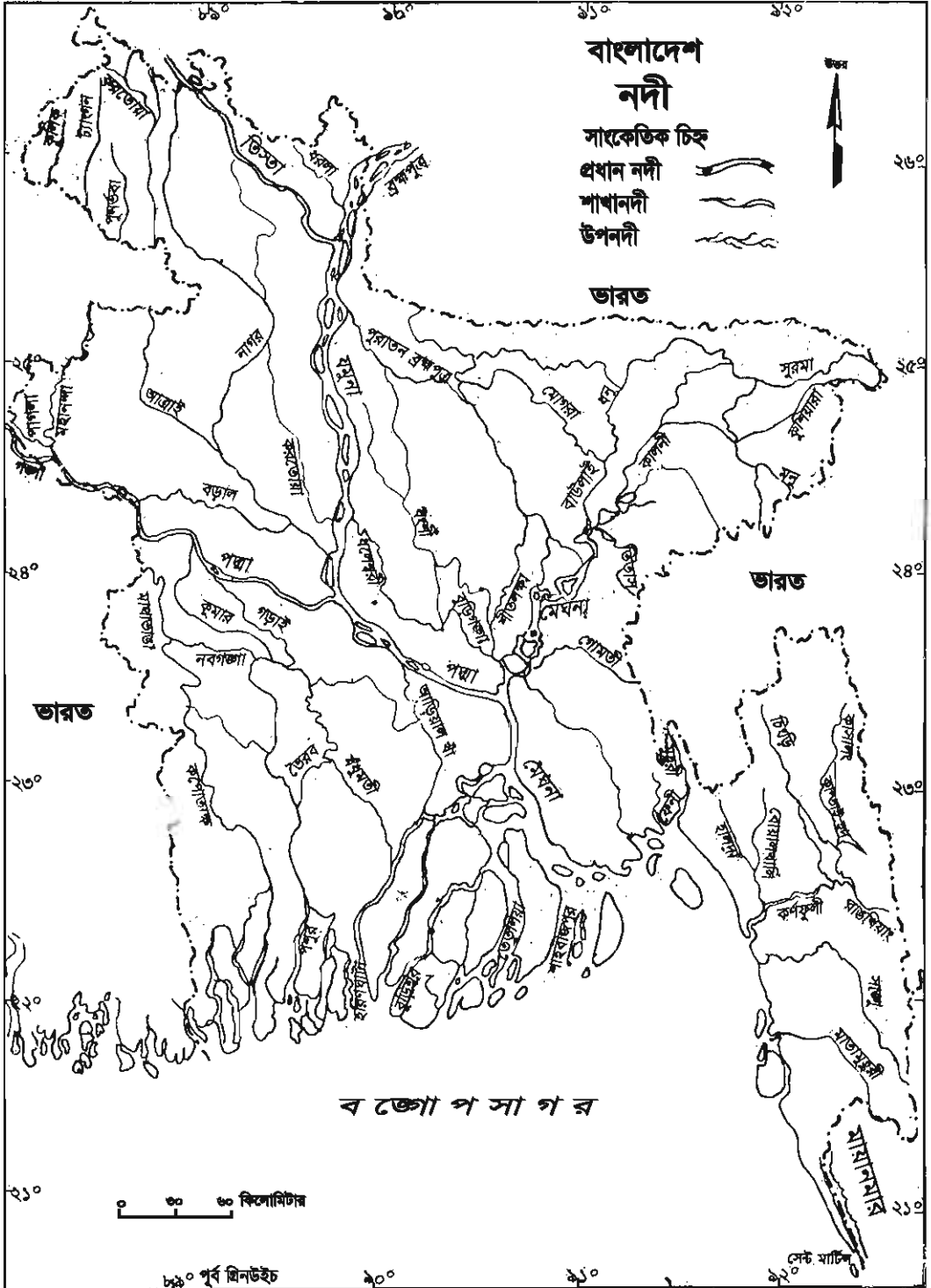
চিত্র ৮০ : বাংলাদেশের নদী

ব্রহ্মপুত্র: এ নদ হিমালয় পর্বতের কৈলাস শৃঙ্গের নিকটে মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রথমে তিব্বতের ওপর দিয়ে পূর্ব দিকে ও পরে আসামের ভেতর দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছে। অতঃপর ব্রহ্মপুত্র কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। অতঃপর দেওয়ানগঞ্জের কাছে দক্ষিণ-পূর্বে বাঁক নিয়ে ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ভৈরববাজারের দক্ষিণে মেঘনায় পতিত হয়েছে। ধরলা ও তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের প্রধান উপনদী এবং বংশী ও শীতলক্ষা প্রধান শাখানদী।

যমুনা: ময়মনসিংহ জেলার দেওয়ানগঞ্জের কাছে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান শাখা যমুনা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে দৌলতদিয়ার কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। করতোয়া ও আত্রাই যমুনার প্রধান উপনদী। ধলেশ্বরী এর শাখানদী এবং ধলেশ্বরীর শাখানদী বুড়িগঙ্গা।

মেঘনা: আসামের বরাক নদী নাগা-মনিপুর অঞ্চল থেকে উৎপন্ন হয়ে সুরমা ও কুশিয়ারা নামে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে বাংলাদেশের সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে। উত্তরের শাখা সুরমা পশ্চিম দিকে সিলেট, ছাতক ও সুনামগঞ্জ শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। আজমিরিগঞ্জের কাছে উত্তর সিলেটের সুরমা, দক্ষিণ সিলেটের কুশিয়ারা নদী এবং হবিগঞ্জের কালনী নদী একসঙ্গে মিলিত হয়েছে। পরে কালনী, সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত প্রবাহ কালনী নামে দক্ষিণে কিছু দূর প্রবাহিত হয়ে মেঘনা নাম ধারণ করেছে। মেঘনা ভৈরববাজারের দক্ষিণে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে এবং চাঁদপুরের কাছে পদ্মার সঙ্গে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। বাংলাদেশে মেঘনা বিধৌত অঞ্চল হচ্ছে ২৯,৭৮৫ বর্গ কিলোমিটার। মনু, বাউলাই, তিতাস, গোমতী মেঘনার উপনদী।

কর্ণফুলী: আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রায় ২৭৪ কিলোমিটার দীর্ঘ কর্ণফুলী নদী রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। এটি চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির প্রধান নদী। কর্ণফুলীর প্রধান উপনদী কাসালং, হালদা এবং বোয়ালখালি। কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীতে বাঁধ দিয়ে 'কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র' স্থাপন করা হয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর চট্টগ্রাম কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত।

সাঙ্গু: এ নদীর উৎপত্তি আরাকান পাহাড়ে। মায়ানমার ও বাংলাদেশ সীমানায় আরাকান পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে বান্দরবান ও চট্টগ্রামের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীর মোহনার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

ফেনী: ফেনী নদী ফেনী জেলায় অবস্থিত। এ নদীর উৎপত্তিস্থল পার্বত্য ত্রিপুরায়। ফেনী জেলার পূর্ব সীমা দিয়ে সন্দ্বীপের উত্তরে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে।

জলবায়ু (Climate)

বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি সমভাবাপন্ন। দেশের মাঝামাঝি দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করায় এখানে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজ করে। কিন্তু মৌসুমি বায়ুর প্রভাব এ দেশের জলবায়ুর ওপর এত বেশি যে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু নামে পরিচিত। মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হল বছরে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব। এ বিভিন্ন ঋতুতে জলবায়ুর কিছুটা তারতম্য হয়। কিন্তু কোনো সময়ই শীতপ্রধান ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মতো চরমভাবাপন্ন হয় না। উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশে বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৬.০১° সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সেন্টিমিটার। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত এ দেশে বৃষ্টিপাত হয় (চিত্র ৮১)। বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয়।

বাংলাদেশের জলবায়ুকে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও বার্ষিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে তিনটি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (ক) গ্রীষ্মকাল, (খ) বর্ষাকাল ও (গ) শীতকাল।

(ক) গ্রীষ্মকাল: বাংলাদেশে মার্চ থেকে মে মাস (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ) পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল। এ সময় সূর্য কর্কটক্রান্তির নিকট লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে এ ঋতুতে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। নিচে এ ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ ও বৃষ্টিপাতের বর্ণনা দেওয়া হল।
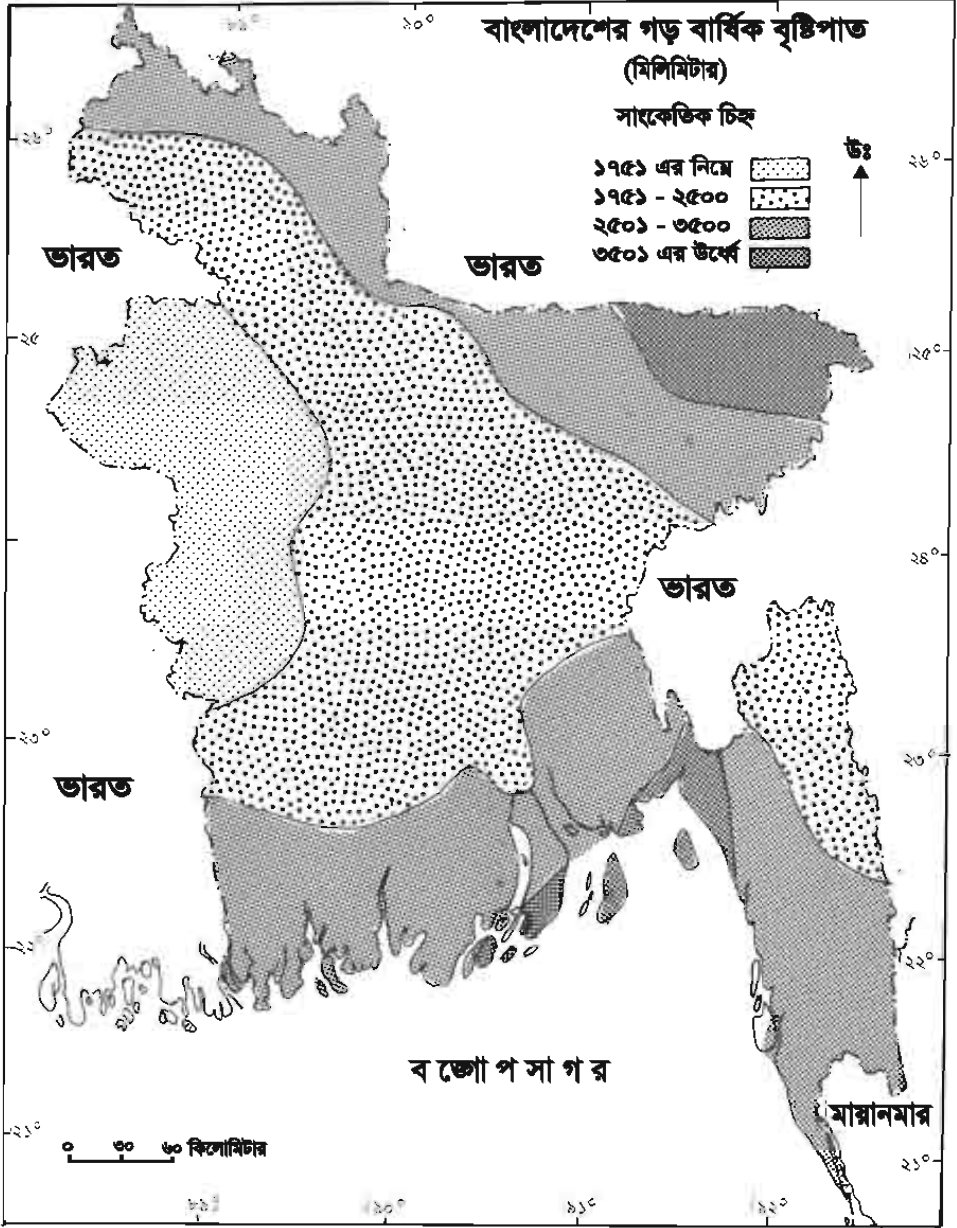
চিত্র ৮১ : বাংলাদেশের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত

তাপমাত্রা: বাংলাদেশের সবচেয়ে উষ্ণ ঋতু হল গ্রীষ্মকাল। এ সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২১° সেলসিয়াস। গড় হিসেবে এপ্রিল মাসে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৮° সেলসিয়াস পরিলক্ষিত হয়। এ সময় সমুদ্র উপকূল অঞ্চল থেকে দেশের অভ্যন্তর ভাগে তাপমাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে (চিত্র ৮২)।

বৃষ্টিপাত: কালবৈশাখী ঝড় গ্রীষ্মকালীন আবহাওয়ার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ঝড় বজ্রবিদ্যুৎসহ প্রবলবেগে মার্চ-এপ্রিল মাসে প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ বৃষ্টিপাত কালবৈশাখী দ্বারা সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের শতকরা প্রায় ২০ ভাগ গ্রীষ্মকালে হয়। এ সময় গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৫১ সেন্টিমিটার।

বায়ুপ্রবাহ: গ্রীষ্মকালে উত্তর গোলার্ধে সূর্যের উত্তরায়ণের জন্য বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। এ সময় বাংলাদেশে দক্ষিণ দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ অধিক উত্তাপের প্রভাবে ওপরে উঠে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে আগত শীতল ও শুষ্ক বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সংঘর্ষে বজ্রসহ ঝড়বৃষ্টি হয়।
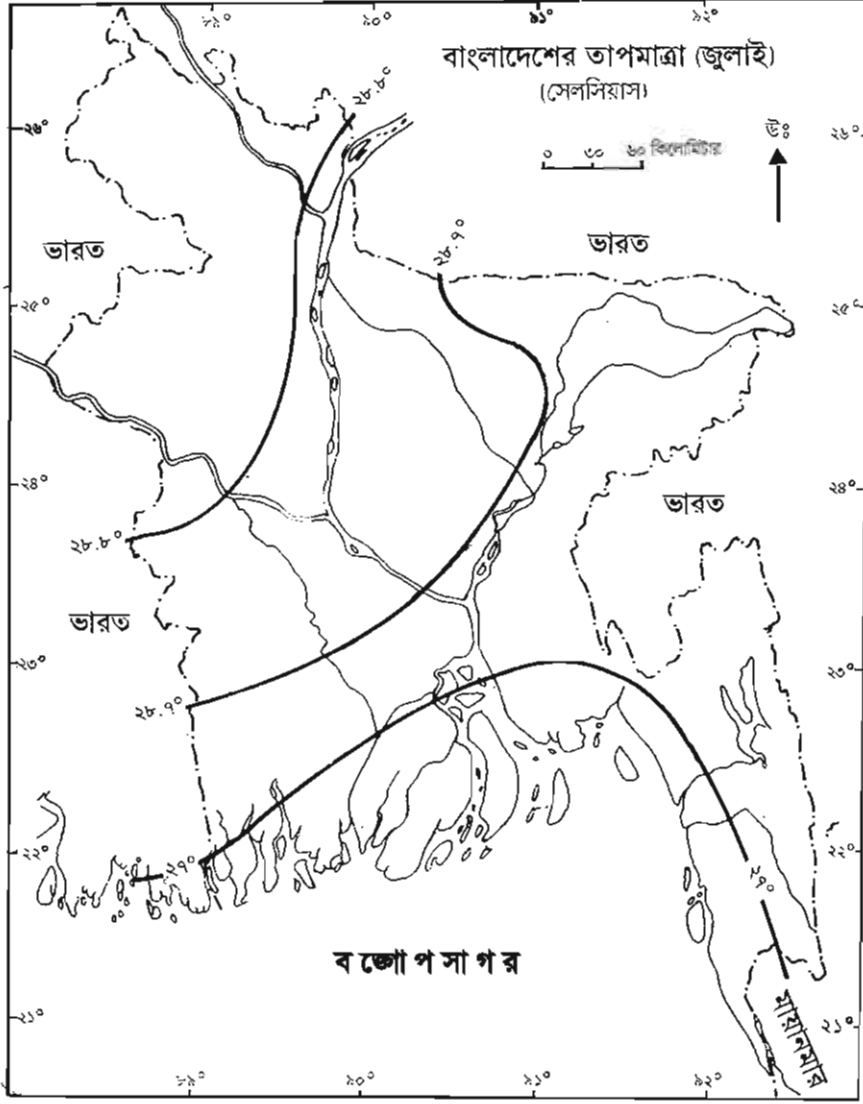
চিত্র ৮২ : বাংলাদেশের তাপমাত্রা (জুলাই)

(খ) বর্ষাকাল: বাংলাদেশে জুন থেকে অক্টোবর মাস (জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক) পর্যন্ত বর্ষাকাল। অর্থাৎ গ্রীষ্ম ও শীতের মাঝামাঝি বৃষ্টিবহুল সময়কে বর্ষাকাল বা বর্ষাঋতু বলা হয়। জুন মাসের প্রথম দিকে মৌসুমি বায়ুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ষাকাল শুরু হয়ে যায়। নিচে বর্ষাঋতুর বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হল।

তাপমাত্রা: বর্ষাকালে সূর্য বাংলাদেশে প্রায় লম্বভাবে কিরণ দেয়। ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, আকাশে মেঘ থাকে এবং প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, ফলে এ সময় অধিক তাপমাত্রা অনুভূত হয় না। গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস। এপ্রিল উষ্ণতম মাস।

বৃষ্টিপাত: বর্ষাকালে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের ওপর দিয়ে আসার সময় প্রচুর জলীয়বাষ্পে সমৃদ্ধ থাকে। এ জলীয়বাষ্প শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বছরের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ ভাগ এ সময়ে হয়।

বায়ুপ্রবাহ: জুন মাসে বাংলাদেশের ওপর সূর্যের অবস্থানের কারণে বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগর থেকে আগত দক্ষিণ-পশ্চিম অয়ন বায়ু প্রবাহিত হতে শুরু করলে বর্ষাকাল আরম্ভ হয়। এ সময় উত্তর-পূর্ব অয়ন বায়ু অন্তর্হিত হয় এবং দক্ষিণ-পূর্ব অয়ন বায়ু নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ফেরেলের সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে বেঁকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুতে পরিণত হয়। বর্ষাশেষে বাংলাদেশে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে।

(গ) শীতকাল: সাধারণত এ দেশে নভেম্বরের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি মাস (কার্তিক-ফাল্গুন) পর্যন্ত সময়কে শীতকাল বলে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসের পর তাপমাত্রা কমতে থাকে। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন থাকে (চিত্র ৮৩)।
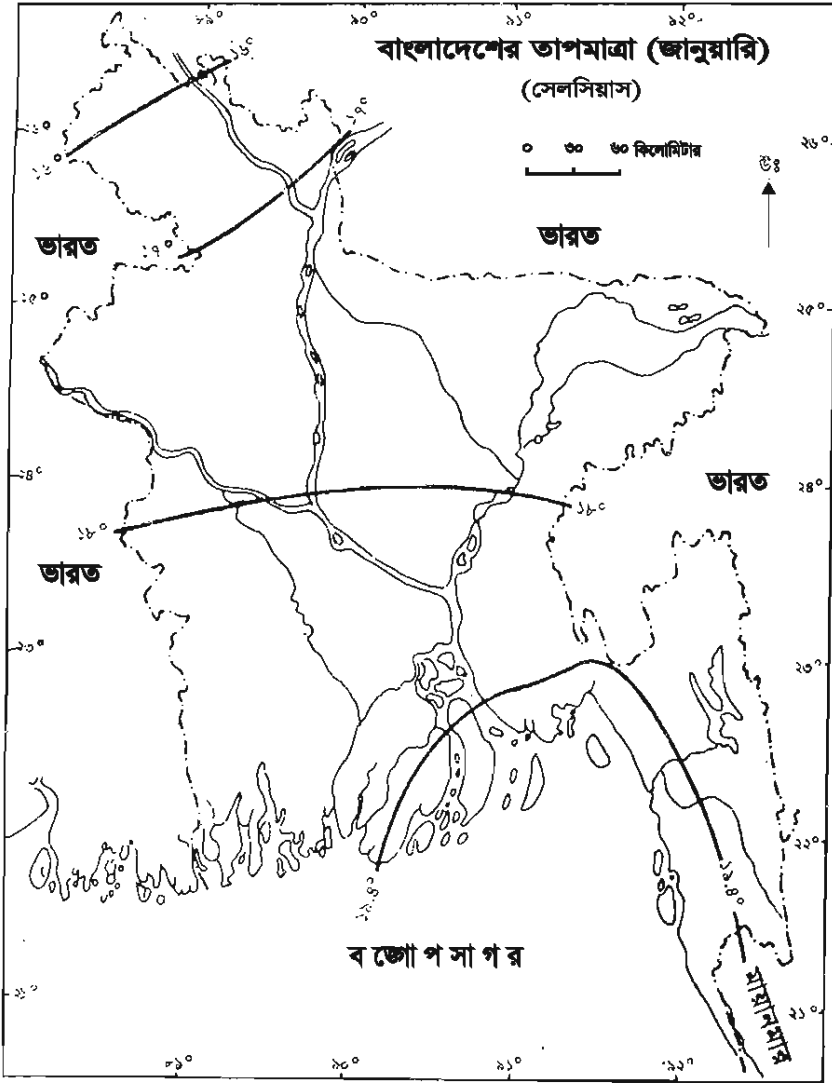
চিত্র ৮৩ : বাংলাদেশের তাপমাত্রা (জানুয়ারি)

তাপমাত্রা: আমাদের দেশে শীতকালে তাপমাত্রা সবচেয়ে কম থাকে। এ সময় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১° সেলসিয়াস। জানুয়ারি শীতলতম মাস এবং এ মাসের গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সেলসিয়াস। শীতকালে দেশের উপকূল ভাগ থেকে উত্তর দিকে তাপমাত্রা কম থাকে। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৯০৫ সালে দেশের উত্তরাঞ্চলে দিনাজপুরে সর্বনিম্ন ১° সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছিল।

বৃষ্টিপাত: শীতকালে বাংলাদেশে প্রায় বৃষ্টিপাত হয় না বললেই চলে। উত্তর-পূর্ব শীতল মৌসুমি বায়ু এ সময় বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। শীতকালে সাধারণত উপকূলীয় ও পাহাড়িয়া এলাকায় সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। বৃষ্টিপাতের পরিমাণ এ সময়ে ১০ সেন্টিমিটারের অধিক নয়।

বায়ুপ্রবাহ: উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত শীতল মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে। এ সময় বাতাসের সর্বনিম্ন আর্দ্রতা শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ। দেশের উত্তরাঞ্চলের ওপর দিয়ে কখনও কখনও তীব্র শীতল বায়ু প্রবাহিত হওয়ার ফলে বেশ শীত অনুভূত হয়।

বনজ সম্পদ (Forest Resources)

বৃক্ষরাজির সমারোহকে অরণ্য বা বনভূমি বলে। বনভূমি থেকে যে সম্পদ উৎপাদিত হয় বা পাওয়া যায় তাকে বনজ সম্পদ বলে। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনজ সম্পদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কোনো দেশের পারিসরিক ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোট জমির ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা আবশ্যক। কিন্তু ১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ ছিল ২১,৯১৪ বর্গ কিলোমিটার। বর্তমানে বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণ হল ২৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। অর্থাৎ ৬২ লক্ষ একর বনভূমি বাংলাদেশে রয়েছে যা দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ। বাংলাদেশের বনভূমি প্রয়োজনের তুলনায় বেশ কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য এবং জ্বালানি সংকট দূর করার জন্য বনভূমির পরিমাণ দিন দিন কমে যাচ্ছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের বনভূমির পরিমাণের একটি সারণি নিচে দেওয়া হল।

সারণি ৬ : মোট ভূভাগের শতকরা হার হিসেবে অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা (বাংলাদেশের বনভূমি)

দেশ	বনভূমি (শতকরা হার)	দেশ	বনভূমি (শতকরা হার)
ফিনল্যান্ড	৭৪	কানাডা	৪৫
মায়ানমার	৬৭	আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	৩৪
জাপান	৬৩	ভারত	২২
সুইডেন	৫৫	বাংলাদেশ [১]	১৭
রাশিয়া	৫১	--	--

উৎস : ১ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৩, পৃষ্ঠা ৬৩

বাংলাদেশের বনভূমির বিবরণ: মাটি ও জলবায়ুর পার্থক্যের কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক উদ্ভিদ জন্মে। নিচে উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশের বনভূমির শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করা হল।

১। ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাঝরা গাছের বনভূমি: যেসব গাছের পাতা একসঙ্গে ঝরে যায় না এবং পাতাগুলো চিরসবুজ থাকে সেগুলোকে চিরহরিৎ গাছ কিন্তু যেসব গাছের পাতা ঋতু বিশেষে একসঙ্গে সব ঝরে পড়ে সেগুলোকে পাতাঝরা গাছ বলা হয়। বাংলাদেশেও এ দুই শ্রেণীর বনভূমি দেখা যায়। বাংলাদেশের খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবানের প্রায় সব অংশে এবং চট্টগ্রাম ও সিলেট জেলার কিছু অংশে এ বনভূমি বিস্তৃত। এর আয়তন ১৪,১০২ বর্গ কিলোমিটার। অতিবৃষ্টির জন্য এসব বনভূমিতে চিরহরিৎ গাছের সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র ৮৪)।

চিরহরিৎ গাছের মধ্যে চাপালিশ, ময়না, তেলসুর ইত্যাদি এ বনে রয়েছে। পাতাঝরার মধ্যে এ বনভূমিতে আছে-গামার, শিমুল, কড়ই, সেগুন, জারুল প্রভৃতি গাছ। এ ছাড়া বাঁশ, বেত, মোম, মধু ও ঔষধি গাছও এ বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়।

২। ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি: ক্রান্তীয় অঞ্চলে যেসব গাছের পাতা বছরে এক বার সম্পূর্ণ ঝরে যায় সেগুলোকে ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছ বলা হয়। বাংলাদেশের প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহে এ বনভূমি রয়েছে। এ জাতীয় বনভূমি বাংলাদেশের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, গাজীপুর, রংপুর ও দিনাজপুরে দেখা যায়। এ বনভূমিকে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে যেমন, (ক) ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার বনভূমিকে মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি এবং (খ) দিনাজপুর জেলার বনভূমিকে বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমি বলা হয়। উভয় অঞ্চলের বনভূমিতে শাল গাছের প্রাধান্য রয়েছে। মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমির গাছগুলো স্থানীয়ভাবে গজারি নামে পরিচিত।

এ বনভূমিতে কড়ুই, হিজল, বহেরা, হরিতকী, কাঁঠাল, নিম প্রভৃতি গাছ দেখা যায়। এ বনভূমির মোট আয়তন ১,৩৩৮ বর্গ কিলোমিটার। বরেন্দ্র অঞ্চলের বনভূমির শতকরা ৯৫ ভাগ গাছই শাল। এ বনভূমির আয়তন ২২ বর্গ কিলোমিটার।

৩। স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবনঃ এ বনভূমির আয়তন ৬,৪৭৪ বর্গ কিলোমিটার। খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ও বরগুনা জেলায় এ বনাঞ্চল অবস্থিত। বরগুনা জেলার দক্ষিণ-পশ্চিমের ৯৫ বর্গ কিলোমিটার এবং বাকি অংশ সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলার দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত। সুন্দরী ও গরান এ বনভূমির প্রধান গাছ। অন্যান্য গাছের মধ্যে গেওয়া, পশুর, ধুন্দল, কেওড়া, বায়েন প্রভৃতি প্রধান। সুন্দরবনে প্রচুর গোলপাতা জন্মে।
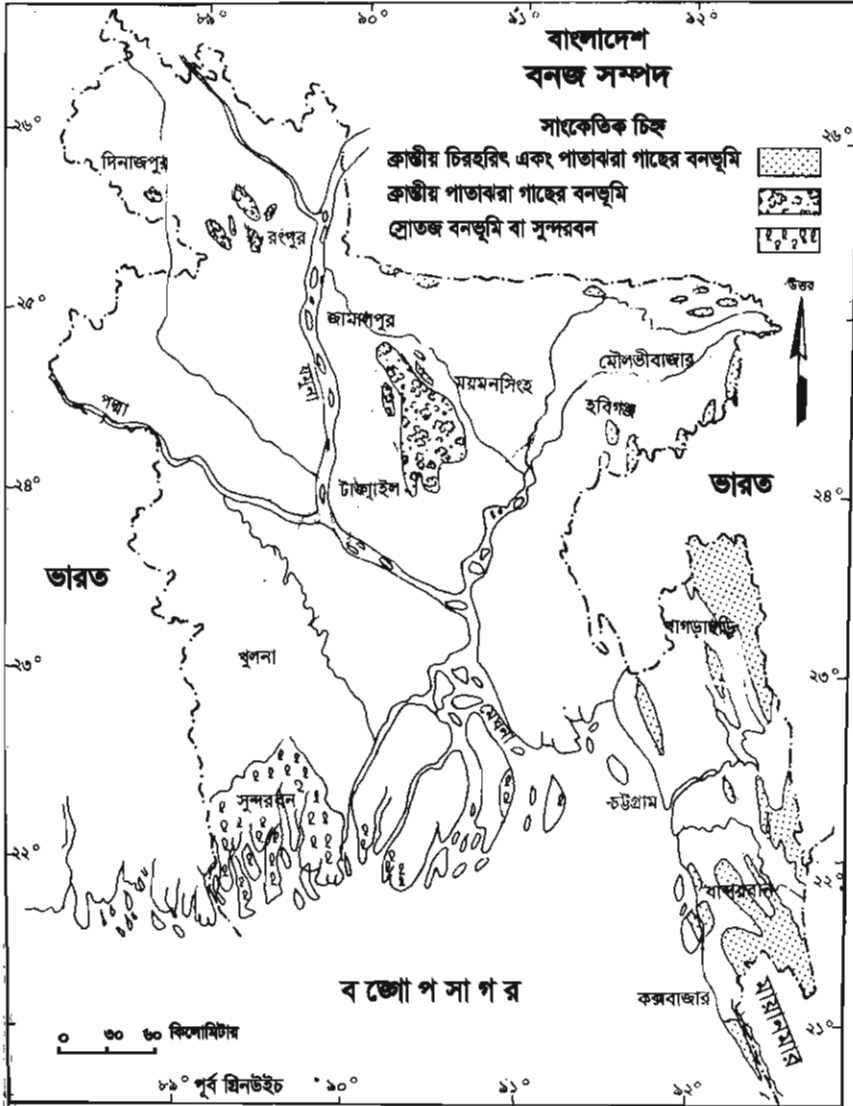
চিত্র ৮৪ : বাংলাদেশের বনজ সম্পদ

বনজ সম্পদের গুরুত্বঃ বনজ সম্পদ যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশের বনজ সম্পদের পরিমাণ সীমিত, তবুও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনভূমির ভূমিকা উপেক্ষা করা যায় না। বাংলাদেশের বনভূমি দেশের উন্নয়নে মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৫ ভাগ অবদান রাখে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বনজ সম্পদের ভূমিকা নিচে বর্ণনা করা হল।

১। পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ: মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে কাঠ, বাঁশ, বেত, মধু, মোম প্রভৃতি বন থেকে সংগ্রহ করে থাকে। এ ছাড়াও জীবজন্তুর চামড়া ও ভেষজ দ্রব্য বনভূমি থেকে সংগ্রহ করা হয়।

২। নির্মাণের উপকরণ: মানুষ বনভূমি থেকে তার ঘরবাড়ি ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য কাঠ, বাঁশ, বেত ইত্যাদি যাবতীয় উপকরণ সংগ্রহ করে। বাড়িঘর ও আসবাবপত্র নির্মাণের জন্য মানুষ বনভূমি থেকে শাল, সেগুন, মেহগনি, গর্জন, গামার, কড়ই গাছের মূল্যবান কাঠ সংগ্রহ করে।

৩। কৃষি উন্নয়ন: এ দেশের বনভূমি দেশের আবহাওয়াকে আর্দ্র রাখে। ফলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটে যা কৃষি উন্নয়নে সহায়ক। এ ছাড়া বনভূমি মাটির ক্ষয়রোধ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

৪। শিল্পের উন্নতি: বাংলাদেশে কাগজ, রেয়ন, দিয়াশলাই, ফাইবার বোর্ড, খেলনার সরঞ্জাম প্রভৃতির উৎপাদন কাজে বনজ সম্পদ ব্যবহৃত হয়ে শিল্পের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে। কর্ণফুলী কাগজকল, খুলনা নিউজপ্রিন্ট কারখানা বনজ সম্পদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।

৫। পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা: বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা দিয়ে রেললাইনের স্লিপার, মোটরগাড়ি, নৌকা, লঞ্চ, জাহাজ ইত্যাদির কাঠামো, বৈদ্যুতিক খুঁটি, রাস্তার পুল প্রভৃতি নির্মাণ করা হয়।

সরকারের আয়ের উৎস: বনজ সম্পদ সরকারের আয়ের একটি উৎস। যেমন, বনজ সম্পদ বিক্রি ও এর ওপর কর ধার্য করে সরকার রাজস্ব আয় বাড়িয়ে থাকে।

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন: বনের বিভিন্ন প্রাণীর চামড়া, দাঁত, শিং, পশম এবং কিছু জীবন্ত বন্য জন্তু রপ্তানি করে বাংলাদেশ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে।

শক্তি সম্পদ (Power Resources)

বর্তমান যান্ত্রিক সভ্যতার মূলে রয়েছে শক্তি সম্পদ। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শক্তির উৎসের আবিষ্কার এবং ব্যবহার অর্থনৈতিক উন্নতিকে ত্বরান্বিত করেছে।

মানুষ প্রথমে পেশীশক্তির ওপর নির্ভর করত। পরবর্তীতে পশু শক্তিকে বশে এনে বিভিন্ন প্রকার কাজ সম্পন্ন করতে লাগলো। প্রকৃতপক্ষে মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতির শুরু জড়শক্তি (Inanimate Energy) ব্যবহারের মাধ্যমে। মানুষ প্রাচীনকাল থেকে কাঠ পুড়িয়ে শক্তি উৎপাদন করছে। এ ছাড়া পানির প্রবাহ থেকে উৎপাদন করছে শক্তি। কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসকে শক্তির প্রধান উৎসরূপে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশে কয়লা সম্পদ রয়েছে এবং খনিজ তেল সম্পদ প্রায় নেই বললেই চলে। এ দেশে পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাসে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ বলা যায়। কিন্তু শুধু প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে আমাদের শক্তি সম্পদের চাহিদা মেটানো সম্ভব নয়।

শক্তি সম্পদের মধ্যে একটি হল পানিবিদ্যুৎ শক্তি। পৃথিবীতে পানিবিদ্যুৎ শক্তি মোট উৎপাদনের শতকরা ৬ ভাগ। বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। নদীবহুল বাংলাদেশে তাই পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। দেশের পাহাড়ি নদীগুলোর ওপর বাঁধ দিয়ে পানিবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব। এ ছাড়া বাংলাদেশ প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ হওয়ায় এ গ্যাস ব্যবহার করে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে।

১৯৯৬–৯৭ সালে দেশে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২,৯০৮ মেগাওয়াট। কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ২,১৪৮ মেগাওয়াট। ১৯৯৭–৯৮ সালে এই শক্তি উন্নীত হয়ে ৩,০৯১ মেগাওয়াটে, ১৯৯৮–৯৯ সালে এই শক্তি উন্নীত হয়ে ৩,৬১১ মেগাওয়াটে, ২০০১–০২ সালে এই শক্তি উন্নীত হয়ে ৪,২৩০ মেগাওয়াটে এবং ২০০৭–০৮ সালে এই শক্তি উন্নীত হয়ে ৫,২৬২ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। উৎপাদিত বিদ্যুতের মধ্যে ৮৫.৩৮% গ্যাসভিত্তিক, ৫.৭৭% পানিবিদ্যুৎ, ৩.৫৫ % কয়লাভিত্তিক এবং জ্বালানি তেলভিত্তিক ৫.৩০%। ১৯৯১–৯২ সালে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ৭৯ কিলোওয়াট আওয়ার, যা ১৯৯৬–৯৭ সালে ৯৯ কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত হয়েছে। অপরদিকে ১৯৯৭–৯৮ সালে দেশে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ১০৬ কিলোওয়াট আওয়ার, ১৯৯৮–৯৯ সালে ১১০ কিলোওয়াট আওয়ার, ২০০১–০২ সালে ১৩৬ কিলোওয়াট আওয়ার, যা ২০০৭–০৮ সালে ১৬৫ কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত হয়েছে (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ১১২)।

(ক) পানিবিদ্যুৎ: সহজভাবে বলা যায়, নদীর পানির স্রোতের গতিকে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে পানিবিদ্যুৎ বলে।

নিচে বাংলাদেশের পানিবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কয়েকটি প্রকল্পের কথা উল্লেখ করা হল (চিত্র ৮৫)।

১। **কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ প্রকল্প:** বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় পানিবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প হল কর্ণফুলী পরিকল্পনা– রাঙামাটির কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে পানির প্রবাহকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। ১৯৬২ সালে এ কেন্দ্রটি নির্মাণ করা হয়েছে। কাপ্তই পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুইটি জেনারেটরের সাহায্যে বর্তমানে ৮০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এর তৃতীয় ইউনিটের নির্মাণ কাজ শেষ হলে আরো ৪০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব হবে।

২। **সাঙ্গু পরিকল্পনা:** বান্দরবান জেলায় সাঙ্গু নদীর ওপর বাঁধ দিয়ে এ পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে এখানে বছরে প্রায় ৮০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

৩। **ব্রহ্মপুত্র পরিকল্পনা:** ময়মনসিংহ শহরের কাছে ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর বাঁধ দিয়ে একটি পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। নির্মাণ কাজ শেষ হলে এখানে বছরে ৮০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে।

(খ) তাপবিদ্যুৎ: শক্তির অন্যতম উৎস হচ্ছে তাপবিদ্যুৎ। যেসব এলাকায় পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা কম বা অধিক ব্যয়বহুল সেখানে তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন লাভজনক। সাধারণত প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল, কয়লা ইত্যাদি পুড়িয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় তাকে তাপবিদ্যুৎ বলা হয়। তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় পানিবিদ্যুৎ উৎপাদনের তুলনায় অনেক বেশি। দেশের বিদ্যুৎ চাহিদার প্রয়োজন মেটানোর জন্য তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন একান্ত প্রয়োজন।

বাংলাদেশে বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের জন্য কয়েকটি তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, খনিজ তেল প্রভৃতি ব্যবহার করে জেনারেটর চালু করার মাধ্যমে এ তাপবিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। ২০০১–০২ এর তথ্যানুসারে বাংলাদেশে ৩,৩৭১ মেগাওয়াট তাপবিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ২০০২)।

নিচে বাংলাদেশের প্রধান তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল।

১। **আশুগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র:** ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আশুগঞ্জে এ কেন্দ্রটি অবস্থিত। ১৯৭০ সালে প্রথম ইউনিটের বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজ শুরু হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা হল ১ লক্ষ ১০ হাজার কিলোওয়াট। প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে এ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়।

২। **ঘোড়াশাল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র:** নরসিংদি জেলার ঘোড়াশালে এ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এখানে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এ কেন্দ্রের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা হল ১ লক্ষ ১০ হাজার কিলোওয়াট।

৩। **সিদ্ধিরগঞ্জ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র:** নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে এ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করে এ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৮০ হাজার কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

৪। **শাহজীবাজার বিদ্যুৎ কেন্দ্র:** সিলেট জেলার শাহজীবাজার নামক স্থানে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত। এ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। হবিগঞ্জ থেকে এ গ্যাস সরবরাহ করা হয়। এর উৎপাদন ক্ষমতা হল ১ লক্ষ ৪ হাজার কিলোওয়াট।

৫। **চট্টগ্রাম বিদ্যুৎ কেন্দ্র:** এ কেন্দ্র থেকে চট্টগ্রাম শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। এর উৎপাদন ক্ষমতা ৮০ হাজার কিলোওয়াট।

৬। **গোয়ালপাড়া বিদ্যুৎ কেন্দ্র:** ভৈরব নদীর পাশে খুলনা জেলার গোয়ালপাড়ায় এ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয়েছে। এর উৎপাদন ক্ষমতা হল ৮০ হাজার কিলোওয়াট। খুলনা ও এর আশেপাশের এলাকায় এ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।

বাংলাদেশ শক্তি সম্পদে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। কতিপয় পানিবিদ্যুৎ প্রকল্প এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে পরিচালিত তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে যে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা হচ্ছে তা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। বাংলাদেশে বর্তমানে
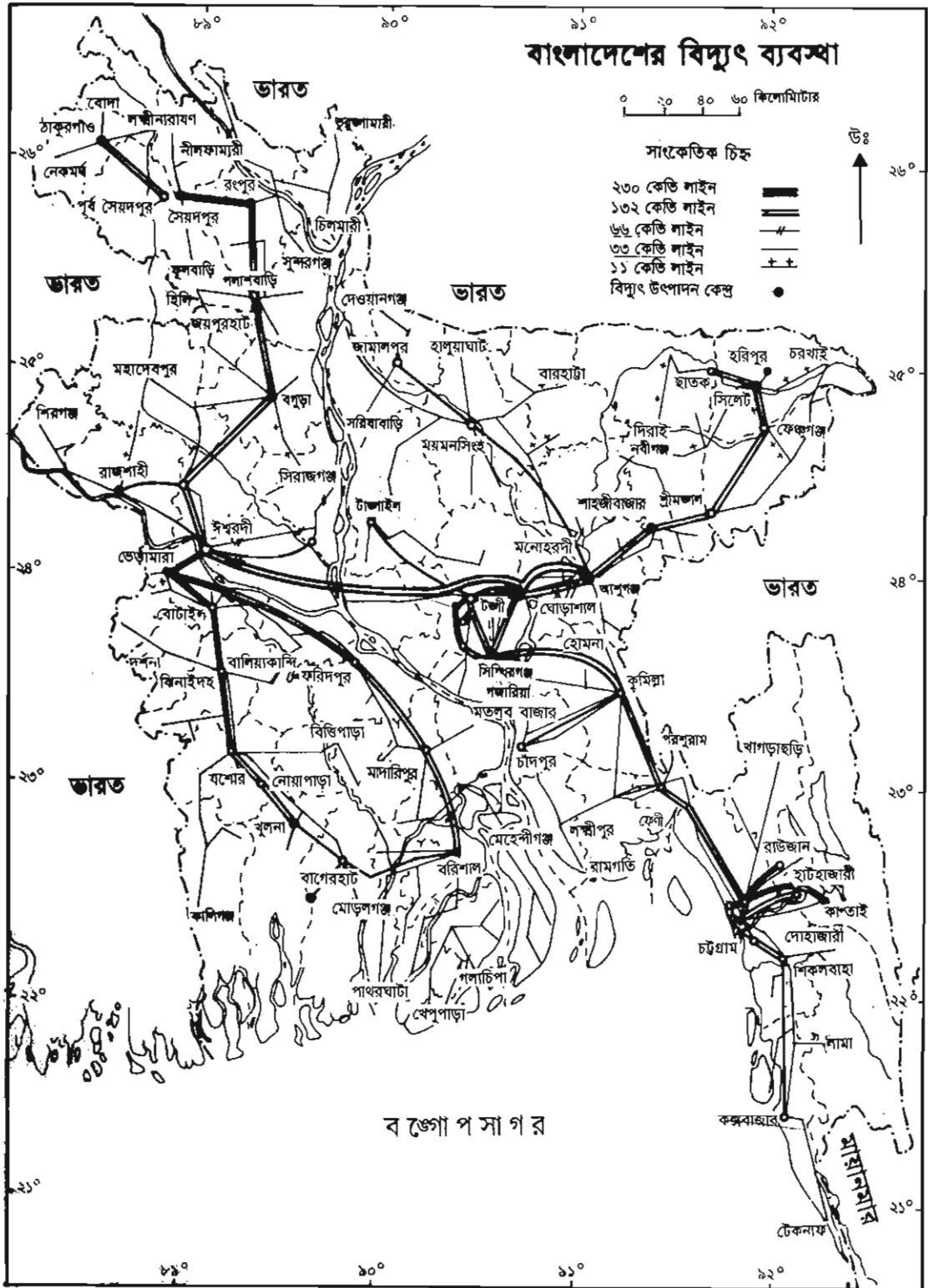
চিত্র ৮৫ : বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ৫,২৬২ মেগাওয়াট। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এখনও পর্যন্ত পরমাণু শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়নি।

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শক্তি সম্পদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষির আধুনিকায়ন, অর্থাৎ যান্ত্রিক চাষাবাদের প্রবর্তন, সেচ ব্যবস্থা ও অন্যান্য প্রকল্পে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পোন্নয়ন, গ্রামীণ উন্নয়ন, পরিবহণ ও যোগাযোগ, জ্বালানি ও ব্যবসা বাণিজ্যে শক্তি সম্পদের ব্যবহার ব্যাপক।

খনিজ সম্পদ (Mineral Resources)

প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে খনিজ সম্পদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু বাংলাদেশে খনিজ সম্পদ পর্যাপ্ত নয়। প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের দেশে খনিজ সম্পদ কম থাকায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। বাংলাদেশে যেসব খনিজ সম্পদ রয়েছে এর বর্ণনা নিচে দেওয়া হল (চিত্র ৮৬)।

১। **কয়লা:** শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। কলকারখানা, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চালানোর জন্য কয়লা ব্যবহৃত হয়। জ্বালানি হিসেবেও কয়লা ব্যবহৃত হয়। কয়লা সম্পদে বাংলাদেশ তত উন্নত নয়। এ দেশের ফরিদপুরে বাঘিয়া ও চান্দা বিল, খুলনার কোলা বিল এবং সিলেটের কিছু অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পীট জাতীয় নিম্নমানের কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে।

এ ছাড়া রাজশাহী, বগুড়া, নওগাঁ এবং সিলেট জেলায় উৎকৃষ্টমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। সম্প্রতি দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়ার কয়লাক্ষেত্র থেকে উত্তোলন শুরু হয়েছে।

২। **খনিজ তেল:** বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে খনিজ তেল আছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। ১৯৮৬ সালে সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সপ্তম কূপে তেল পাওয়া গেছে। এ কূপ থেকে দৈনিক প্রায় ৬০০ ব্যারেল অপরিশোধিত তেল তোলা হচ্ছে। অপরিশোধিত তেল চট্টগ্রামের তেল শোধনাগারে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। অশোধিত তেল থেকে পেট্রোল, কেরোসিন, বিটুমিন ও অন্যান্য দ্রব্য পাওয়া যায়। মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে বাংলাদেশের দ্বিতীয় তেলক্ষেত্রটি অবস্থিত। এ ক্ষেত্র থেকে দৈনিক প্রায় ১,২০০ ব্যারেল তেল উত্তোলিত হয়।

৩। **চুনাপাথর:** সিলেট জেলার জাফলং, জকিগঞ্জ; সুনামগঞ্জ জেলার ভাঙারঘাট, বাগালিবাজার, লালঘাট ও টাকেরঘাট এবং চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড ও কক্সবাজার জেলার সেন্ট মার্টিন্স দ্বীপে চুনাপাথর পাওয়া যায়। রাজশাহী বিভাগে জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ ও জয়পুরহাটে চুনাপাথর পাওয়া যায়। সিমেন্টের কাঁচামাল হিসেবে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া গ্লাস, ব্লিচিং পাউডার, সাবান, কাগজ প্রভৃতি শিল্পে চুনাপাথরের ব্যবহার হয়ে থাকে।

৪। **চীনামাটি:** রাজশাহী, নওগাঁ ও ময়মনসিংহে শ্বেতমৃত্তিকা পাওয়া গেছে। এটি তৈজসপত্র তৈরি এবং বৈদ্যুতিক ইনস্যুলেটর ও স্যানিটারী সরঞ্জাম প্রভৃতি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৫। **তামা:** রংপুর জেলার রানীপুকুর ও পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সঙ্গে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

৬। **কঠিন শিলা:** রেলপথ, রাস্তাঘাট, গৃহ, সেতু ও বাঁধ নির্মাণ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কাজে কঠিন শিলা (Hard Rock) ব্যবহৃত হয়। রংপুর জেলার রানীপুকুর ও শ্যামপুরে এবং দিনাজপুর জেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। রংপুরের রানীপুকুর থেকে বৈদেশিক সহযোগিতায় শিলা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন, এখান থেকে বছরে প্রায় ১৭ লক্ষ টন শিলা উত্তোলন করা যাবে। দিনাজপুরের মধ্যপাড়া থেকে শিলা উত্তোলন করার জন্য বৈদেশিক সহযোগিতা গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

৭। **সিলিকা বালি:** সিলিকা বালি সাধারণত কাচ নির্মাণে ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া রং, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি তৈরিতেও সিলিকা বালি ব্যবহৃত হয়। সিলেট জেলার নয়াপাড়া, শাহজীবাজার, কুলাউড়া, ছাতিয়ান; শেরপুর জেলার বালিজুরি, চট্টগ্রামের দোহাজারীতে সিলিকা বালির সন্ধান পাওয়া গেছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১ লক্ষ ৮০ হাজার বর্গফুট সিলিকা বালি উৎপাদিত হয়ে থাকে।

৮। **পারমাণবিক খনিজ পদার্থ:** পারমাণবিক খনিজ পদার্থ (Atomic minerals) সাধারণত ভারি ধাতব শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া থেকে টেকনাফ পর্যন্ত উপকূলীয় এলাকায় প্রচুর খনিজ বালির সন্ধান পাওয়া গেছে। পারমাণবিক খনিজ পদার্থগুলো হল জিরকন, মোনাজাইট, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, লিউকক্সেন প্রভৃতি। এ খনিজ সংগ্রহের জন্য অস্ট্রেলিয়া সরকারের সহায়তায় একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
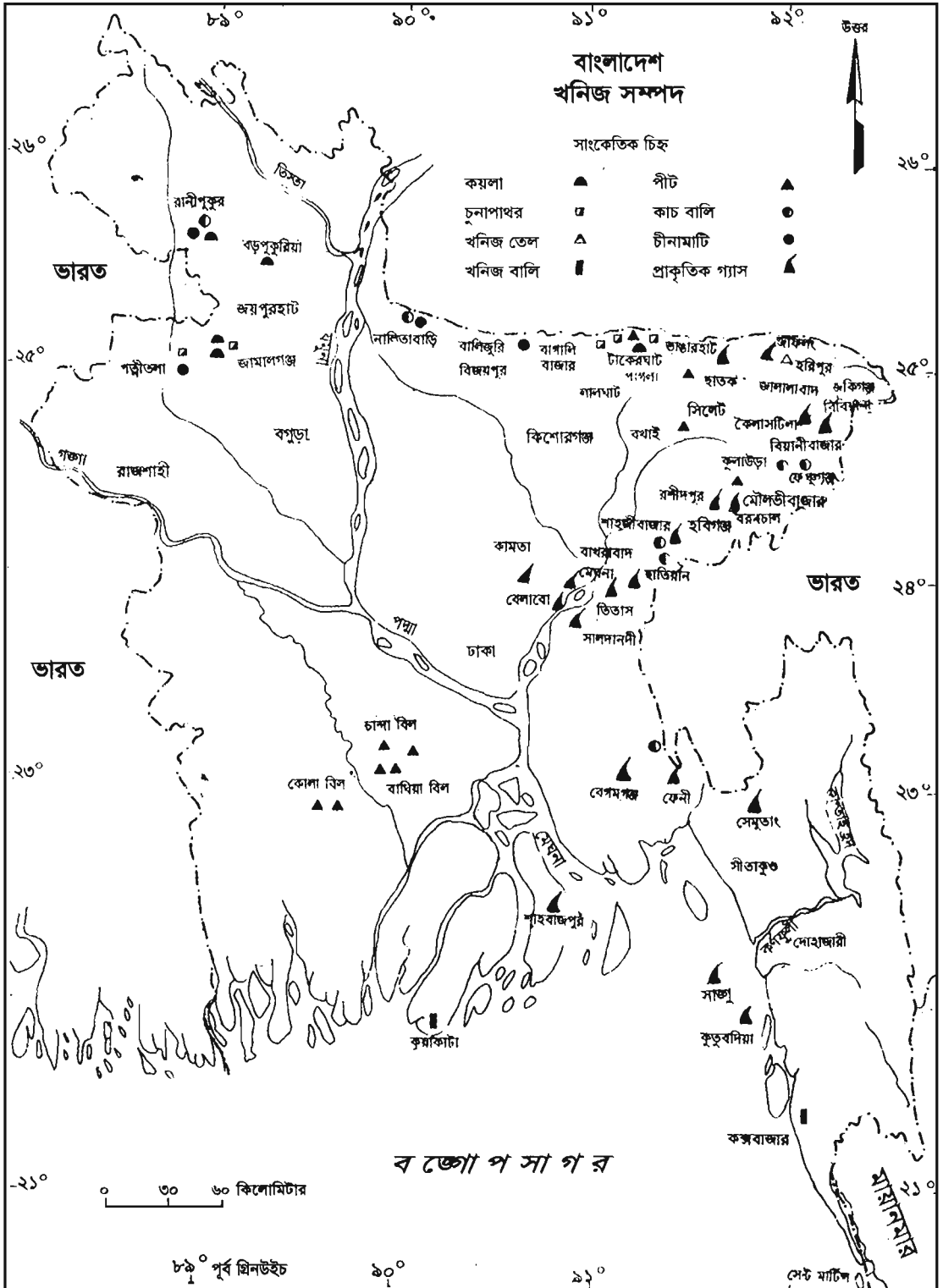
চিত্র ৮৬ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

৯। গন্ধক: গন্ধক (Sulpher) সাধারণত রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বারুদ, কীটপতঙ্গ নাশক ওষুধ তৈরি, এসিড, পেট্রোলিয়াম পরিশোধন, দিয়াশলাই, আতশবাজি প্রভৃতি তৈরিতে গন্ধক ব্যবহার করা হয়। চট্টগ্রাম জেলার কুতুবদিয়া দ্বীপে গন্ধক পাওয়া যায়।

১০। প্রাকৃতিক গ্যাস: বাংলাদেশ পৃথিবীর অনেক দেশের তুলনায় খনিজ সম্পদে পিছিয়ে পড়ে রয়েছে। তবে এ দেশ প্রাকৃতিক গ্যাসে সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা ৭৩ ভাগ পূরণ করে থাকে। জুন, ২০০৮ পর্যন্ত দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা ২৩টি। বর্তমানে ১৭টি গ্যাসক্ষেত্রের ৭৯টি কূপ থেকে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। ১৯৯৭–৯৮ সালে প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২৮২ বিলিয়ন ঘনফুট, ১৯৯৮–৯৯ সালে ৩০৮ বিলিয়ন ঘনফুট, ২০০১–০২ সালে ৩৯২ বিলিয়ন ঘনফুট এবং ২০০৬–০৭ সালে ৫৬২ বিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদের পরিমাণ প্রায় ২০.৬৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, পৃষ্ঠা ১২২)।
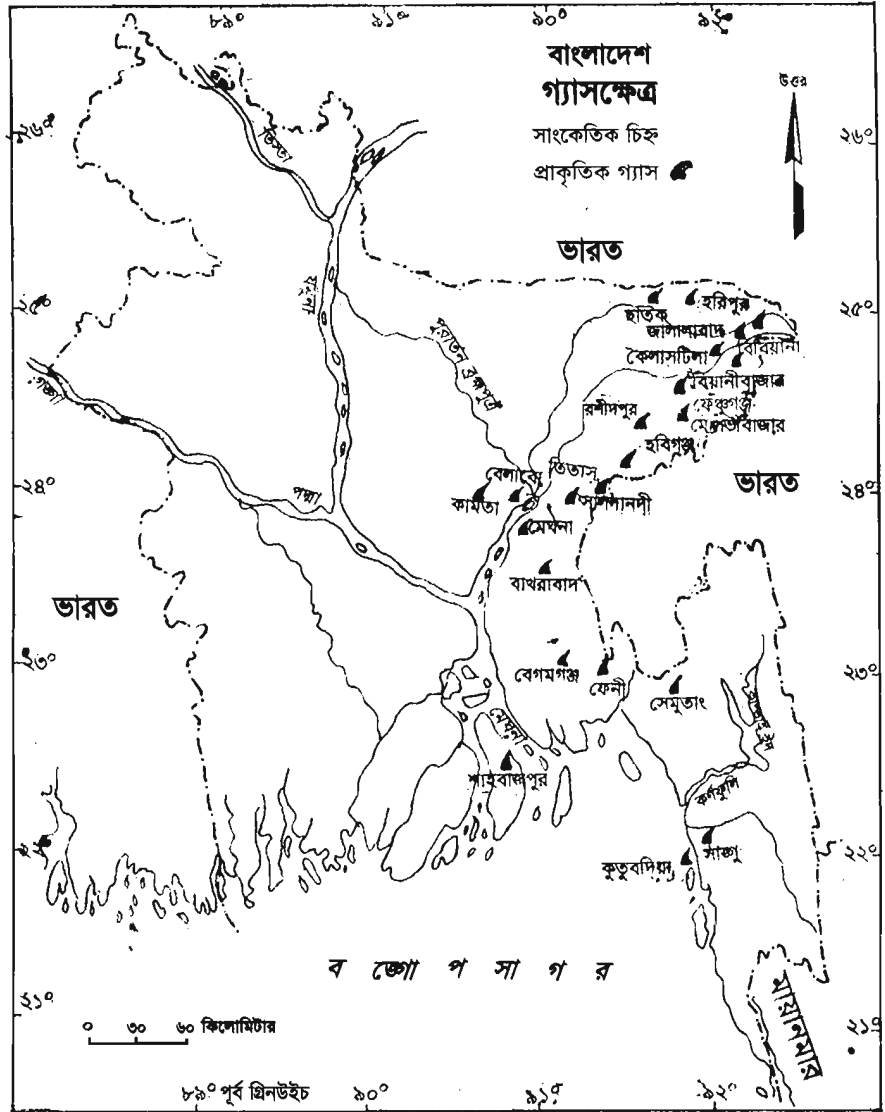
চিত্র ৮৭ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রসমূহ

বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রগুলো হল সিলেট, ছাতক, রশীদপুর, হবিগঞ্জ, কৈলাসটিলা, বাখরাবাদ, তিতাস, বেগমগঞ্জ, কুতুবদিয়া, কামতা, সেমুতাং, ফেনী, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, জালালাবাদ, মেঘনা, নরসিংদি, শাহবাজপুর, সাঙ্গু, সালদানদী, বিবিয়ানা, মৌলভীবাজার ও বাঙ্গুরা। গ্যাসের ব্যবহার ও গুরুত্ব নিচে বর্ণনা করা হল (চিত্র ৮৭)।

১। শিল্প কারখানার জ্বালানি: প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের শিল্প কারখানাতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এতে জ্বালানি সমস্যা লাঘব হয়। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জ্বালানির শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগই হল প্রাকৃতিক গ্যাস।

২। বিদ্যুৎ উৎপাদন: বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক গ্যাসের গুরুত্ব কম নয়। কয়েকটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ফার্নেস তেলের পরিবর্তে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়। যেমন, সিদ্ধিরগঞ্জ, শাহজীবাজার, আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল ইত্যাদি। এতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় কম হয়। এর ফলে শিল্প কারখানায় ও আবাসিক এলাকায় বিদ্যুৎ কম খরচে ব্যবহার করা যায়।

৩। **শিল্পের কাঁচামাল:** প্রাকৃতিক গ্যাস সার কারখানাগুলোতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়াও কীটনাশক ওষুধ, রবার, প্লাস্টিক, কৃত্রিম তন্তু প্রভৃতি তৈরির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

৪। **কর্মসংস্থান:** গ্যাস সন্ধান করা এবং আবিষ্কারের পর বহু সংখ্যক লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। গ্যাস উত্তোলন, কূপ খনন, সংরক্ষণ ও বিপণন প্রভৃতি ক্ষেত্রে বহু সংখ্যক লোক জড়িত রয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদন, কৃষি, শিল্প কারখানা ও গৃহকর্মে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ গ্যাস সরকারি আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। সরকার প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব পায়।

শিল্প (Industries)

বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষি নির্ভর। কৃষিপ্রধান দেশ হলেও উন্নয়নশীল দেশ বিধায় এ দেশে শিল্পের গুরুত্বও অপরিসীম। বাংলাদেশ শিল্পক্ষেত্রে এখনও সমৃদ্ধশালী নয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক কম। বাংলাদেশের প্রধান শিল্পগুলো হল:

পাট শিল্প: পাট শিল্প গড়ে ওঠার পিছনে যেসব ভৌগোলিক কারণ রয়েছে সেগুলো হল– জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি, মৃত্তিকা ও শক্তি সম্পদ প্রাপ্তি। অর্থনৈতিক কারণ হচ্ছে, কাঁচামাল প্রাপ্তি, দক্ষ ও সুলভ শ্রমিক, বাজার, মূলধন, উন্নত পরিবহণ ব্যবস্থা, সরকারের শিল্পনীতি ইত্যাদি।
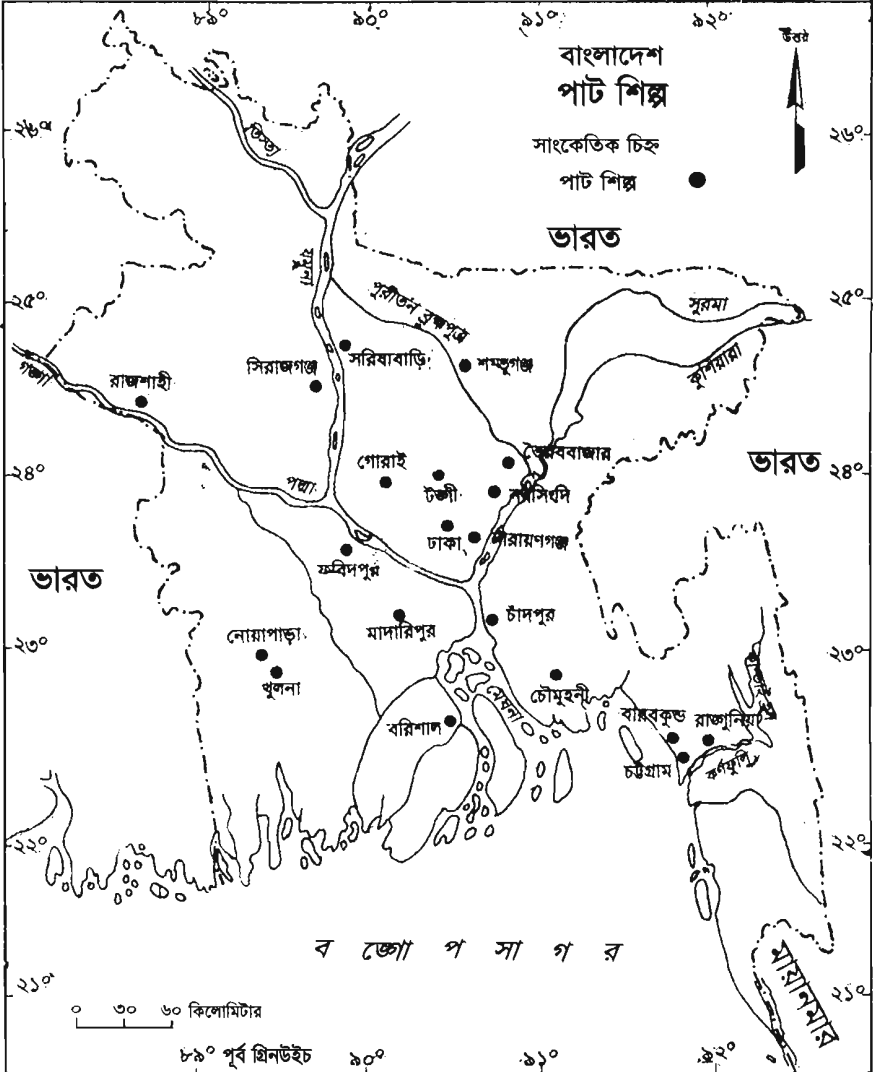
চিত্র ৮৮ : বাংলাদেশের পাট শিল্প

১৯৫০ সাল পর্যন্ত এ দেশে কোনো পাটকল গড়ে ওঠেনি। ১৯৫১ সালে ১,০০০ তাঁত নিয়ে নারায়ণগঞ্জের আদমজীনগরে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম পাটকল। এটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল। বাংলাদেশে বেসরকারিখাতে মোট ৯৯টি পাটকলের মধ্যে ৭৩টি পাটকল চালু ছিল। ২০০৬–০৭ সালের তথ্য অনুসারে এ দেশে ৭৬টি পাটকল রয়েছে (উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক, ২০০৭/এপ্রিল ২০০৮, পৃষ্ঠা ২২৯)। নারায়ণগঞ্জ, খুলনা ও চট্টগ্রাম প্রধান তিনটি পাট শিল্প কেন্দ্র। এ ছাড়া ডেমরা, ঘোড়াশাল, নরসিংদি, ভৈরববাজার, গৌরীপুর, মাদারিপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ, হবিগঞ্জ প্রভৃতি স্থানেও পাটকল রয়েছে (চিত্র ৮৮)।

পাটকলে সাধারণত চট, বস্তা, কার্পেট, দড়ি ইত্যাদি তৈরি হয়। এ ছাড়াও পাট থেকে বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ, স্যান্ডেল, ম্যাট, পুতুল, শো পিস ইত্যাদি তৈরি হয়। এক সময়ে বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা প্রায় ৫৫ ভাগ অর্জিত হত কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে। নিচে কয়েক বছরের পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ এবং রপ্তানির মাধ্যমে অর্জিত আয়ের সারণি দেওয়া হল।

সারণি ৭ : পাটজাত দ্রব্যের উৎপাদন ও আয়, বাংলাদেশ, ১৯৯৭–২০০৭

সাল	উৎপাদন[১] ('০০০' মেট্রিক টন)	অর্জিত আয়[২] (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)	সাল	উৎপাদন[১] ('০০০' মেট্রিক টন)	অর্জিত আয়[২] (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)
১৯৯৭–৯৮	৪১১.০০	২৮১	২০০২–০৩	৩২০.০০	২৫৭
১৯৯৮–৯৯	৩৬৭.৯৩	৩০৪	২০০৩–০৪	২৮৫.০০	২৪৬
১৯৯৯–০০	৩৩৯.০০	২৬৬	২০০৪–০৫	২৭৫.৪৫	৩০৭
২০০০–০১	৩৩৫.০০	২৩০	২০০৫–০৬	৩৫৪.০০	৩৬১
২০০১–০২	৩৫২.০০	২৪৪	২০০৬–০৭	২৬৩.৩৬	৩২১

উৎস: ১ : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ৩৩
২ : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ৪৯

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশের মোট অর্জিত মুদ্রার একটা বড় অংশ আসত পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানির মাধ্যমে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, মিসর, রাশিয়া, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, বেলজিয়াম, কানাডা, ইতালি, জার্মানি, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশ থেকে পাট ও পাটজাত দ্রব্য ক্রয় করে।

বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে কৃত্রিম তন্তুজাত দ্রব্য ব্যবহার শুরু হওয়ায় বিশ্বের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। ফলে বাংলাদেশে পাট শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন যথেষ্ট কমে গেছে।

বস্ত্র শিল্প: বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান শিল্প হচ্ছে বস্ত্র। মানুষের মৌলিক চাহিদার মধ্যে খাদ্যের পরেই বস্ত্রের প্রয়োজন। বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। বস্ত্র শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় প্রধান কাঁচামাল তুলা বাংলাদেশে খুবই কম পরিমাণে উৎপন্ন হয়। এ দেশের আবহাওয়া বস্ত্র শিল্পের অনুকূল। বাংলাদেশে বাৎসরিক বস্ত্রের চাহিদা ৮২৩ মিলিয়ন মিটার, কিন্তু দেশীয় বস্ত্র শিল্পের বাৎসরিক উৎপাদন ৪৫০ মিলিয়ন মিটার। এ জন্য যে পরিমাণ তুলা প্রয়োজন সে তুলনায় বাংলাদেশে উৎপাদিত তুলার পরিমাণ খুব কম এবং তা নিম্নমানের। এ জন্য বস্ত্র শিল্পগুলোকে তুলা আমদানির ওপর নির্ভর করতে হয়।

১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে মোট বস্ত্রকলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৮টি। এসব বস্ত্রকলে তাঁতের সংখ্যা ছিল মাত্র ২,৭১৭। ১৯৬৯–৭০ সালে বস্ত্রকলের সংখ্যা ছিল ৪৪টি। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট ৬৩টি বস্ত্র ও সুতাকল চালু রয়েছে (চিত্র ৮৯)।

স্বাধীনতার কিছু দিন পরে বাংলাদেশ সরকার সব কটি সুতা ও বস্ত্রকল জাতীয়করণ করে এবং এর কিছু দিন পর সেগুলো পরিচালনার দায়িত্ব বাংলাদেশ বস্ত্র শিল্প সংস্থার (Bangladesh Textile Mills Corporation) ওপর ন্যস্ত করে। ১৯৮৪–৮৫ সালে কিছু বস্ত্রকল বেসরকারি মালিকানায় আসে এবং বর্তমানে ২৫টি কল বেসরকারি খাতে পরিচালিত হচ্ছে।

বস্ত্র শিল্পে প্রায় ১০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করে। তবে এদের অধিকাংশ বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে তাঁত শিল্পে নিয়োজিত আছে। বস্ত্রকলে প্রায় ৭৫ হাজার শ্রমিক কর্মরত আছে।

সারণি ৮ : বস্ত্র শিল্পের উৎপাদন, বাংলাদেশ, ১৯৯৭–২০০৭

সাল	উৎপাদন		সাল	উৎপাদন	
	সুতা (মিলিয়ন কেজি)	কাপড় (মিলিয়ন মিটার)		সুতা (মিলিয়ন কেজি)	কাপড় (মিলিয়ন মিটার)
১৯৯৭–৯৮	৫২.৮৮	১০.২৬	২০০২–০৩	৬৯.৮৪	১৮.০৩
১৯৯৮–৯৯	৫৪.৮০	১০.৫৭	২০০৩–০৪	৮৪.৫৭	২৬.৩০
১৯৯৯–০০	৫৮.৫৪	১২.৪১	২০০৪–০৫	১০৫.৫৭	৩২.৮৭
২০০০–০১	৬০.৮২	১৪.৭৩	২০০৫–০৬	১২১.০০	৩৯.৭৯
২০০১–০২	৬৫.৫৮	১৬.১৪	২০০৬–০৭	১৫৬.৩৭	৪৩.৭৩

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ৩৩

বাংলাদেশের ঢাকা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে বস্ত্র শিল্প গড়ে উঠেছে। এ শিল্প গড়ে ওঠার পিছনে যে নিয়ামকগুলো প্রধানত কাজ করছে তা হল সুলভ শ্রমিক সরবরাহ, পরিবহণ ও যোগাযোগের সুবিধা, আর্দ্র জলবায়ু এবং স্থানীয় ব্যাপক বাজার প্রাপ্তি। ঢাকা অঞ্চলে ঢাকা এবং এর আশেপাশে প্রায় ২৪টি বস্ত্রকল স্থাপিত হয়েছে। টঙ্গী, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ, কাঁচপুর, ডেমরা, সাভার প্রভৃতি অঞ্চলে বস্ত্র বয়নশিল্প গড়ে উঠেছে।

চিত্র ৮৯ : বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্প

চট্টগ্রাম অঞ্চলের ফৌজদারহাট, ষোলশহর, পাঁচলাইশ, হালিশহর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বস্ত্র শিল্প কেন্দ্র। চট্টগ্রাম দেশের দ্বিতীয় প্রধান বস্ত্র শিল্প অঞ্চল।

কুমিল্লা–নোয়াখালি অঞ্চলের দুর্গাপুর, দৌলতপুর, হালিমানগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, দেবীদ্বার, ফেনী প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রকল রয়েছে। এ অঞ্চলটি বাংলাদেশের তৃতীয় প্রধান বস্ত্র শিল্পাঞ্চল।

বর্তমানে বাংলাদেশে যে বস্ত্র উৎপাদিত হয় তা চাহিদার তুলানায় খুবই অপর্যাপ্ত। বাংলাদেশ প্রতি বছর জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং, কোরিয়া, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ তুলা, সুতিবস্ত্র ও সুতা আমদানি করে থাকে।
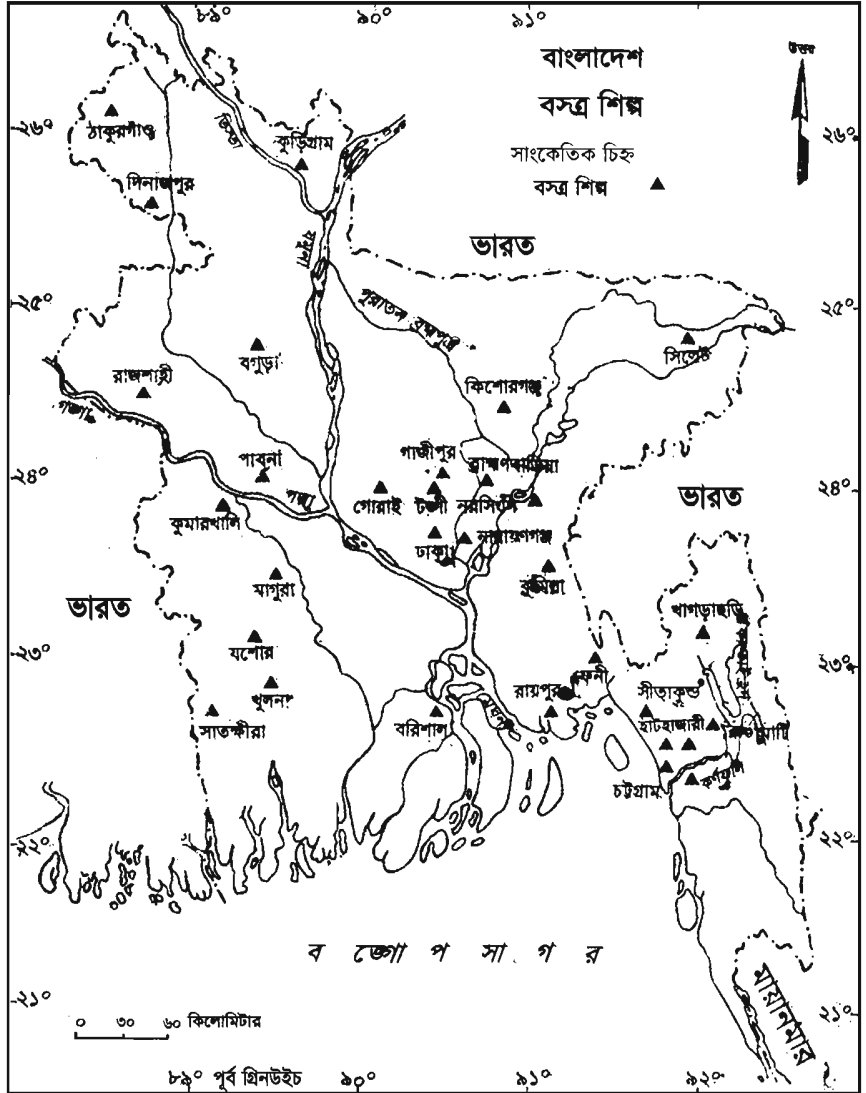
কাগজ শিল্প : কাগজ শিল্প বাংলাদেশের একটি অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ১৯৫৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম কাগজের কল স্থাপিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে ৬টি কাগজকল, ৪টি বোর্ড মিল ও ১টি নিউজপ্রিন্ট কারখানা আছে। কাগজের কলগুলো হল রাঙামাটি জেলার চন্দ্রঘোনায় কর্ণফুলী কাগজকল, পাবনা জেলার পাকশীর উত্তরবঙ্গ কাগজকল, ছাতকের সিলেট মণ্ড ও কাগজকল এবং নারায়ণগঞ্জের মেঘনা ঘাটের নিকট বসুন্ধরা, মাগুড়া ও শাহজালাল কাগজকল। এ ছাড়া নিউজপ্রিন্ট কারখানার মধ্যে খুলনা নিউজপ্রিন্ট, বোর্ড মিলগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ হার্ডবোর্ড মিলস, আদমজী পার্টিকেল বোর্ড মিলস, কাপ্তাই ও টঙ্গীর বোর্ড মিলস উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের কাগজকলের মধ্যে প্রথম ও বৃহত্তম হল কর্ণফুলী কাগজকল।

কাগজ উৎপাদনের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাঁশ, নরম কাঠ, নলখাগড়া, আখের ছোবড়া, পাটকাঠি ইত্যাদি। এ ছাড়া কাঁচাপাট দিয়ে কাগজ তৈরির উন্নত প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

কাগজকলগুলোতে প্রধানত লেখার কাগজ, ছাপার কাগজ, প্যাকিং ও অন্যান্য কাগজ এবং নিউজপ্রিন্ট উৎপন্ন হয়। সারণি ৯ এ কয়েক বছরের কাগজ ও নিউজপ্রিন্টের উৎপাদন দেখানো হল।

সারণি ৯ : কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন, বাংলাদেশ, ১৯৯৩–২০০৩

সাল	উৎপাদন (মেট্রিক টন)		সাল	উৎপাদন (মেট্রিক টন)	
	কাগজ	নিউজপ্রিন্ট		কাগজ	নিউজপ্রিন্ট
১৯৯৩–৯৪	৪৪,২৮৮	৪৬,৫২৭	১৯৯৮–৯৯	৩৮,২৮৯	২১,৫৭৩
১৯৯৪–৯৫	৩৯,৭৩৬	৪৩,০৬২	১৯৯৯–০০	৩৭,০৩৬	১৭,৯৪৭
১৯৯৫–৯৬	৪১,৮২৯	৪৩,৯৭২	২০০০–০১	৪০,০০৩	১১,১৫৭
১৯৯৬–৯৭	৩৯,৮৪০	২৭,৬৭৫	২০০১–০২	৪০,৩৭২	২,৯৮৫
১৯৯৭–৯৮	৩৮,২০৮	৭,৬৭৩	২০০২–০৩	৩০,২১২	–

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ, ২০০৬, সারণি ৫.১৩

বাংলাদেশ কাগজ ও কাগজ জাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে দেশের অধিকাংশ চাহিদা মিটিয়ে দেশের বাইরে কিছু নিউজপ্রিন্ট রপ্তানি করে থাকে। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান, মায়ানমার, নেপাল, ইরাক প্রভৃতি দেশে কাগজ রপ্তানি করে থাকে।

কাগজ শিল্পে কাঁচামাল, রাসায়নিক দ্রব্য, শক্তি সম্পদ প্রভৃতির অভাব রয়েছে। এ শিল্পের উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন কাঁচামালের সুষ্ঠু সরবরাহ, পর্যাপ্ত ও নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ ও বিশ্ববাজার সৃষ্টি প্রভৃতি।

সার শিল্প: বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত ফসল। ভূমির একর প্রতি ফসল বৃদ্ধির জন্য সারের প্রয়োজন রয়েছে। জমিতে জৈব সার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে রাসায়নিক সারের ব্যবহারও অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

সার শিল্প গড়ে ওঠার পিছনে যে সমস্ত নিয়ামক রয়েছে সেগুলো হল– কাঁচামালের পর্যাপ্ততা, শক্তি সম্পদের প্রাপ্তি, বাজার প্রাপ্তি, সুলভ শ্রমিক ও সুষ্ঠু পরিবহণ ব্যবস্থা।

১৯৬১ সালে বাংলাদেশে প্রথম সার কারখানা সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জে স্থাপিত হয়। বর্তমানে ৮টি সার কারখানা থেকে সার উৎপাদন হচ্ছে। সার কারখানাগুলো হল ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ জিয়া সার কারখানা, পলাশ ইউরিয়া সার কারখানা, চট্টগ্রাম ট্রিপল সুপার ফসফেট সার কারখানা, চট্টগ্রাম ইউরিয়া সার কারখানা ও যমুনা সার কারখানা ও ফেঞ্চুগঞ্জ অ্যামোনিয়াম সালফেট সার কারখানা (চিত্র ৯০)। বর্তমানে বাংলাদেশে ১২ লক্ষ টন সারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাংলাদেশে প্রয়োজন অনুপাতে সারের উৎপাদন কম। সারণি ১০ এ সার উৎপাদনের তথ্য দেওয়া হল।

সারণি ১০ : সার উৎপাদন, বাংলাদেশ, ১৯৯৭–২০০৭

সাল	উৎপাদন ('০০০' মেট্রিক টন)	সাল	উৎপাদন ('০০০' মেট্রিক টন)
১৯৯৭–৯৮	২০৩০.৬৭	২০০২–০৩	২২৬৩.৫২
১৯৯৮–৯৯	১৭৯৯.৩৬	২০০৩–০৪	২১৯৮.৭৩
১৯৯৯–০০	১৯০৪.০২	২০০৪–০৫	২১০২.৩৬
২০০০–০১	২০৭৩.৪৫	২০০৫–০৬	১৯২৬.৬৭
২০০১–০২	১৭৫৩.৫৩	২০০৬–০৭	১৯৮২.২৯

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ৩৩

সার উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় বাংলাদেশ প্রতি বছর প্রচুর সার আমদানি করে। ২০০১–০২ সালে বাংলাদেশ প্রায় ৬১৫ কোটি টাকা মূল্যের সার আমদানি করেছিল। ২০০৭–০৮ সালে বাংলাদেশ প্রায় ২৮১৩ কোটি টাকা মূল্যের সার আমদানি করে (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ৫১)।
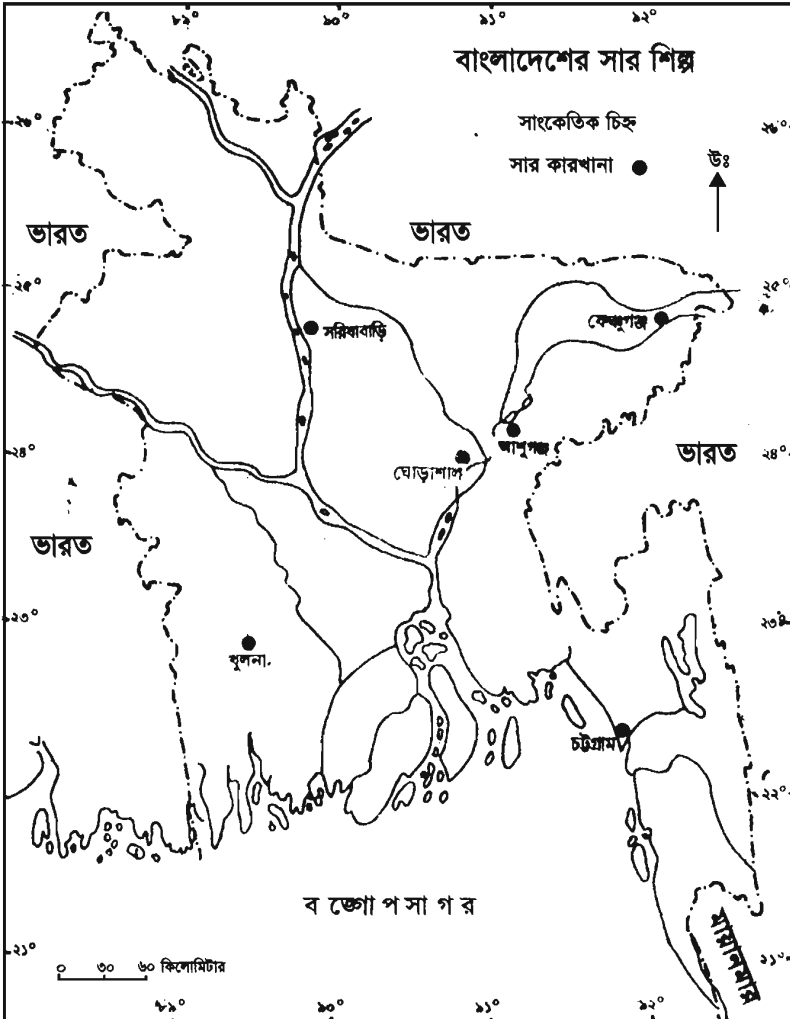
চিত্র ৯০ : বাংলাদেশের সার শিল্প

বাংলাদেশে বৃহৎ শিল্পের মধ্যে সার অন্যতম। প্রাকৃতিক গ্যাসের সহজলভ্যতার জন্য সার শিল্পের উন্নয়নের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে সার রপ্তানি করতে বাংলাদেশ সক্ষম হবে।

চিনি শিল্প: চিনি শিল্প বাংলাদেশের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্প। চিনি খাদ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ১৯৪৭ সালে বাংলাদেশে ৫টি চিনির কল ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৭টি চিনির কল রয়েছে। বাংলাদেশে চিনিকলগুলোর মধ্যে অন্যতম হল শ্যামপুর চিনির কল, সেতাবগঞ্জ চিনির কল, ঠাকুরগাঁও চিনির কল, দর্শনা চিনির কল, মধুখালি চিনির কল প্রভৃতি।

চিনি উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল আখ। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়ায় আখের উৎপাদন ভালো হয়। তাই বলা যায় আবহাওয়া ও মৃত্তিকাজনিত কারণে বাংলাদেশে চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে। আবহাওয়াজনিত কারণে চিনির কলগুলো দেশের উত্তর ও পশ্চিম অংশে অবস্থিত (চিত্র ৯১)।

চিত্র ৯১ : বাংলাদেশের চিনিকলের অবস্থান

প্রয়োজনীয় আখের অভাবে বাংলাদেশের চিনির কলগুলোতে ক্ষমতা অনুযায়ী চিনি উৎপাদিত হয় না। ১৯৯৪-৯৫ সালে চিনি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ২.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। ১৯৯৭-২০০৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের চিনি উৎপাদনের পরিমাণ সারণি ১১ এ প্রদান করা হল।

সারণি ১১ : চিনি উৎপাদন, বাংলাদেশ, ১৯৯৭-২০০৭

সাল	উৎপাদন ('০০০' মেট্রিক টন)	সাল	উৎপাদন ('০০০' মেট্রিক টন)
১৯৯৭-৯৮	১৬৬.৪৬	২০০২-০৩	১৭৭.৪০
১৯৯৮-৯৯	১৫২.৯৮	২০০৩-০৪	১১৯.১৫
১৯৯৯-০০	১২৩.৪৩	২০০৪-০৫	১০৬.৬৫
২০০০-০১	৯৭.৮২	২০০৫-০৬	১৩৩.৩০
২০০১-০২	২৮৪.৩৩	২০০৬-০৭	১৩২.৪০

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ৩৩
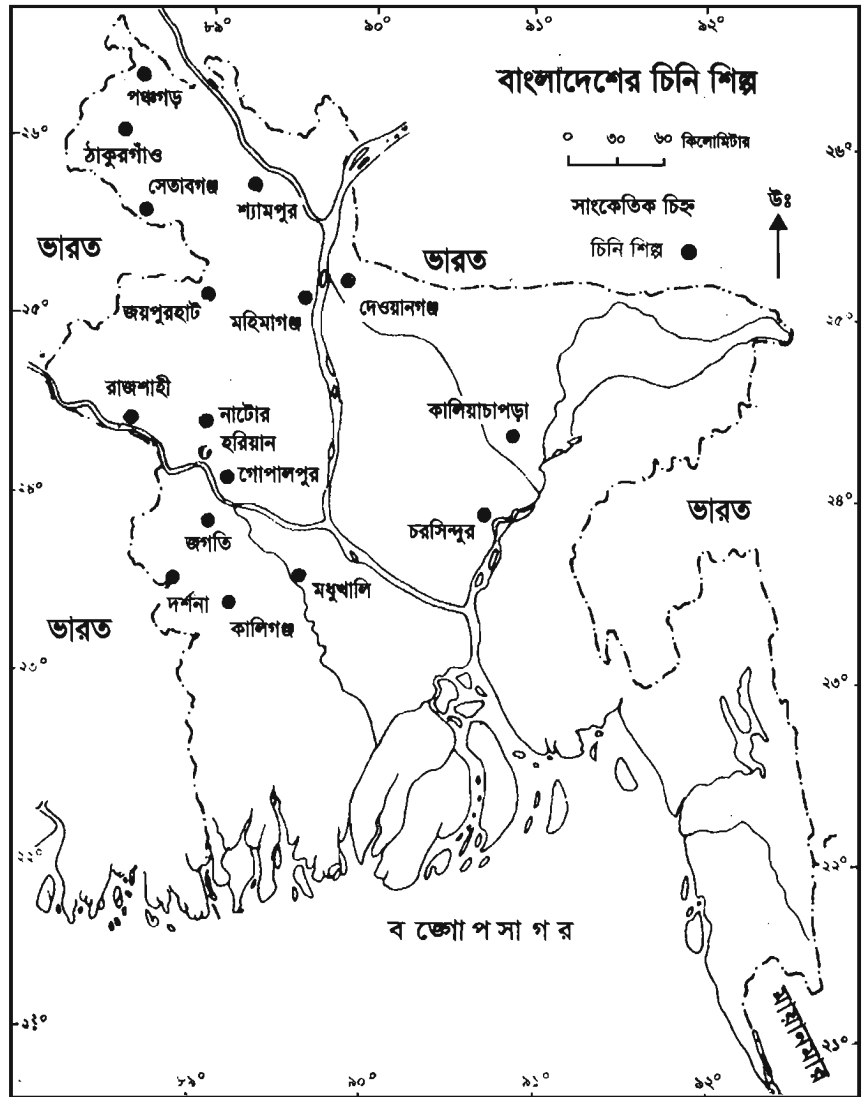
বাংলাদেশের চিনির কলগুলো বর্তমানে দেশের চাহিদা অনুযায়ী চিনি উৎপাদনে সক্ষম নয়। ফলে উৎপাদন দেশের বার্ষিক প্রয়োজনের তুলনায় কম। ১৯৯২-৯৩ সালে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা মূল্যের চিনি আমদানি করা হয়।

বাংলাদেশের চিনি শিল্পের প্রধান সমস্যা হল আখ সরবরাহের অনিশ্চয়তা। আখ উৎপাদনের স্বল্পতার জন্য একদিকে যেমন চিনিকলগুলো পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা ব্যবহার করতে পারছে না অপরদিকে তেমনি আর একটি সমস্যা হল মাঠেই গুড় উৎপাদনের প্রবণতা।

পোশাক শিল্প: বাংলাদেশের পোশাক শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প হিসেবে গড়ে উঠেছে। অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রির জন্য ষাটের দশকের প্রথম দিক থেকে বাংলাদেশে পোশাক শিল্প উৎপাদন শুরু করে ক্রমান্বয়ে এ শিল্পে রপ্তানিমুখী উৎপাদন শুরু হয়েছে। সত্তর দশকের শেষে এবং আশির দশকের প্রথম থেকে রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৩ সালের শেষ নাগাদ সারাদেশে মাত্র ৯২টি রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। ১৯৮৪ সালে এক বছরেই ৪৫৫টি এবং ১৯৮৫ সালে অতিরিক্ত ইউনিট স্থাপিত হয়ে মোট শিল্প ইউনিটের সংখ্যা ৭১৫টিতে উন্নীত হয়। এরপর এ শিল্প অতি দ্রুত বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের শীর্ষে নিজের স্থান করে নিয়েছে।

পোশাক শিল্পের গুরুত্ব: বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অথচ যে খাদ্য উৎপন্ন হয় তা দিয়ে দেশের জনসংখ্যার চাহিদা মেটে না। কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে প্রতি বছর আমাদের খাদ্যসামগ্রী আমদানি করতে হয়। বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের পর এ দেশের আমদানির তুলনায় ব্যাপক রপ্তানি ঘাটতি লক্ষ করা গেছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনে বিশেষ করে রপ্তানি খাতের প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে তৈরী পোশাক শিল্পের প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্য।

বর্তমানে দেশে প্রায় এক হাজারের মতো রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্প ইউনিট রয়েছে। এগুলোর প্রায় ৭৫% ঢাকা মহানগরীতে অবস্থিত। অবশিষ্ট ইউনিটগুলোর প্রায় সবই চট্টগ্রাম বন্দর নগরীতে এবং কিছু খুলনা এলাকায় রয়েছে। পোশাক শিল্পে প্রায় ৭ লক্ষ শ্রমিক কর্মরত আছে। এদের শতকরা ৮৫ জনই হল মহিলা। ২০০১-০২ সালে এ শিল্পে বাংলাদেশ প্রায় ১৭,৯৪৭ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছিল, যা মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৫২%। কিন্তু ২০০৭-০৮ সালে পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ প্রায় ২৫,৮৭০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে, যা মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩৭%।

নিচের সারণিতে মোট রপ্তানি আয়ে পোশাক শিল্পের অবদান দেখানো হল।

সারণি ১২ : পোশাক শিল্প হতে রপ্তানি আয়, বাংলাদেশ, ১৯৯৬-২০০৮

সাল	মোট রপ্তানির আয় (কোটি টাকায়)	তৈরী পোশাকের রপ্তানি আয়	মোট রপ্তানির আয়ে তৈরী পোশাকের অংশ (কোটি টাকায়)	টাকা-ডলার গড় বিনিময় হার (শতকরা হার)
১৯৯৬-৯৭	১৮৯০৩.২৯	৯৫৫৬.২৬	৫০.৫৫	৪২.৭০ টাকা
১৯৯৭-৯৮	২৩৫১১.৯১	১২৯২৪.২৭	৫৪.৯৬	৪৫.৪৬ ,,
১৯৯৮-৯৯	২৫৫৮৭.১৪	১৪৩৪৫.৯১	৫৬.০৬	৪৮.০৬ ,,
১৯৯৯-০০	২৮৯৩৮.৩১	১৫৫১০.৫৭	৫৩.৫৯	৫০.৩১ ,,
২০০০-০১	৩৪৮৯৫.৯৩	১৮১৫২.১৪	৫২.০১	৫৩.৯৬ ,,
২০০১-০২	৩৪৩৭৭.৬০	১৭৯৪৬.৮৮	৫২.২০	৫৭.৪৩ ,,
২০০২-০৩	৩৭৯১২.৯২	১৮৮৬৩.৮২	৪৯.৭৬	৫৭.৯০ ,,
২০০৩-০৪	৪৪৮১২.০৮	২০৮৫২.৯৭	৪৬.৫৩	৫৮.৯৪ ,,
২০০৪-০৫	৫৩১৩৩.০৫	২২০৮৮.১২	৪১.৫৭	৬১.৩৯ ,,
২০০৫-০৬	৭০৬০৮.৪১	২৭৪৩৬.৩১	৩৮.৮০	৬৭.১৮ ,,
২০০৬-০৭	৮৪০৬৪.৭৩	৩২১৫৪.১৭	৩৮.২৫	৬৯.০৩ ,,
২০০৭-০৮	৬৯৭১৭.৯২	২৫৮৬৯.৭৪	৩৭.১১	৬৮.৬২ ,,

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ৪৯ (এই সারণিতে আয় ইউ এস ডলারে দেওয়া আছে যাকে টাকা-ডলারের বিনিময় হার দিয়ে গুণ করে টাকায় দেখানো হল)।

বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি পোশাক রপ্তানি হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। তারপরেই রয়েছে জার্মানির স্থান। এরপর যথাক্রমে ফ্রান্স, ইতালি, ব্রিটেন, নেদারল্যান্ডস, কানাডা, বেলজিয়াম, স্পেন ও অন্যান্য দেশ।

বাংলাদেশে তৈরী পোশাক শিল্প বিকাশের অনুকূল পরিবেশ বিদ্যমান। অন্যান্য নিয়ামকের মধ্যে স্বল্প মজুরিতে শ্রমশক্তির সহজলভ্যতা অন্যতম। দেশে এ শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে দক্ষ ও অদক্ষ বিপুল শ্রমশক্তির বিশেষ করে সমাজের নিম্ন আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়–রোজগারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতেও সুফল বয়ে আনছে। পোশাক শিল্পকে এখন বলা হয়, 'বিলিয়ন ডলার' শিল্প।

জনসংখ্যা (Population)

জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বাংলাদেশের সথান নবম। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১১.১৫ কোটি। ভূখণ্ডের তুলনায় এ দেশের জনসংখ্যার ঘনত্বও খুব বেশি। আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২.১৭%।

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ (চিত্র ৯২ ও ৯৩)। আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট, ২০০১ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১২.৯৩ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৮% এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৮৭৬ জন। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৪.০৬ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪১% এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯৫৩ জন (উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক, ২০০৭/এপ্রিল২০০৮, পৃষ্ঠা ৭)। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার অব্যাহত থাকলে জনসংখ্যার ঘনত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে।

যে কোনো দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনসম্পদ হল গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটি দেশে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাকৃতিক সম্পদ থাকা সত্ত্বেও জনশক্তি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকে, তবে কর্মীর অভাবে সে সম্পদ কাজে লাগানো যায় না, ফলে দেশের উন্নতি ব্যাহত হয়। আবার সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা বেশি হলেও তা দেশের জন্য বোঝা বা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত জনশক্তি যে কোনো দেশের জন্যই সম্পদ।

একটি দেশের বা অঞ্চলের জনসংখ্যার ঘনত্ব নির্ভর করে অনেকগুলো নিয়ামকের ওপর। জনসংখ্যা বণ্টনের নিয়ামকগুলোকে মোটামুটি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা– (ক) প্রাকৃতিক নিয়ামক ও (খ) অপ্রাকৃতিক নিয়ামক।

নিচে প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক নিয়ামকগুলো বর্ণনা করা হল।

(ক) প্রাকৃতিক নিয়ামক

১। **ভূপ্রকৃতি:** বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যহীন হওয়াতে মোটামুটি সব জায়গায় জনবসতি আছে। পার্বত্য এলাকা, যেমন রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান এবং সুন্দরবন অঞ্চলে জীবিকা সংস্থান কষ্টসাধ্য হওয়ায় এ দুইটি অঞ্চলে জনবসতির ঘনত্ব খুবই কম। এসব অঞ্চলে ভালো রাস্তাঘাট বা রেল সংযোগ উপযুক্ত পরিমাণে না থাকায় জীবিকা সংস্থান কষ্টকর। অনুন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, বনভূমি ও ভূপ্রকৃতিগত কারণে এ সকল স্থান জনবিরল। সিলেটের পাহাড়ের ঢালে যেখানে চা বাগান আছে সেসব অঞ্চলে চা শিল্পকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছে।

সমতল নদী অববাহিকা অঞ্চল উর্বর পলিমাটি দ্বারা সৃষ্ট। এর ফলে সহজসাধ্য কৃষি আবাদ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে ঘন জনবসতি গড়ে উঠতে দেখা যায়। এসব অঞ্চলের নদীগুলোর নাব্যতা এবং সড়কপথে ও রেলপথে যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা জনজীবনকে আকৃষ্ট করে।

২। **জলবায়ু:** জলবায়ুর প্রভাব জনবসতির বণ্টন নিয়ন্ত্রিত করে। চরমভাবাপন্ন জলবায়ুর চেয়ে সমভাবাপন্ন জলবায়ুতে মানুস বসবাস করতে পছন্দ করে। বাংলাদেশে সব জায়গায় আবহাওয়া প্রায় একই রকম, তবে এর মধ্যে উত্তরাঞ্চলের আবহাওয়ায় শীত–গ্রীষ্মের তারতম্য কিছু বেশি উপলব্ধি হয়। কৃষির অনুকূল জলবায়ু চাষাবাদ এবং শস্য উৎপাদনের সহায়ক বলে সমভূমি মানুষের বসবাসকে আকৃষ্ট করে।

(খ) অপ্রাকৃতিক নিয়ামক

১। **খনিজ সম্পদ:** বাংলাদেশের যেসব অঞ্চলে খনিজ সম্পদ পাওয়া গেছে তাকে ঘিরে জীবিকার সন্ধানে বহু শ্রমিক ও কর্মচারী জড়ো হয়ে এলাকাটিকে ঘনবসতিপূর্ণ করে তুলেছে।
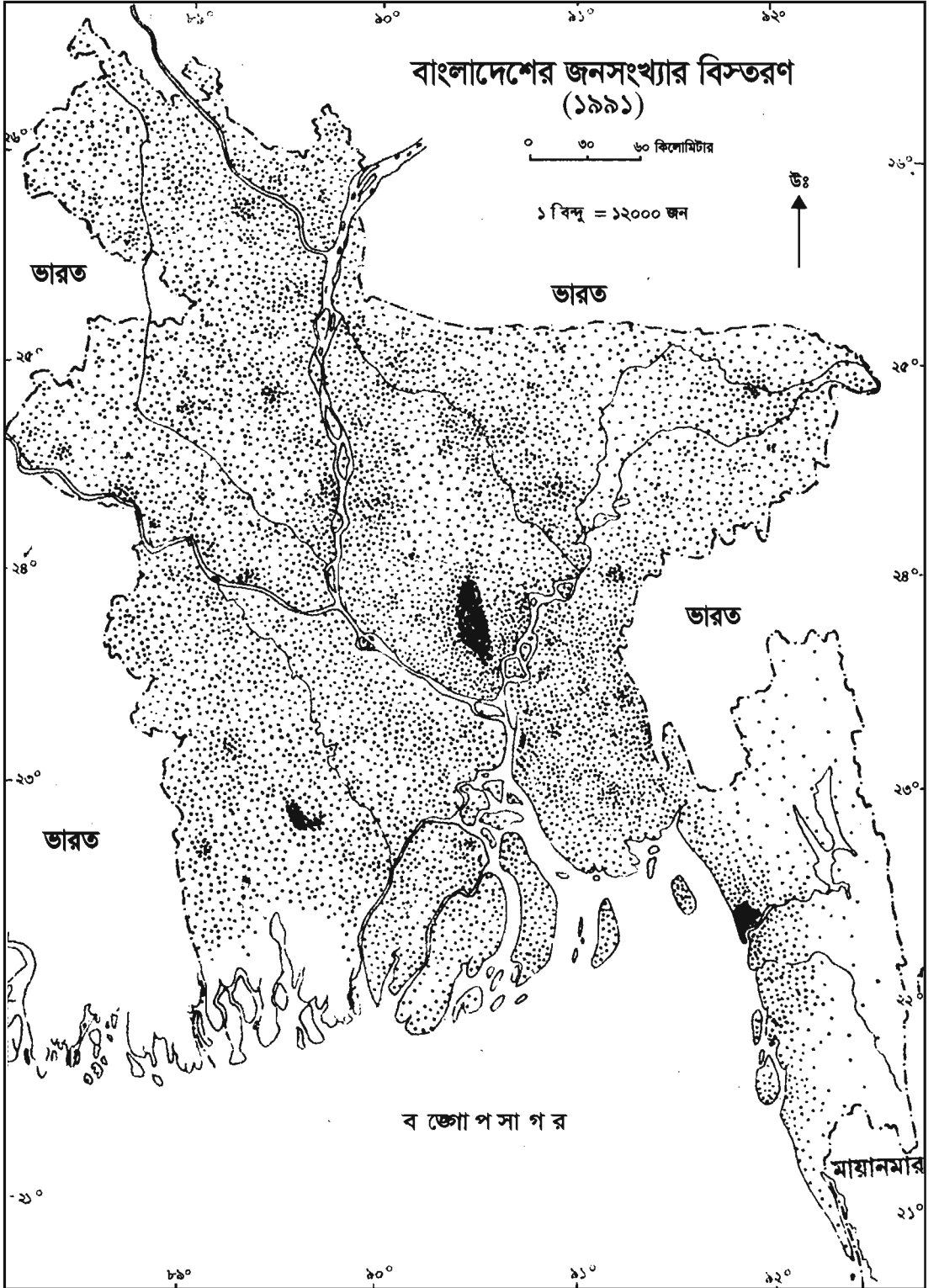
চিত্র ৯২ : বাংলাদেশের জনসংখ্যার বিস্তরণ

২। **শিল্পোন্নতি:** খনিজ সম্পদ, কৃষিজ সম্পদ ও বনজ সম্পদ এবং প্রাণিজ সম্পদকে কেন্দ্র করে জনবসতি গড়ে উঠেছে। এসব স্থানে প্রধান শিল্পের সঙ্গো ক্রমেই বহু প্রকার আনুষঙ্গিক শিল্প স্থাপিত হয়েছে। শিল্প বাণিজ্যের

অগ্রগতি বৃদ্ধি পাওয়াতে প্রধান শিল্পকে ভিত্তি করে এ সমস্ত অঞ্চল জনবহুল স্থানে পরিণত হয়েছে। তেজগাঁও, টঙ্গী, নরসিংদি, খুলনা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে শিল্প শহর গড়ে ওঠায় সামগ্রিকভাবে এ জেলাগুলোতে জনসবতি ঘন।

৩। **পরিবহণ ব্যবস্থা:** সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত হলে, রেলপথের সহজ সংযোগ থাকলে অথবা নদীপথে চলাচলের সুযোগ থাকলে বিভিন্ন অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সহজ হয়। ফলে স্থানটি জনবহুল অঞ্চলে পরিণত হয়।

৪। **সাংস্কৃতিক প্রভাব:** শিক্ষা, সংস্কৃতি আজকের যুগে মানুষকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে। জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ, চিন্তা ও কৃষ্টিগত বন্ধন মানুষকে কাছে টানে, মানুষ সংঘবদ্ধ হয়, পরস্পরের সঙ্গে চিন্তা ও ভাব বিনিময় করে। যেসব অঞ্চলে শিক্ষা-দীক্ষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি প্রভৃতির অনুশীলন ও চর্চার সুযোগ বেশি, সেসব স্থানে জনবসতিও স্বাভাবিক কারণেই বেশি হয়।
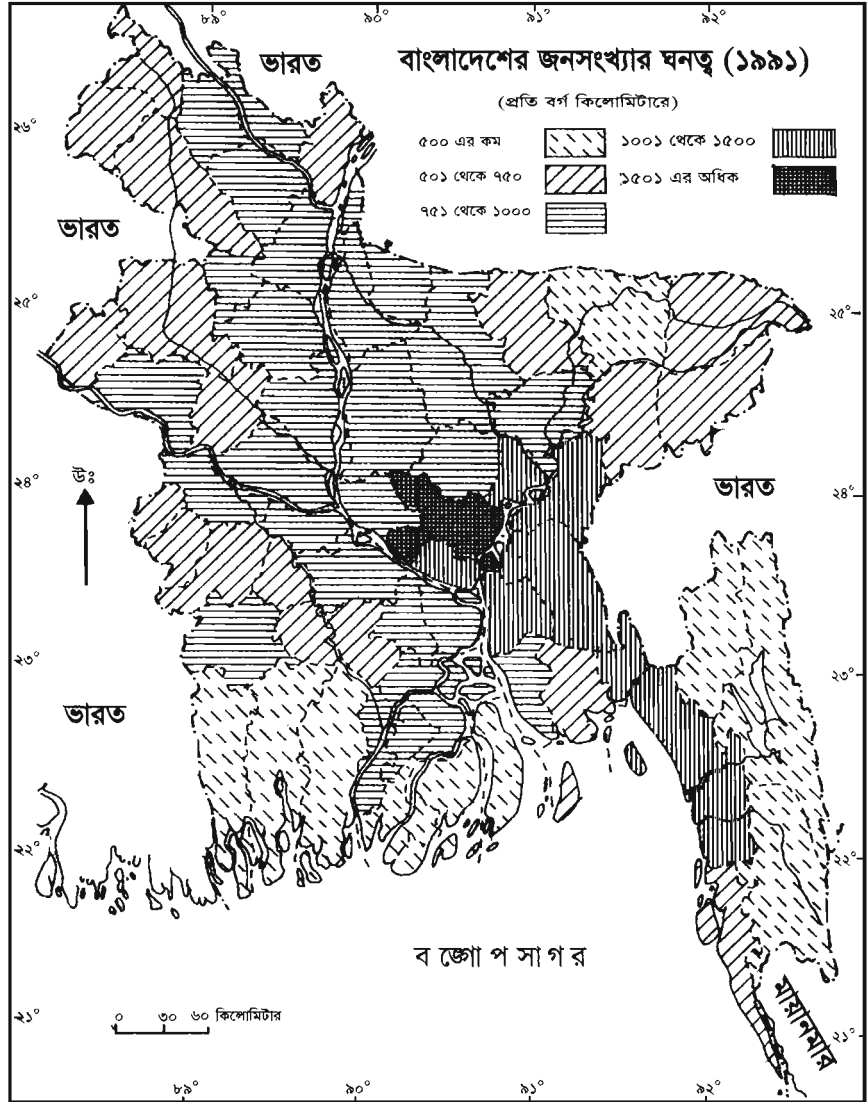
চিত্র ৯৩ : বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব

জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্থিতিশীল করার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বেশি হওয়ায় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। বাংলাদেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে হলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে হবে এবং জনসংখ্যাকে স্থিতিশীল রাখতে হবে। নিম্নোক্ত কারণে বাংলাদেশের জনসংখ্যা স্থিতিশীল রাখা প্রয়োজন।

১। দারিদ্র্য দূর করে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা;
২। খাদ্য ঘাটতি কমানো;
৩। কৃষি জমির ওপর থেকে চাপ কমানো;
৪। বেকার সমস্যার হার কমানো;
৫। শিল্প উন্নয়ন অব্যাহত রাখা;
৬। মূলধন গঠন করা;
৭। নির্ভরশীলতার হার কমিয়ে আনা।

পরিকল্পিতভাবে জনসম্পদ উন্নয়নের জন্য যা করতে হবে তা হল :

১। একটি বাস্তব ও গণমুখী ব্যবস্থার মাধ্যমে জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করা।

২। শিক্ষা প্রসার, কৃষির উন্নতি, শিল্প স্থাপন, চিকিৎসা ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করে গ্রামীণ জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।

৩। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমানো ও পরিকল্পিত পরিবার গঠন করা।

৪। মৌলিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করা।

যাতায়াত ব্যবস্থা (Transport System)

আধুনিক যুগে পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তার ও অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে যাতায়াত ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। যাতায়াত ব্যবস্থাকে অস্বীকার করে সভ্যজগতে কাজকর্ম চালানো প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। যাতায়াত ব্যবস্থা বলতে আমরা বিভিন্ন স্থানে যোগাযোগের মাধ্যমে এবং মালপত্র ও লোক চলাচলের মাধ্যমকে বুঝি। যাতায়াত ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। নিচে বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থার বিবরণ দেওয়া হল।

১। **স্থলপথ:** স্থলপথে যাতায়াত বলতে বোঝায় সড়কপথ ও রেলপথে যাতায়াত। সড়কপথে যাতায়াতের যানবাহন হল বাস, ট্রাক, মোটরগাড়ি, মোটর সাইকেল, রিক্সা, সাইকেল, অটোরিক্সা ইত্যাদি। রেলপথে রেলগাড়ি যানবাহন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(ক) সড়কপথ: অসংখ্য নদীনালা, খাল, বিল, বৃষ্টিপাতের আধিক্য, ভূপ্রাকৃতিক গঠন এবং আর্থিক অসুবিধা প্রভৃতির কারণে বাংলাদেশে সড়ক নির্মাণ ও মেরামত অত্যন্ত ব্যয় সাপেক্ষ। ১৯৪৭ সালে দেশে পাকা রাস্তার পরিমাণ ছিল মাত্র ১,৯৩১.১৭ কিলোমিটার। এর মধ্যে সব ঋতুতে চলাচলের উপযোগী সড়কপথ ছিল মাত্র ৩৮৬.২৩ কিলোমিটার। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭০ সালে সড়কপথের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৮,৬২৩.৪৫ কিলোমিটার। ২০০৬–০৭ সালের তথ্যানুসারে বাংলাদেশে মোট সড়কপথের দৈর্ঘ্য ২,৭২,৪৮৭ কিলোমিটার (চিত্র ৯৪)। এর মধ্যে পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য হল ৮০,৬১৩ এবং কাঁচা রাস্তার দৈর্ঘ্য ১,৯১,৮৭৪ কিলোমিটার (উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক, ২০০৭, সারণি ৮.০২, ৮.০৩)।

বাংলাদেশে সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থার দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় সড়কপথে যান্ত্রিক যানবাহনের পাশাপাশি বহু সংখ্যক পুরাতন আমলের যানবাহন যথা রিক্সা, গরুর গাড়ি, ঠেলাগাড়ি ইত্যাদির প্রচলন রয়েছে। আমাদের সড়কপথের একটি বৈশিষ্ট্য হল, নদীর কারণে সড়কপথগুলো বহু জায়গায় বিচ্ছিন্ন। ফলে সড়কপথে সংযোগ রক্ষার্থে ফেরী সার্ভিসের প্রবর্তন করা হয়েছে। অবশ্য যমুনা বহুমুখী সেতুর মাধ্যমে দেশের পূর্ব ও পশ্চিম অংশকে সংযোগ করা হয়েছে। ফলে সড়কপথে স্বল্প সময়ে পণ্য ও যাত্রী পরিবহণ সহজসাধ্য হয়েছে। দেশের সড়কপথের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ সংস্থা (B.R.T.C) নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়েছে। সড়কপথগুলো জাতীয় সড়ক, আঞ্চলিক সড়ক, জেলা সড়ক, উপজেলা সড়ক এবং গ্রাম সড়ক নামে বিভক্ত। ঢাকা থেকে সড়কপথে যে কোনো জেলা শহরে যাওয়া যায়। তবে অধিকাংশ শহরে যেতে হলে খেয়া পারাপারের প্রয়োজন হয়।

(খ) রেলপথ: ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের সময় বাংলাদেশ রেলপথের পরিমাণ ছিল প্রায় ২,৮৫৭ কিলোমিটার। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশে ২,৭০৬ কিলোমিটার এবং ২০০১-০২ সালে ২,৭৬৮.৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথ ছিল। ২০০৭–০৮ সালে বাংলাদেশে ২,৮৩৫.০৪ কিলোমিটার রেলপথ আছে (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ৪৩, পৃষ্ঠা ৬৩)। এটি বাংলাদেশ রেলপথ নামে পরিচিত। এ রেলপথ তিন ধরনের। যথা- ব্রডগেজ, মিটারগেজ এবং ডুয়েলগেজ (চিত্র ৯৫)।

বাংলাদেশে ১৯৯৫-৯৬ সালে প্রায় ৮৮৪ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথ ছিল। সম্প্রতি বৃদ্ধি পাওয়ায় ৬৫৯.৩৩ কিলোমিটার ব্রডগেজ রেলপথ আছে। এ প্রকারের রেলপথ খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে অবস্থিত। তবে ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর ও রাজবাড়ি জেলায় সামান্য ব্রডগেজ রেলপথ আছে। ১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশে প্রায় ১,৮২২ কিলোমিটার মিটারগেজ রেলপথ ছিল এবং বর্তমানে ১,৮০০.৮৮ কিলোমিটার মিটারগেজ রেলপথ আছে। এর অধিকাংশ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগে অবস্থিত। অপরদিকে জামতৈল থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত ডুয়েলগেজ রেলপথের দূরত্ব হল ৩৭৪.৮৩ কিলোমিটার। বাংলাদেশে ব্রডগেজ, মিটারগেজ ও ডুয়েলগেজ রেলপথ যমুনা নদী দ্বারা দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্বভাবে সম্পূর্ণ মিটারগেজ ও ডুয়েলগেজ রেলপথ এবং পশ্চিমভাগে ব্রডগেজ রেলপথ চালু আছে। বাংলাদেশ রেলপথের পূর্ব ও পশ্চিমাংশের মধ্যে যমুনা নদীর ওপর দিয়ে যমুনা
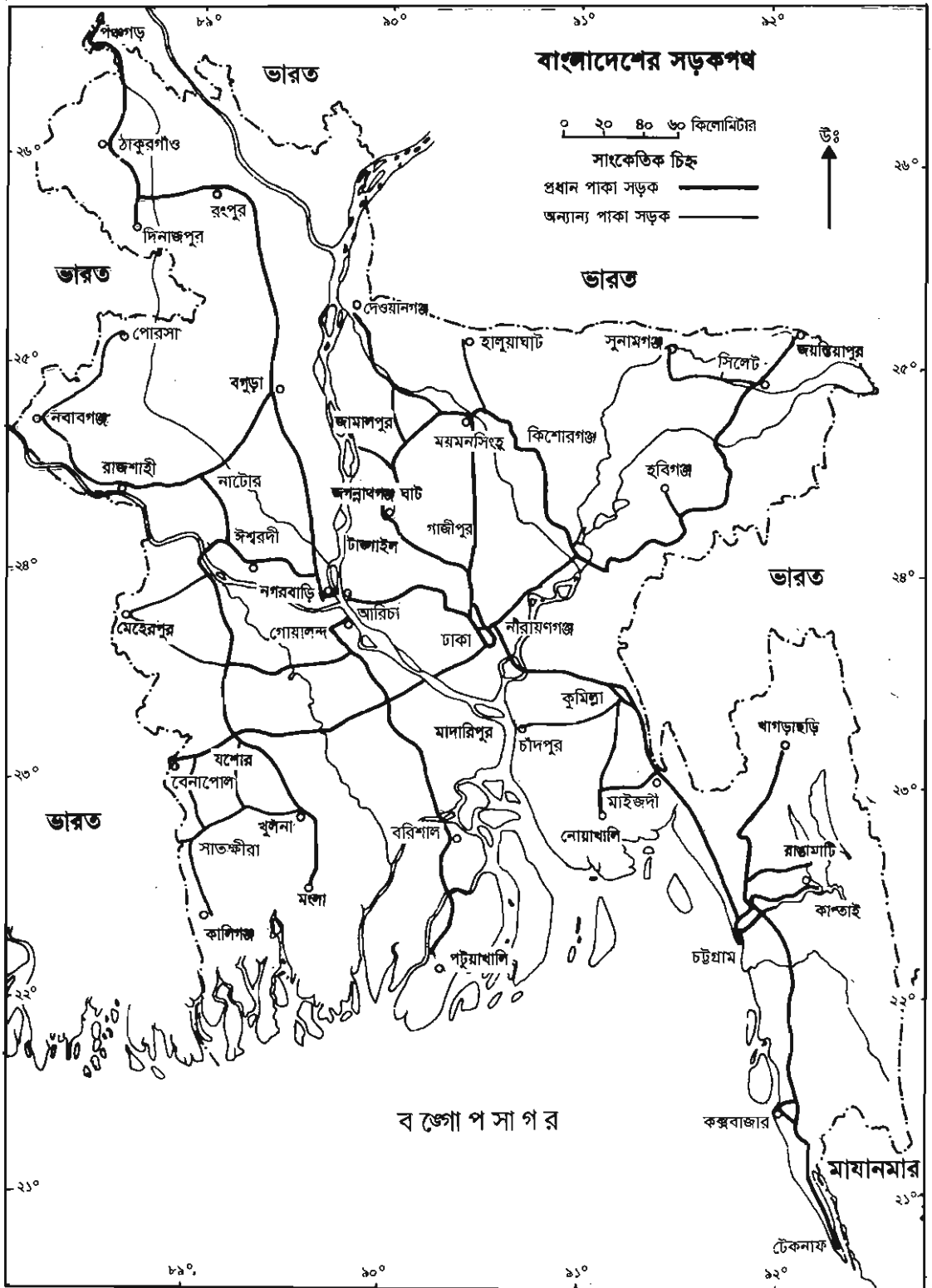
চিত্র ৯৪ : বাংলাদেশের সড়কপথ

বহুমুখী সেতুর মাধ্যমে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে তিস্তামুখ ঘাট ও বাহাদুরাবাদের মধ্যে একটি এবং সিরাজগঞ্জ ও জগন্নাথগঞ্জের মধ্যে একটি রেলওয়ে ফেরী চালু আছে।

রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং বরিশাল, পটুয়াখালি, বরগুনা ব্যতীত দেশের সব জেলাতেই রেলপথ রয়েছে। বাংলাদেশ রেলপথে সর্বমোট ৪৫৪টি রেল স্টেশন আছে (উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক,২০০৭/এপ্রিল ২০০৮; সারণি ৮.০১)। এর মধ্যে লাকসাম, আখাউড়া, ময়মনসিংহ, ভৈরববাজার, ঈশ্বরদী, পার্বতীপুর, সান্তাহার, বোনারপাড়া, কাউনিয়া এবং ঢাকার কমলাপুর জংশনের নাম উল্লেখযোগ্য। রাজধানী ঢাকা থেকে রেলপথ যোগে দেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ শহরে যাতায়াত করা যায়।
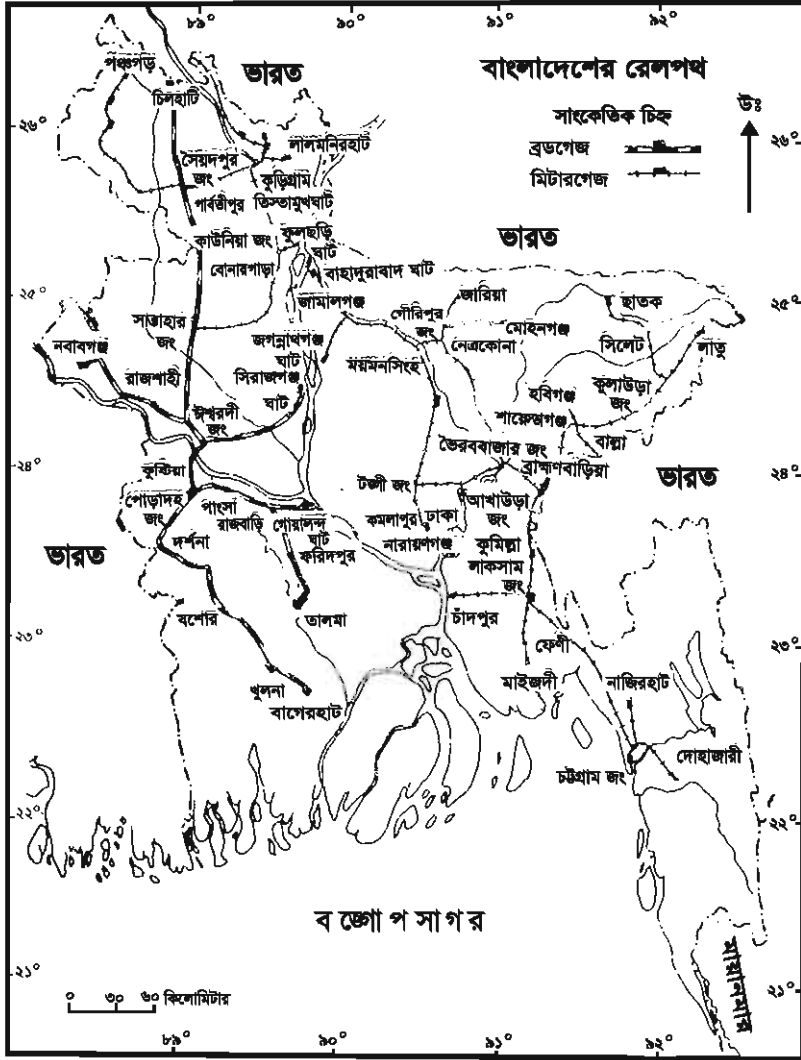
চিত্র ৯৫ : বাংলাদেশের রেলপথ

২। **জলপথঃ** নদীপথে সাধারণত নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার এবং সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচল করে।

(ক) নদীপথঃ এ দেশে রয়েছে অসংখ্য নদী, খাল, বিল, কিন্তু দেশের সবগুলো নদীই নাব্য নয়। বাংলাদেশে প্রায় ৮,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৫,৪০০ কিলোমিটার সারা বছর নৌচলাচলের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে। অবশিষ্ট প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার শুধু বর্ষাকালে ব্যবহৃত হয়। নাব্য নৌপথগুলো অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহণ সংস্থার অধীনে রয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নদীপথে ছোট ছোট নৌকা থেকে আরম্ভ করে লঞ্চ, স্টিমার, সী ট্রাক, ফেরী, ট্যাঙ্কার, কোস্টার প্রভৃতি যানবাহন যাতায়াত করে। সাধারণত দেশের দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চলের নদীগুলো নৌচলাচলের জন্য বেশি উপযোগী। তাই গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দরগুলো এ অঞ্চলে অবস্থিত। এর মধ্যে ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, বরিশাল, ঝালকাঠি ও খুলনা অন্যতম। অন্যান্য নদীবন্দরের মধ্যে ভৈরববাজার, আশুগঞ্জ, মীরকাদিম, আরিচা ও সিরাজগঞ্জের নাম উল্লেখযোগ্য। নদীপথে চলাচলকারী যাত্রীদের মধ্যে ৯৪% টাবুরী নৌকা, গয়না নৌকা ও লঞ্চে এবং ৬% স্টিমারের মাধ্যমে যাতায়াত করে (চিত্র ৯৬)।

(খ) সমুদ্রপথ: সমুদ্রপথ ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পথে সাধারণত ভারি ওজনের ও বৃহৎ আকৃতির পণ্যসামগ্রী বহন করা যায়। সমুদ্রপথে এক দেশ থেকে অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য করা হয়। বাংলাদেশে ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধার জন্য রয়েছে দুইটি সমুদ্রবন্দর। প্রথমটি হল চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং দ্বিতীয়টি হল মংলা সমুদ্রবন্দর।

চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বন্দরকে বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার বলা হয়। এ বন্দরের সঙ্গে রেলপথ ও সড়কপথের যোগাযোগ রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরে অনেকগুলো জেটি রয়েছে এবং প্রায় ২৪টির মতো জাহাজ একই সঙ্গে ভিড়তে পারে। বাংলাদেশের প্রায় ৮০ ভাগ বাণিজ্য এ বন্দরের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়।

মংলা সমুদ্রবন্দর খুলনা শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে পশুর নদীর তীরে অবস্থিত। এ বন্দরের সঙ্গে নদীপথ ও সড়কপথের যোগাযোগ আছে।
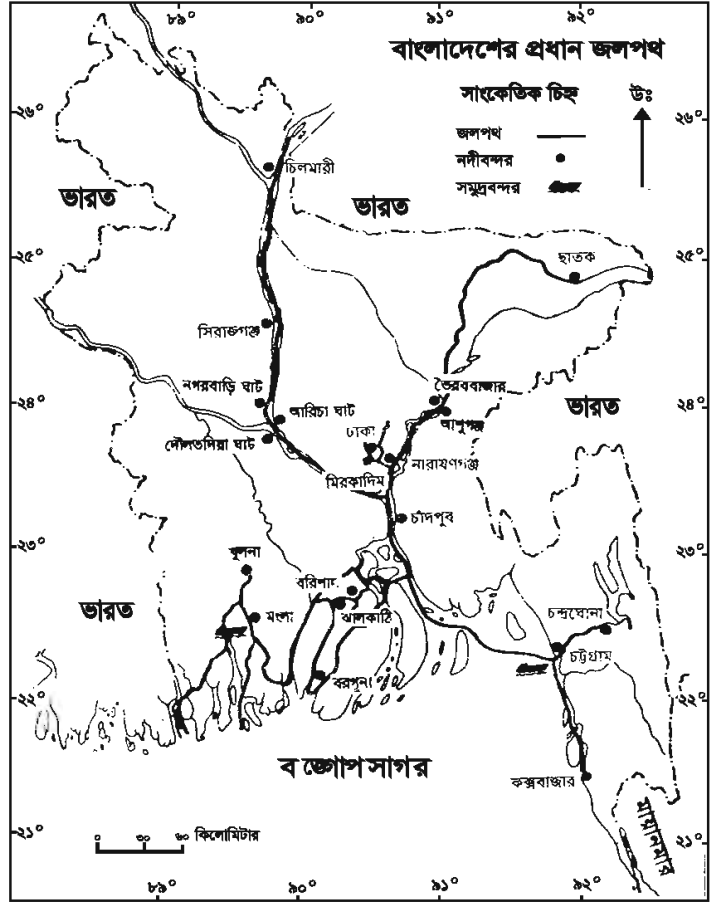
চিত্র ৯৬ : বাংলাদেশের প্রধান জলপথ

৩। **বিমানপথ:** বিমানপথকে আকাশপথও বলা হয়। আধুনিক যুগে বিমানে যাতায়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। দ্রুত যাত্রী ও পণ্য চলাচলের জন্য বিমানই সবচেয়ে ভালো মাধ্যম। বিমানপথ বাংলাদেশের পরিবহণ ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে।

বাংলাদেশে দুই ধরনের বিমান সার্ভিস দেখা যায়। যথা-অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস ও আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিস। দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জেলায় বিমান চলাচল করার নামই হল অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস। অভ্যন্তরীণ বিমান সার্ভিস ব্যবস্থায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম, যশোর, সিলেট, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, সৈয়দপুর, কক্সবাজার, ঠাকুরগাঁও, বরিশাল, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম থেকে যশোর, কক্সবাজার, সিলেট, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। অপরপক্ষে, বাংলাদেশ বিমান যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে চলাচল করে তখন তাকে বাংলাদেশ বিমানের আন্তর্জাতিক সার্ভিস বলা হয়। আন্তর্জাতিক রুটে ঢাকা ও চট্টগ্রাম থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করা যায় (চিত্র ৯৭)।

ঢাকার কুর্মিটোলা একটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এর নাম জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দেশের মধ্যে সবচেয়ে বড় বিমানবন্দর। এর পরেই রয়েছে চট্টগ্রাম শাহ্ আমানত এবং সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। বাংলাদেশ বিমান সংস্থার নাম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এ ছাড়া অধুনা অ্যারো বেঙ্গাল এয়ারলাইন্স অভ্যন্তরীণ সার্ভিস চালু করেছে। এই সার্ভিস ঢাকা ও বরিশালের মধ্যে চালু রয়েছে।

বাণিজ্য (Trade)

মানুষের অভাব ও চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে পণ্যদ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় এবং এর আনুষঙ্গিক কার্যাবলিকে বাণিজ্য বলে। প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত বাণিজ্য দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। প্রাচীনকালে মুদ্রা ব্যবস্থা চালু না থাকার কারণে পণ্য বিনিময়ের মাধ্যমে বাণিজ্যের সূচনা হয়। পণ্যদ্রব্যের আদান-প্রদানের নামই হল বাণিজ্য।

বাণিজ্যের ধরন ও প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে বাণিজ্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য।

অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য: দেশের ভেতরে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যখন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, আদান-প্রদান হয় তখন তাকে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য: এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের পণ্য যখন ক্রয়-বিক্রয় বা আদান-প্রদান হয় তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য আবার দুই ধরনের। যথা-আমদানি বাণিজ্য ও রপ্তানি বাণিজ্য।

আমদানি বাণিজ্য: দেশের চাহিদা মেটানোর জন্য যখন অন্য দেশ থেকে স্বদেশে কোনো পণ্যসামগ্রী আনা হয় তখন তাকে আমদানি বাণিজ্য বলে। উদাহরণস্বরূপ বাংলাদেশকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শিশুখাদ্য, কলকব্জা, খাদ্যসামগ্রী, শিল্পের কাঁচামাল, শিল্পজাত দ্রব্য, ওষুধপত্র, রাসায়নিক দ্রব্য, ভোগ্যপণ্য প্রভৃতি আমদানি করে দেশের ঘাটতি পূরণ করতে হয়। নিচে বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্য সম্বন্ধে বর্ণনা করা হল।
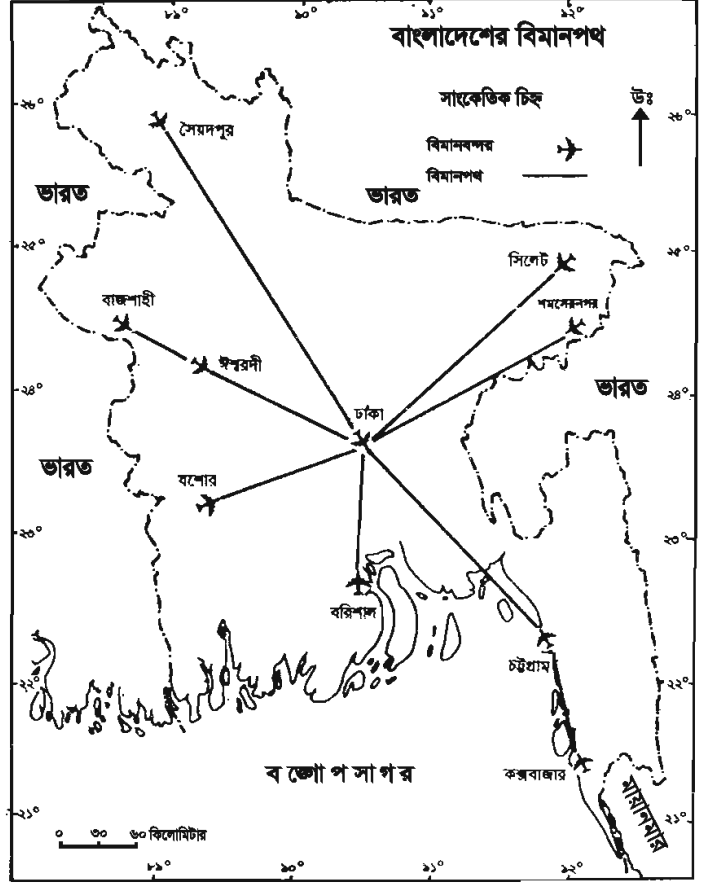
চিত্র ৯৭ : বাংলাদেশের বিমানপথ

অত্যাবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য: খাদ্যদ্রব্যের ঘাটতি পূরণের জন্য চাল, গম, ভোজ্য তেল, চিনি, শিশুখাদ্য, তেলবীজ প্রভৃতি আমদানি করতে হয়।

শিল্পজাত দ্রব্যাদি: শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কয়লা, সিমেন্ট, ডিজেল, পেট্রোল, তুলা, সুতা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, লোহা, ইস্পাত ইত্যাদি প্রধান আমদানি দ্রব্য।

যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল: কৃষিপ্রধান দেশ হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশ কৃষিক্ষেত্রে অনুন্নত। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে কৃষি যন্ত্রপাতি, কীটনাশক ওষুধ, উন্নত বীজ ও সার প্রভৃতির প্রয়োজন। অন্যদিকে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হলে উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, কাঁচামাল ইত্যাদি দরকার। সে জন্য এসব দ্রব্যাদি আমদানি করা হয়।

এগুলো ছাড়াও বাংলাদেশ ওষুধপত্র, কাচ, মোটরগাড়ি, সাইকেল, রেডিও, ঘড়ি, টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, বাস, ট্রাকের চেসিস, রবারজাত দ্রব্য প্রভৃতি পণ্যসামগ্রী বিদেশ থেকে আমদানি করে। বাংলাদেশ পৃথিবীর যে সমস্ত দেশ থেকে সাধারণত পণ্য আমদানি করে থাকে সেগুলো হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত, জাপান, ফ্রান্স, সিঙ্গাপুর, চীন, তাইওয়ান প্রভৃতি।

রপ্তানি বাণিজ্য: স্বদেশের কোনো পণ্য যখন অন্য কোনো দেশে পাঠানো হয় তখন তাকে রপ্তানি বাণিজ্য বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, বাংলাদেশের তৈরী পোশাক, পাট, পাটজাত দ্রব্য, চামড়া ও চা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। নিচে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলোর বর্ণনা দেওয়া হল।

তৈরী পোশাক: বর্তমানে তৈরী পোশাক রপ্তানি করে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। ১৯৯৭-৯৮ সালে ১২,৯২৪ কোটি টাকার, ২০০১-২০০২ সালে ১৭,৯৪৭ কোটি টাকার এবং ২০০৭–০৮ সালে ২৫,৮৭০ কোটি টাকার তৈরী পোশাক রপ্তানি করা হয়।

কাঁচাপাট: বিশ্বের মোট উৎপাদিত পাটের শতকরা ৭৫ ভাগ পাট এক সময় বাংলাদেশে উৎপন্ন হত। যুক্তরাজ্য, ভারত, চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ বাংলাদেশের কাঁচাপাটের প্রধান ক্রেতা।

পাটজাত দ্রব্য: বাংলাদেশ পাটকলে উৎপাদিত চট, থলে, বস্তা, গালিচা প্রভৃতি বিভিন্ন পাটজাত দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের শতকরা ৩৫ ভাগ পাটজাত দ্রব্য থেকে অর্জিত হয়। জাপান, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশে পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করা হয়।

চা: বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চা-এর স্থান ষষ্ঠ। বাংলাদেশে মোট ১৫৮টি চা বাগান আছে। যুক্তরাজ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, নেদারল্যান্ডস, জাপান, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশ চা রপ্তানি করে থাকে।

চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য: বাংলাদেশ প্রতি বছর গরু, মহিষ ও ছাগলের চামড়া রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। বাংলাদেশের চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য চতুর্থ স্থান অধিকারী রপ্তানি দ্রব্য। প্রধানত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, বেলজিয়াম, জাপান প্রভৃতি দেশে বাংলাদেশ চামড়াজাত দ্রব্য রপ্তানি করে।

মাছ ও হিমায়িত খাদ্য: বাংলাদেশ থেকে টাটকা ও শুকনা মাছ, চিংড়ি ও অন্যান্য হিমায়িত খাদ্যসামগ্রী রপ্তানি করা হয়।

সারণি ১৩ : রপ্তানির মাধ্যমে আয়, বাংলাদেশ, ১৯৯৮–২০০৮ (মিলিয়ন ইউ এস ডলার)

পণ্যদ্রব্যাদি	১৯৯৮–৯৯	১৯৯৯–০০	২০০০–০১	২০০১–০২	২০০২–০৩	২০০৩–০৪	২০০৪–০৫	২০০৫–০৬	২০০৬–০৭	২০০৭–০৮
১। তৈরী পোশাক	২৯৮৫	৩০৮৩	৩৩৬৪	৩১২৫	৩২৫৮	৩৫৩৮	৩৫৯৮	৪০৮৪	৪৬৫৮	৩৭৭০
২। পাট ও পাটজাত দ্রব্য	৩৭৬	৩৩৮	২৯৭	৩০৫	৩৩৯	৩২৬	৪০৩	৫০৯	৪৬৮	৩৭১
৩। হিমায়িত খাদ্য	২৭৪	৩৪৪	৩৬৩	২৭৬	৩২২	৩৯০	৪২১	৪৫৯	৫১৫	৪০৯
৪। চামড়া	১৬৮	১৯৫	২৫৪	২০৭	১৯১	২১১	২২১	২৫৭	২৬৬	২১৩
৫। রাসায়নিক দ্রব্য	৭৯	৯৪	৯৭	৬৭	১০০	১২১	১৯৭	২০৬	২১৫	১৩০
৬। চা	৩৯	১৮	২২	১৭	১৫	১৬	১৬	১২	৭	১৪
৭। হস্তশিল্পজাত দ্রব্য	৮	৫	৭	৬	৬	৪	৫	৪	৮	৪
৮। অন্যান্য	১৩৯৫	১৬৭৫	২০৬৩	১৯৮৩	২৩১৭	২৯৯৫	৩৭৯৪	৪৯৯৫	৬০৪১	৫২৪৯
মোট	৫৩২৪	৫৭৫২	৬৪৬৭	৫৯৮৬	৬৫৪৮	৭৬০৩	৮৬৫৫	১০৫২৬	১২১৭৮	১০১৬০

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ৪৯

কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট: এক সময় দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ প্রতি বছর কাগজ ও নিউজপ্রিন্ট রপ্তানি করত। বর্তমানে নিজেদের প্রয়োজনে আমাদের কাগজ আমদানি করতে হয়।

অন্যান্য: অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যগুলো হল ন্যাপথা, ফার্নেস তেল, হস্তশিল্পজাত ও কৃষিজাত দ্রব্য।

বাংলাদেশে আমদানি খাতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয় এবং রপ্তানি খাতে কী পরিমাণ অর্থ উপার্জিত হয় এর একটি তুলনামূলক চিত্র ডান পাশে দেওয়া হল (সারণি ১৪)।

আমাদের পর্যাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে। কিন্তু মূলধন ও প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছে না। এর ফলে আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ভারসাম্য থাকছে না। ২০০১–০২ সালে বাংলাদেশ

সারণি ১৪ : আমদানি ও রপ্তানি, বাংলাদেশ, ১৯৯৬–০৮

(মিলিয়ন ইউ এস ডলার)

সাল	আমদানি ব্যয়	রপ্তানি আয়
১৯৯৬–৯৭	৭১৫২	৪৪২৭
১৯৯৭–৯৮	৭৫২০	৫১৭২
১৯৯৮–৯৯	৮০০৬	৫৩২৪
১৯৯৯–০০	৮৩৭৪	৫৭৫২
২০০০–০১	৯৩৩৫	৬৪৬৭
২০০১–০২	৮৫৪০	৫৯৮৬
২০০২–০৩	৯৬৫৮	৬৫৪৮
২০০৩–০৪	১০৯০৩	৭৬০৩
২০০৪–০৫	১৩১৪৭	৮৬৫৫
২০০৫–০৬	১৪৭৪৬	১০৫২৬
২০০৬–০৭	১৭১৫৭	১২১৭৮
২০০৭–০৮	১৩৩৮৮	১০১৬০

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮, সারণি ৪৯ ও ৫১

৪৯,০৪৫ কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি এবং ৩৪,৩৭৮ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি করেছিল। ২০০৭-০৮ সালে বাংলাদেশ ৯১,৮৬৮ কোটি টাকার দ্রব্য আমদানি করে এবং ৬৯,৭১৭ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি করে (উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮)। বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানি বৃদ্ধি করে আমাদের অর্থনীতিকে উন্নত করার লক্ষ্যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এ জন্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের মান উন্নয়ন, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস, রপ্তানি শুল্ক হ্রাস, পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, রপ্তানিযোগ্য পণ্যের ব্যাপক প্রচার প্রভৃতি অপরিহার্য।

বাংলাদেশ

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

অবস্থান ও আয়তন: বাংলাদেশ ২০°৩৪′ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮′ উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে এবং ৮৮°০১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২°৪১′ পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। এর আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার।

ভূপ্রকৃতি: বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ বদ্বীপ। ভূপ্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হল :

১। টারশিয়ারী যুগের পাহাড়সমূহ: দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের ও উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ এর অন্তর্গত।

২। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ: এ সোপানগুলো হল (ক) বরেন্দ্রভূমি, (খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং (গ) লালমাই পাহাড়।

৩। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি: পাদদেশীয় সমভূমি, প্লাবন সমভূমি, বদ্বীপ সমভূমি ও স্রোতজ সমভূমি এর অন্তর্গত।

নদী: বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলো হল, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা ও কর্ণফুলী।

জলবায়ু: বাংলাদেশের জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু নামে পরিচিত। বাংলাদেশের জলবায়ুকে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ, বার্ষিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের ওপর ভিত্তি করে তিনটি ঋতুতে ভাগ করা হয়েছে। যথা- গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল ও শীতকাল। গ্রীষ্মকালে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং শীতকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১° সেলসিয়াস। বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত সবচেয়ে বেশি হয়।

বনজ সম্পদ: বৃক্ষরাজির সমারোহকে অরণ্য বা বনভূমি বলে। বনভূমি থেকে উৎপাদিত সম্পদকে বনজ সম্পদ বলে। বনভূমির আয়তন দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ১৭ ভাগ। বনভূমিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- (১) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ এবং পাতাঝরা গাছের বনভূমি, (২) ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি ও (৩) স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।

শক্তি সম্পদ: কয়লা, খনিজ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস শক্তির প্রধান উৎস। বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাচুর্য রয়েছে। কয়লা ও খনিজ তেলের পরিমাণ স্বল্প।

পানিবিদ্যুৎ: শক্তির অন্যতম উৎস পানিবিদ্যুৎ। পানির স্রোতের গতিকে কাজে লাগিয়ে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় তাকে পানিবিদ্যুৎ বলা হয়। বাংলাদেশে কাপ্তাই নামক স্থানে কর্ণফুলী পানিবিদ্যুৎ প্রকল্প রয়েছে। সাঙ্গু ও ব্রহ্মপুত্র নামে দুইটি পানিবিদ্যুৎ প্রকল্প নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

তাপবিদ্যুৎ: শক্তির অন্যতম উৎস তাপবিদ্যুৎ। বাংলাদেশে আশুগঞ্জ, ঘোড়াশাল, সিদ্ধিরগঞ্জ, শাহজীবাজার, চট্টগ্রাম, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি স্থানে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে।

খনিজ সম্পদ: বাংলাদেশে খনিজ সম্পদ পর্যাপ্ত নয়। কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, চুনাপাথর, চীনামাটি, তামা, কঠিন শিলা, সিলিকা বালি, পারমাণবিক খনিজ পদার্থ, গন্ধক ইত্যাদি খনিজ সম্পদ বাংলাদেশে রয়েছে। এদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রাচুর্য রয়েছে।

শিল্প: বাংলাদেশের শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পাট শিল্প, বস্ত্র শিল্প, কাগজ শিল্প, সার শিল্প, চিনি শিল্প ও পোশাক শিল্প।

জনসংখ্যা: জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীতে বাংলাদেশের স্থান নবম। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল ১১.১৫ কোটি, প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭৫৫ জন এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.১৭%। ২০০১ অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ১২.৯৩ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪৮% এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৮৭৬ জন। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৪.০৬ কোটি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৪১% এবং প্রতি বর্গ কিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৯৫৩ জন (উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান পকেটবুক, ২০০৭/এপ্রিল ২০০৮)।

যাতায়াত ব্যবস্থা: বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থার শ্রেণীবিভাগ হল :

১। **স্থলপথ:** এর মধ্যে রয়েছে সড়কপথ ও রেলপথ। বাংলাদেশে সড়কপথ ও রেলপথের পরিমাণ যথাক্রমে ২,৭২,৪৮৭ কিলোমিটার ও ২,৮৩৫.০৪ কিলোমিটার।

২। **জলপথ:** এর মধ্যে রয়েছে নদীপথ ও সমুদ্রপথ। বাংলাদেশে ৮,৪০০ কিলোমিটার অভ্যন্তরীণ নাব্য জলপথ রয়েছে। সমুদ্রবন্দর রয়েছে দুইটি-চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর ও মংলা সমুদ্রবন্দর।

৩। **বিমানপথ:** বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বিমান সার্ভিস রয়েছে। প্রধান বিমানবন্দর হল জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর।

বাণিজ্য

প্রধান আমদানি দ্রব্য: খাদ্যসামগ্রী, শিশুখাদ্য, কলকব্জা, শিল্পের কাঁচামাল, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য: তৈরী পোশাক, কাঁচাপাট, পাটজাত দ্রব্য, চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, মাছ ও হিমায়িত খাদ্য এবং হস্তশিল্পজাত দ্রব্য।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

নিচের সারণিতে প্রদত্ত তথ্য ও পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ১ থেকে ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শিল্প	শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কর্মসংস্থান
পাট	৯৯ (বেসরকারি)	১ লক্ষ ১০ হাজার
বস্ত্র	৬৩	১০ লক্ষ
কাগজ	০৬	২ হাজার ৪০৯
সার	০৭	৬ হাজার ৩১৮
পোশাক	৭১৫	৭ লক্ষ (প্রায়)
	মোট=	১৮,১৮,৭৫৭

১। **বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের মধ্যে মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা (%) –**

ক. ৮০% খ. ৮৫%

গ. ৯০% ঘ. ৯৫%

২। **অধিক সংখ্যক পোশাক শিল্প গড়ে ওঠার পেছনে কোন অর্থনৈতিক কারণটি সর্বাধিক ভূমিকা রেখেছে?**

ক. সহজে কাঁচামাল প্রাপ্তি খ. সরকারের বাস্তবসম্মত শিল্পনীতি

গ. সুলভে শ্রমিক প্রাপ্তি ঘ. সহজ শর্তে শিল্পঋণ প্রাপ্তি

৩। **সারণিতে বর্ণিত পাঁচটি শিল্পের মধ্যে পাট শিল্পে কর্মসংস্থানের হার কত?**

ক. ৬.০২ খ. ৬.০৩

গ. ৬.০৪ ঘ. ৬.০৫

৪। বিশ্ববাজারে পাট শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পেয়েছে মূলত–

i. পৃথিবীর অনেক দেশে কৃত্রিম তন্তুজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়া
ii. পাটজাত দ্রব্যের গুণগতমান নিম্ন হওয়া
iii. পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i, ii এবং iii

৫। বাংলাদেশের সুন্দরবন কী ধরনের পরিবেশে গড়ে উঠেছে?

ক. উর্বর সমতল ভূমিতে খ. বেলেমাটি সম্পন্ন সমুদ্র উপকূলে
গ. কাদামাটি বিশিষ্ট সমুদ্র উপকূলে ঘ. নবগঠিত পলল সমভূমি অঞ্চলে

৬। বাংলাদেশের নদীগুলোতে চর জাগার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–

i. নদীর গতিপথের পরিবর্তন
ii. নদীর উৎসস্থলে পরিবর্তন
ii. উপর্যপরি বন্যা পরিস্থিতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii খ. i এবং iii
গ. ii এবং iii ঘ. i, ii এবং iii

রাহেলার পরিবার পদ্মা নদীর পাশে বসবাস করে। আকস্মিক বন্যার ফলে নদীভাঙনের শিকার হয়ে রাহেলার পরিবারসহ আরো বহু পরিবার গৃহহীন হয়ে পড়ে। উল্লিখিত তথ্য এবং বাংলাদেশের বন্যা সম্পর্কে তোমার জানা তথ্যের আলোকে ৭ থেকে ৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

৭। নিম্নের কোনটি পদ্মা নদীতে বন্যা সৃষ্টি হওয়ার কারণ?

ক. গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে পানিপ্রবাহ খ. বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট জোয়ার–ভাঁটা
গ. সিলেট অঞ্চলে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘ. অপর্যাপ্ত নদী খনন

৮। নদীভাঙনের হাত থেকে বাঁচার সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে–

ক. নদীর তীরে গাছ লাগানো খ. নদীর তলদেশে খনন করা
গ. নদীর তীরে বাঁধ দেওয়া ঘ. নদীর গতি প্রবাহ ঠিক রাখা

৯। গৃহহীন রাহেলার পরিবারের জন্য প্রাথমিকভাবে প্রয়োজন–

ক. ত্রাণসামগ্রী খ. নিরাপদ আশ্রয়
গ. চিকিৎসা সেবা ঘ. ঋণ সাহায্য

১০। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় অঞ্চল। এর আয়তন প্রায় ১,২৪,২৬৬ বর্গ কিলোমিটার। উল্লিখিত তথ্যের আলোকে কোন উক্তিটি সঠিক?

ক. দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোর নাব্যতা কম ও ঘন ঘন বন্যা হওয়ার কারণে পরিবাহিত সঞ্চয়নের ফলে প্রতিনিয়ত ভূমিরূপ গঠিত হয়।
খ. পরিবাহিত পলিমাটিগুলো বিক্ষিপ্তভাবে অসংখ্য জলাভূমি ও নিম্নভূমিতে ছড়িয়ে পড়ার কারণে নতুন নতুন ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়।
গ. দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোর প্রশস্ততা অধিক এবং খরস্রোতা হওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত ভূমিরূপ গঠন ক্রিয়াশীল।
ঘ. দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলো জালের মতো সর্বত্র ছড়িয়ে থাকার কারণে জলপথের অধিক ব্যবহার হয়।

১১। গত বিশ বছরে বাংলাদেশে বিদ্যুতের ব্যবহার ব্যাপক বেড়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবহার বৃদ্ধির জন্য নিম্নের কোনটি মূল কারণ?

i. প্রাকৃতিক গ্যাসের যোগান বেড়েছে
ii. শহরমুখী লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে
iii. গ্রামাঞ্চলে শক্তিচালিত যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েছে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii খ. ii এবং iii
গ. i এবং iii ঘ. i, ii এবং iii

১২। বাংলাদেশের শহর এলাকায় জনবসতির অনুপাত গত দশ বছরে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। নিম্নে বর্ণিত কোন কারণে এরূপ বৃদ্ধি ঘটেছে?

ক. শহর এলাকায় বাসস্থানের সহজলভ্যতা
খ. শহর এলাকায় জন্মহার গ্রামের চেয়ে বেশি
গ. অনেক লোকজন গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিত হচ্ছে
ঘ. শহর এলাকায় কম মূল্যে প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যায়

নিম্নের সারণিতে ২০০১ এবং ২০০৫ সালের বাংলাদেশের তিন ধরনের যাতায়াত ব্যবস্থার তথ্য উল্লেখ আছে। সারণির তথ্য এবং বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থার ধরন সম্পর্কিত তোমার জ্ঞানের আলোকে ১৩ থেকে ১৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

যাতায়াতের ধরন	২০০১	২০০৫
প্রধান সড়ক (কিলোমিটার)	২০৭৯৭	২১৫৭১
রেলপথ (কিলোমিটার)	–	–
ব্রডগেজ	১২৪৫	১৪৪৬
ন্যারোগেজ	১৫২৩	১৩৮৯
চলাচলযোগ্য নদীপথ (কিলোমিটার)	–	–
মৌসুমি সময়	–	৫৯৬৮
শুষ্ক সময়	–	৩৮৬৫

উৎস : BRTA, R and H BIWTA, quded in Bangladesh Bureau of Statistics Website.

১৩। উল্লিখিত সারণির আলোকে নিম্নের কোন উক্তিটি সঠিক?

i. ২০০১ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রধান সড়কপথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পেয়েছে
ii. ২০০৫ সালে ব্রডগেজ রেলপথ থেকে ন্যারোগেজ রেলপথের দৈর্ঘ্য বেশি ছিল
iii. এক–তৃতীয়াংশ চলাচলযোগ্য নদীপথ বছরের শুষ্ক মৌসুমে চলাচলের অনুপযোগী থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i এবং ii খ. i এবং iii
গ. ii এবং iii ঘ. i, ii এবং iii

১৪। উল্লিখিত তথ্যানুযায়ী নিম্নের কোন উক্তিটি সঠিক?

ক. নদীপথ থেকে সড়কপথে তিনগুণ বেশি মানুষ চলাচল করে
খ. ২০০১ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে কিছু সংখ্যক ন্যারোগেজ রেলপথ ব্রডগেজ রেলপথে রূপান্তরিত হয়েছে
গ. ২০০১ এবং ২০০৫ সালের মধ্যে নতুন প্রধান সড়কপথ তৈরি করা হয়েছে
ঘ. ২০০৫ সালে বাংলাদেশে চলাচলযোগ্য নদীপথের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় ৯০০০ কিলোমিটার

১৫। বাংলাদেশের যাতায়াত ব্যবস্থা সম্পর্কে নিম্নের কোন উক্তিটি সঠিক?

ক. নদীর কারণে সড়কপথ নির্মাণ ব্যয়বহুল

খ. বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় রেলপথ রয়েছে

গ. নদীপথে যাতায়াতকারী যাত্রীদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই স্টিমারে চলাচল করে

ঘ. চট্টগ্রাম বাংলাদেশের একমাত্র বন্দর

নিম্নে বর্ণিত বাংলাদেশের জলবায়ু সম্পর্কিত মানচিত্রের ভিত্তিতে ১৬ থেকে ১৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
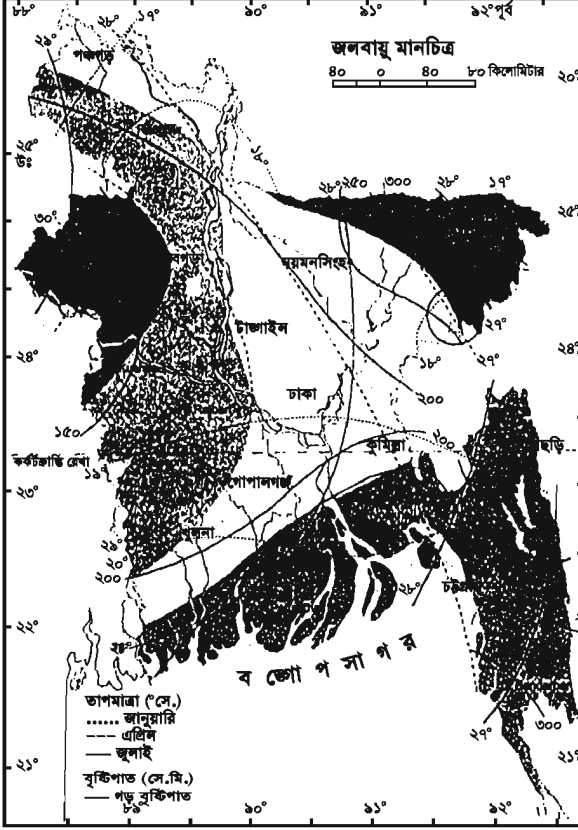
১৬। নিম্নের কোন শহরটি কর্কটক্রান্তি রেখার নিকটবর্তী?

ক. সিলেট খ. কুমিল্লা

গ. কুষ্টিয়া ঘ. গোপালগঞ্জ

১৭। নিম্নের কোন শহরটি বাংলাদেশের উত্তর–পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত?

ক. ময়মনসিংহ খ. চট্টগ্রাম

গ. খাগড়াছড়ি ঘ. সিলেট

১৮। নিম্নের কোন শহরটির গড় তাপমাত্রা জুলাই মাসে ২৮ ডিগ্রি হয়?

ক. নোয়াখালি খ. বরিশাল

গ. পটুয়াখালি ঘ. খুলনা

১৯। মানচিত্রে স্কেল অঙ্কন করে সরাসরি ঢাকা থেকে দিনাজপুরের দূরত্ব দেখাও।

ক. ২৪০ কিলোমিটার খ. ২৮০ কিলোমিটার

গ. ৩২০ কিলোমিটার ঘ. ৩৬০ কিলোমিটার

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের বিভিন্ন অর্থবছরে রপ্তানি আয় এবং আমদানি ব্যয়ের চিত্র নিচের সারণিতে দেখানো হল :

(মিলিয়ন ইউ এস ডলার)

অর্থবছর	রপ্তানি আয়	আমদানি ব্যয়
২০০৪–০৫	৮৬৫৪৫	১৩১৪৭
২০০৫–০৬	১০৫২৬	১৪৭৪৬
২০০৬–০৭	১২১৭৮	১৭১৫৭

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০০৮

ক. রপ্তানি ও আমদানি কোন ধরনের বাণিজ্য?

খ. বিভিন্ন অর্থবছরে রপ্তানি আয়ের সঙ্গে আমদানি ব্যয়ের ঘাটতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. সারণিতে প্রদত্ত তথ্য স্তম্ভ লেখচিত্রে রূপ দাও।

ঘ. বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের এরূপ অবস্থা থেকে উত্তোরণের উপায় কী? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২। প্রদর্শিত মানচিত্র থেকে নিম্নে বর্ণিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
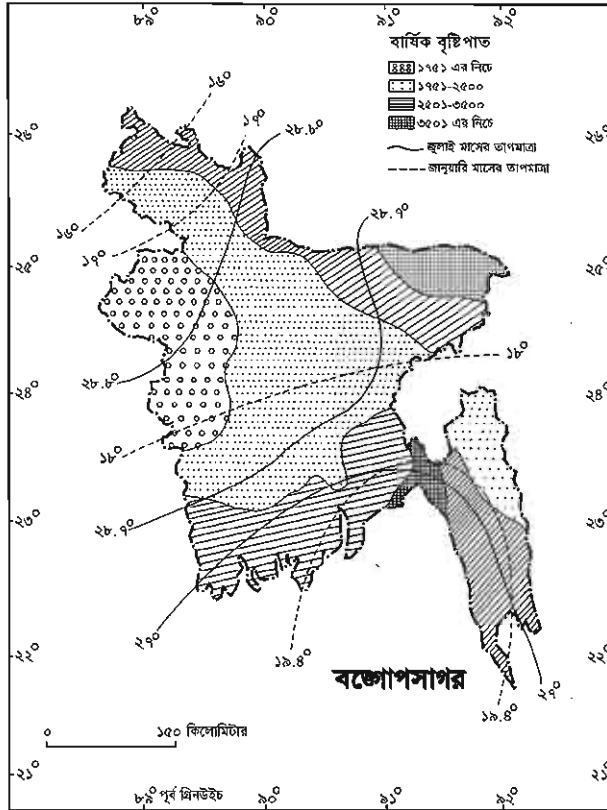
ক. বাংলাদেশের জলবায়ু কী ধরনের?

খ. প্রদর্শিত মানচিত্রে সিলেট অঞ্চলটি কেন সর্বোচ্চ বৃষ্টিবহুল? ব্যাখ্যা কর।

গ. মানচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে বাংলাদেশের জলবায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলো শনাক্ত করে এদের বর্ণনা দাও।

ঘ. বিশেষ একটি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন, এ যুক্তির স্বপক্ষে তোমার মতামত দাও।

৩। নিচের সারণিতে ২০০০–০১ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের রপ্তানির তথ্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

পণ্যদ্রব্যাদি / দেশসমূহ	হিমায়িত খাদ্য	চা	রাসায়নিক দ্রব্য	চামড়া	কাঁচামাল	পাটজাত দ্রব্য	নীটওয়ার	তৈরী পোশাক	অন্যান্য	মোট
বিশ্বের অন্যান্য দেশ	৩৬৩	২২	৯৭	২৫৪	৬৭	২৩০	১৪৯৬	৩৩৬৪	৫৩৫	৬৪৬৭
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	১৩২	০	১	১	০	১৩	৪৬৭	১৫৪০	৩৪৭	২৫০১
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শতকরা অংশ	৩৬	০	১	০	০	৬	৩১	৪৬	৬৪	৩৯

ক. ২০০০–০১ সালে বিশ্বের অন্যান্য দেশে বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল কোনটি?

খ. রপ্তানি বাণিজ্যে তৈরী পোশাক গুরুত্বপূর্ণ কেন?

গ. সারণিতে প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত কর।

ঘ. বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ কীভাবে সম্ভব তোমার মতামত দাও।

৪। নিম্নের প্রদত্ত মানচিত্র থেকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
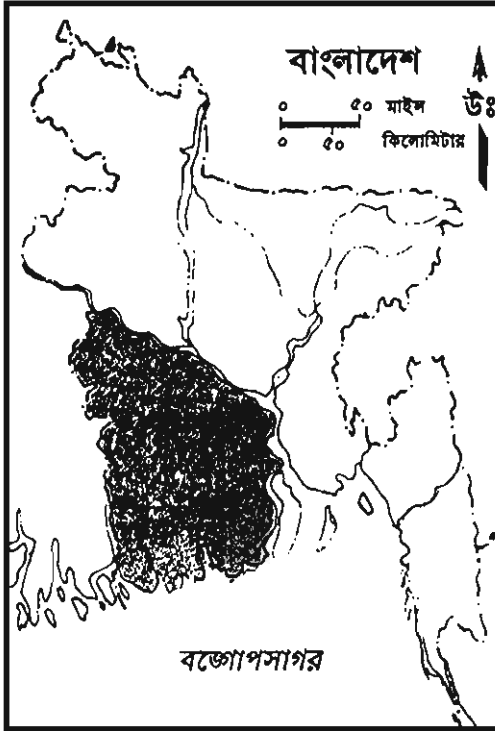
ক. মানচিত্রে প্রদর্শিত প্রধান নদীগুলো একত্রিত হয়ে কোন নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে?

খ. বাংলাদেশের প্রধান নদীগুলোর গতিপথ দক্ষিণমুখী কেন?

গ. উপরের মানচিত্রের একটি প্রতিরূপ মানচিত্র অঙ্কন করে পদ্মা নদীর গতিপথ চিহ্নিত কর।

ঘ. মানচিত্রে ছায়াপাতকৃত ভূমিরূপ গঠনে নদীর ভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

৫। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানিকারক দেশ। এ দেশ পৃথিবীর প্রায় এক–চতুর্থাংশ পরিমাণ পাট উৎপাদন করে থাকে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে কৃত্রিম তন্তুজাত দ্রব্য ব্যবহার শুরু হওয়ায় বিশ্বের বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য ১৯৯০ দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পাট শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ এবং রপ্তানির মূল্য শতকরা প্রায় ১০ ভাগ–এর অধিক কমেছে। তন্তুজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমানোর লক্ষ্যে সরকার ২০০২ সালে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার আংশিকভাবে নিষিদ্ধ করেছে।

ক. বাংলাদেশ কাঁচাপাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি করে এশিয়ার এমন একটি দেশের নাম লেখ।

খ. বিশ্বব্যাপী পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের ব্যবহার কমে যাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে দেশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে গড়ে ওঠা পাট শিল্পগুলোর অবস্থান চিহ্নিত কর।

ঘ. পাট শিল্প বিকাশে সরকারের পলিথিন ব্যাগ আংশিকভাবে নিষিদ্ধকরণ পদক্ষেপটি মূল্যায়ন কর।

চতুর্থ খণ্ড

ব্যবহারিক ভূগোল

প্রথম অধ্যায়

স্কেল তৈরি

DRAWING OF SCALES

স্কেলের সংজ্ঞা: মানচিত্রে দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং ভূমিতে ঐ দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী প্রকৃত দূরত্বের অনুপাতকে 'স্কেল' বলে। যেমন, মানচিত্রে দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব ১ সেন্টিমিটার ভূমিতে ঐ দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী প্রকৃত দূরত্ব ১০ কিলোমিটার। সুতরাং এ মানচিত্রটি ১ সেন্টিমিটারে ১০ কিলোমিটার স্কেলে অঙ্কন করা হয়েছে। এখানে ১০ কিলোমিটার-এর সঙ্গে ১ সেন্টিমিটার-এর অনুপাতই স্কেল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ১ সেন্টিমিটার = ১০ কিলোমিটার ভঙ্গিতে লিখবার রীতি গাণিতিক হিসাব অনুসারে সঠিক নয়।

ঠিক আয়তন অনুসারে কোনো এলাকার অথবা কোনো দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্দিষ্ট আয়তনের কাগজে দেখানো সম্ভব না। এ জন্য প্রকৃত আয়তন বা দূরত্ব পরিমাপ করে কাগজের মাপ ও প্রয়োজন অনুসারে তা নির্দিষ্ট অনুপাতে ছোট করে অঙ্কন করা হয়।

মানচিত্রে স্কেল নির্দেশের পদ্ধতি: মানচিত্রে তিনটি পদ্ধতিতে স্কেল নির্দেশ করা হয়।
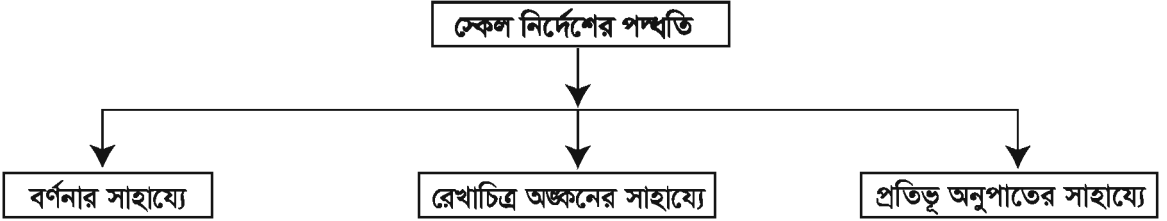
(ক) বর্ণনার সাহায্যে: আমরা বর্ণনা বা কথার মাধ্যমে মানচিত্রের স্কেল প্রকাশ করে থাকি। যেমন, ১ ইঞ্চিতে ৪ মাইল, ১৬ ইঞ্চিতে ১ মাইল, ১ সেন্টিমিন্টারে ১ হেক্টোমিটার। এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথম ১ সংখ্যাটি (তা ইঞ্চি বা সেন্টিমিটার যাই হোক না কেন) মানচিত্রের দূরত্ব এবং দ্বিতীয় সংখ্যাটি (মাইল, গজ, কিলোমিটার বা হেক্টোমিটার যাই হোক না কেন) ভূমির প্রকৃত দূরত্ব প্রকাশ করছে।

(খ) রেখাচিত্রের সাহায্যে: কোনো একটি রেখাকে প্রয়োজনীয় ইঞ্চি ও ইঞ্চির ক্ষুদ্র অংশে বা সেন্টিমিটার-এর ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে প্রতি ভাগের মান লিখে মানচিত্রের স্কেল প্রকাশ করা যায়। যেমন, ১ সেন্টিমিটার-এ ১০ কিলোমিটার বর্ণনাটিকে রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হলে প্রথমে ৫ সেন্টিমিটার একটি রেখা নিয়ে একে ৫ ভাগ করতে হবে; এর প্রতিটি ভাগ ১০ কিলোমিটার। বাম পাশে ১টি ঘর ছেড়ে দিয়ে যথাক্রমে ০, ১০, ২০, ৩০, ৪০ লিখে এর পাশে কিলোমিটার লিখতে হবে। বাম পাশের ঘরটিকে আবার ১০ ভাগে ভাগ (কারণ ১০ কিলোমিটার-এর ক্ষুদ্র ভাগ দেখাতে হবে) করে প্রতিটি ক্ষুদ্র ভাগের মান লিখতে হবে (চিত্র ৯৮ ক) যেমন,
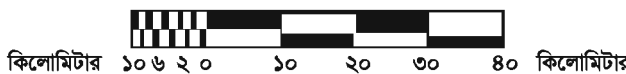
চিত্র ৯৮ (ক) : রৈখিক স্কেল

ইঞ্চি স্কেলের ক্ষেত্রে একই নিয়ম অনুসরণ করতে হবে (চিত্র ৯৮ খ)। এ ক্ষেত্রে ৩ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি রেখা নিয়ে একে প্রথমে তিন ভাগ করতে হবে এবং বাম দিকের একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে প্রতি ঘরের মান লিখতে হবে। বাম পাশের ঘরটিকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করতে হবে। ১ ইঞ্চিতে ৪ মাইল বর্ণনাটিকে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করার সময় প্রথমে ৩ ইঞ্চি একটি রেখা নিয়ে একে তিন ভাগ করতে হবে। বাম দিকের একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে যথাক্রমে ০, ৪, ৮ মাইল লিখতে হবে। বাম পাশের ঘরটিকে আবার ৪ ভাগে (কারণ ১ ইঞ্চিতে ৪ মাইল) ভাগ করতে হবে। শূন্য থেকে বাম দিকে যথাক্রমে ১, ২, ৩, ৪ মাইল লিখতে হবে। যেমন,

চিত্র ৯৮ (খ) : রৈখিক স্কেল

(গ) প্রতিভূ অনুপাতের সাহায্যে: বিভিন্ন দেশের দূরত্ব পরিমাপের জন্য স্বতন্ত্র একক ব্যবহার করা হয়। এরূপ এক দেশের এককের মাধ্যমে মানচিত্রে স্কেল প্রকাশ করা হলে ভাষাগত কারণে তা অন্য দেশের লোকের কাছে ব্যবহার যোগ্য হবে না। এ অসুবিধা দূর করার জন্য প্রতিভূ অনুপাত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। ইংরেজিতে একে Representive Fraction বা সংক্ষেপে R. F. এবং বাংলায় সংক্ষেপে প্র. অ. বলা হয়। ভগ্নাংশের আকারে দেওয়া স্কেলটির লব রাশি মানচিত্রের দূরত্ব এবং হর রাশি একই এককে ভূমির দূরত্ব প্রকাশ করে।

উদাহরণস্বরূপ ১ সেন্টিমিটারে ১ মিটার বর্ণনায় প্রকাশিত স্কেলটিকে প্রতিভূ অনুপাতে প্রকাশ করতে হলে মিটারটিকে সেন্টিমিটারে আনতে হবে এবং উভয় সংখ্যার মধ্যে অনুপাত চিহ্ন (ঃ) দিতে হবে। ১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার। সুতরাং লব রাশি ১ এবং হর রাশি ১০০। এ ক্ষেত্রে স্কেলটি ১ ঃ ১০০ বা ১/১০০ হবে। অর্থাৎ এর অর্থ মানচিত্রের দূরত্ব যখন ১ সেন্টিমিটার তখন ভূমির দূরত্ব ১০০ সেন্টিমিটার।

আবার ব্রিটিশ পদ্ধতিতে ১ ঃ ৩৬ প্র. অ. দেওয়া থাকলে বুঝতে হবে মানচিত্রের দূরত্ব যখন ১ ইঞ্চি তখন ভূমির দূরত্ব ৩৬ ইঞ্চি = ১ গজ। অতএব বর্ণনায় ১ ইঞ্চিতে ১ গজ। বর্ণনায় যখন ১ ইঞ্চিতে ১ মাইল, তখন প্র. অ. ১ ঃ ৬৩৩৬০ যেহেতু ১ মাইল = ৬৩৩৬০ ইঞ্চি।

স্কেল প্রকাশের মাধ্যম পরিবর্তন

বর্ণনা থেকে প্রতিভূ অনুপাতে

১। ১ ইঞ্চিতে ২ গজ। ১ গজ = ৩৬ ইঞ্চি।

∴ ২ গজ = ৩৬ × ২ = ৭২ ইঞ্চি। ∴ প্র. অ. ১ ঃ ৭২

২। ৩ ইঞ্চিতে ৯ মাইল। ∴ ১ ইঞ্চিতে $\frac{৯}{৩}$ মাইল = ৬৩৩৬০ ইঞ্চি।

৩ মাইল = ৬৩৩৬০ × ৩ = ১৯০০৮০ ইঞ্চি, ∴ প্র. অ. ১ ঃ ১৯০০৮০

৩। ১ ইঞ্চিতে ১ ফার্লং। ১ ফার্লং = ৭৯২০ ইঞ্চি (যেহেতু ৮ ফার্লং-এ ১ মাইল ∴ $\frac{৬৩৩৬০}{৮}$ = ৭৯২০)

∴ ১ ইঞ্চিতে ৭৯২০ ইঞ্চি, ∴ প্র. অ. ১ ঃ ৭৯২০

৪। ১ সেন্টিমিটারে ২ কিলোমিটার। আমরা জানি ১০০০০০ সেন্টিমিটার = ১ কিলোমিটার

২ কিলোমিটার = ১০০০০০ × ২ = ২০০০০০ সেন্টিমিটার, প্র. অ. ১ ঃ ২০০০০০

৫। ১ সেন্টিমিটারে ৫ মিটার। আমরা জানি ১০০ সেন্টিমিটার = ১ মিটার, ∴ ১ সেন্টিমিটারে ১০০ সেন্টিমিটার

∴ ৫ মিটার = ১০০ × ৫ = ৫০০ সেন্টিমিটার, ∴ ১ সেন্টিমিটার = ৫০০ সেন্টিমিটার

∴ প্র. অ. ১ ঃ ৫০০

প্রতিভূ অনুপাত থেকে বর্ণনায়

১। প্র. অ. ১ ঃ ৬৩৩৬০০; এখানে দেয় প্রতিভূ অনুপাতটি ব্রিটিশ পদ্ধতিতে পরিবর্তন সহজ।

আমরা জানি ৬৩৩৬০ ইঞ্চি = ১ মাইল ∴ ৬৩৩৬০০ ÷ ৬৩৩৬০ = ১০ মাইল। ∴ বর্ণনা ১ ইঞ্চিতে ১০ মাইল।

২। প্র. অ. ১ ঃ ১০০০০; এখানে দেয় প্রতিভূ অনুপাতটি মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা সহজ।

আমরা জানি ১০০০০ সেন্টিমিটার = ১ হেক্টোমিটার। ∴ ১০০০০ ÷ ১০০০০ = ১ হেক্টোমিটার।

∴ বর্ণনা ১ সেন্টিমিটারে ১ হেক্টোমিটার।

৩। প্র. অ. ১ ঃ ১০০; এখানে দেয় প্রতিভূ অনুপাতটি মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করা সহজ।

আমরা জানি ১০০ সেন্টিমিটার = ১ মিটার ∴ ১০০ ÷ ১০০ = ১ মিটার ∴ বর্ণনা ১ সেন্টিমিটারে ১ মিটার।

৪। প্র. অ. ১ ঃ ৭৯২০০; আমরা জানি ৭৯২০ সেন্টিমিটার = ১ ফার্লং ∴ ৭৯২০০ ÷ ৭৯২০ = ১০ ফার্লং।

∴ বর্ণনা ১ ইঞ্চিতে ১০ ফার্লং।

৫। প্র. অ. ১ ঃ ১২০; আমরা জানি ১ ইঞ্চিতে ১ ফুট ∴ ১২০ ÷ ১২ = ১০ ফুট ∴ বর্ণনা ১ ইঞ্চিতে ১০ ফুট।

স্কেলের শ্রেণীবিভাগ: স্কেল বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। তবে সচরাচর সরল স্কেল, কর্ণীয় স্কেল, তুলনামূলক স্কেল, সময় নির্দেশ স্কেল এবং ভার্নিয়ার স্কেল ব্যবহার করা হয়।

সরল রৈখিক স্কেল: ইংরেজি Simple scale, Linear scale, Plain scale এর বাংলা প্রতিশব্দ যথাক্রমে সরল স্কেল, রৈখিক স্কেল, সাধারণ স্কেল। এ তিনটি শব্দ একই স্কেল বুঝবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে শ্রুতিমধুর শব্দ বিবেচনা করে সচরাচর 'সরল স্কেল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

সরল স্কেল অঙ্কন: নির্দিষ্ট মাপের একটি রেখা নিয়ে একে প্রয়োজনীয় বড় বড় কয়েকটি ভাগে ভাগ করা এবং বাম দিকে একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে এগুলোর মান লেখা হয় এবং বাম পাশের ঘরটিকে প্রয়োজনীয় কয়েকটি ছোট ছোট ঘরে ভাগ করে এগুলোর মান লেখা হয়। স্কেলে বড় বড় ভাগগুলোকে 'প্রথম পর্যায়ের' ভাগ এবং বাম পাশের ঘরকে ছোট ছোট অংশে ভাগ করাকে 'দ্বিতীয় পর্যায়ের' ভাগ বলা হয়। এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, স্কেলের দৈর্ঘ্য কত হবে এবং তা কয় ভাগে ভাগ করতে হবে তা দেয় প্রশ্নের ওপর নির্ভর করে।

স্কেলের দৈর্ঘ্য: স্কেল যে কোনো দৈর্ঘ্যে অঙ্কন করা যায়। তবে কাগজের আকৃতি এবং সৌন্দর্যের বিষয়টি বিবেচনা করে স্কেল অঙ্কন করা প্রয়োজন। সাধারণত শ্রেণীকক্ষের ব্যবহারিক খাতায় স্কেলের দৈর্ঘ্য ৪.৫ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চি অথবা ১২ সেন্টিমিটার থেকে ১৫ সেন্টিমিটার এর মধ্যে রেখে অঙ্কন করা হয়। ফলে তা খাতার সঙ্গে মানানসই হয় এবং দেখতে ভালো হয়, এর ছোট বা বড় হলে দৃষ্টিকটু হয়। বৃহৎ স্কেলের ক্ষুদ্র আকৃতির মানচিত্রগুলোতে প্রায়ই ৫ বা ৬ সেন্টিমিটার অথবা ২ বা ৩ ইঞ্চি লম্বা স্কেল অঙ্কন করা হয়। সরু স্কেল ভালো দেখা যায়। এ জন্য সরু করে স্কেল অঙ্কন করতে হয়। প্রায় ক্ষেত্রে সরল স্কেল ০.২ ইঞ্চি বা তারও কম মাপের নিয়ে একে দুই ভাগ করা হয়।

রেখা বিভক্তকরণ: একটি রেখাকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করার নিয়ম নিচে দেখানো হল।

মনে করি, একটি রেখাকে প্রথম পর্যায়ে ৪ ভাগ এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৫ ভাগ করতে হবে।

(ক) ডিভাইডারের সাহায্যে ছোটবড় বিভিন্ন মাপ নিয়ে কয়েক বার চেষ্টা করলে রেখাটি ভাগ করা সম্ভব হবে।

(খ) স্কেলটি যদি ৪.৫ ইঞ্চি লম্বা হয় তবে ৪.৫ ÷ ৪ = ১.১২৫ ইঞ্চি। এখন ডিভাইডারের সাহায্যে ১.১২৫ ইঞ্চির পরিবর্তে ১.১৩ ইঞ্চি মাপ নিলে রেখাটি ভাগ করা সম্ভব হবে।

(গ) প্রথমে যে কোনো মাপের AB একটি রেখা নেওয়া হল। এ রেখাটিকে প্রথম পর্যায়ে ৪ ভাগ করতে হবে। রেখার বাম

প্রান্ত A থেকে ২৪° বা ৩০° কোণ বিশিষ্ট ∠BAC অঙ্কন করা হয়। স্কেলের সাহায্যে AC কৌণিক রেখাটিকে ১ ইঞ্চি পরিমাপের ৪ ভাগ করা হল। ভাগগুলো যথাক্রমে d, e, f, c এরপর CB যোগ করা হল। সেট স্কোয়ার (জ্যামিতি বাক্সের দুইটি ত্রিভুজ) এর সাহায্যে d, e, f বিন্দু থেকে BC রেখার সমান্তরাল রেখা অঙ্কন করলে AB রেখাটি প্রথম পর্যায়ে ৪ ভাগে বিভক্ত হবে। বাম দিকে ১ ঘর ছেড়ে AB রেখার ০, ১, ২, ৩ লেখা হল। দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগের জন্য A থেকে ওপরের দিকে এবং ০ থেকে নিচের দিকে সমকোণে রেখা অঙ্কন করা হল। রেখা দুইটি ইচ্ছানুযায়ী সমান ৫ ভাগে ভাগ করা হল। এগুলো AB রেখার উভয় দিকে ১, ২, ৩, ৪, ৫। উর্ধ্বরেখার ৫, ৪, ৩, ২, ১, ০ নিচের রেখার ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫ এর সঙ্গে মিলিত করলে বাম পাশের ঘরটি সমান ৫ ভাগে বিভক্ত হবে। ০ থেকে বাম দিকে ক্রম বৃদ্ধি হারে ১, ২, ৩, ৪, ৫ লিখতে হবে (চিত্র ৯৯)।
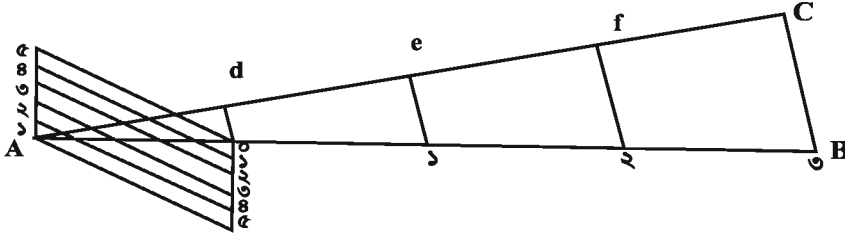
চিত্র ৯৯ : রেখা বিভক্তকরণ

সরল রৈখিক স্কেল অঙ্কন পদ্ধতি: সরল রৈখিক স্কেল অঙ্কন পদ্ধতি সহজ করার জন্য নিচে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

উদাহরণ ১ : ৫ ইঞ্চিতে ৫ মাইল; একটি সরল স্কেল অঙ্কন কর।

অঙ্কন পদ্ধতি: ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি রেখা নিয়ে একে ৫ ভাগ করা হল। প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি ভাগ ১ মাইল করে হবে। বাম পাশে একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে ডান দিকে যথাক্রমে ০, ১, ২, ৩, ৪ লেখা হল। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাম পাশের ঘরটিকে ৮ ভাগ (যেহেতু ৮ ফার্লং = ১ মাইল) করা হল। স্কেলের ডান পাশে মাইল ও বাম পাশে ফার্লং লেখা হল। ১ ইঞ্চিতে ৫ মাইল ∴ ৬৩৩৬০ × ৫ = ৩১৬৮০০ ∴ প্র. অ. ১ ঃ ৩১৬৮০০ (চিত্র ১০০ ক)।
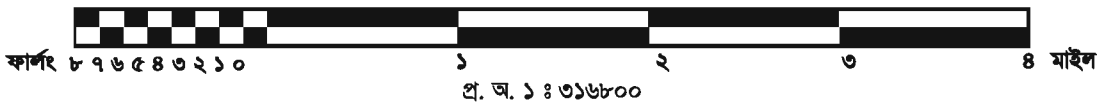
চিত্র ১০০ (ক) : রৈখিক স্কেল

উদাহরণ ২ : ১ সেন্টিমিটারে ১ কিলোমিটার; একটি সরল স্কেল অঙ্কন করতে হবে।

১ সেন্টিমিটারে ১ কিলোমিটার	যেহেতু ১ কিলোমিটার = ১০০০০০ সেন্টিমিটার
১২ সেন্টিমিটারে ১ কিলোমিটার	∴ প্র. অ. ১ ঃ ১০০০০০

অঙ্কন পদ্ধতি: ১২ সেন্টিমিটার দীর্ঘ একটি রেখা অঙ্কন করে একে প্রথম পর্যায়ে ১২ ভাগ করা হল। বাম পাশে একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য ভাগে যথাক্রমে ০, ১, ২, ... ১১ লিখে ডান পাশে কিলোমিটার লেখা হল।

১ কিলোমিটার = ১০ হেক্টোমিটার; সুতরাং বাম পাশের ঘরটিকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০ ভাগ করা হল। ০ থেকে বাম দিকে ১, ২, ৩, ... ১০ লিখে এর বাম পাশে হেক্টোমিটার লেখা হল। স্কেলের নিচে মাঝামাঝি স্থানে প্র. অ. ১ ঃ ১০০০০০ লেখা হল (চিত্র ১০০ খ)।
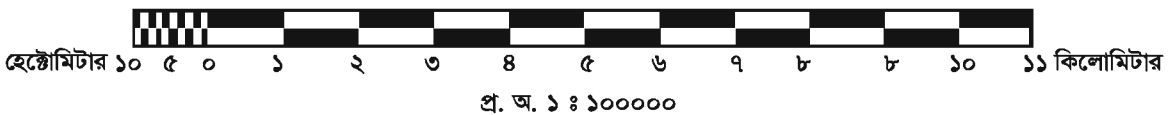
চিত্র ১০০ (খ) : রৈখিক স্কেল

উদাহরণ ৩ : ১ ইঞ্চিতে ৪ মাইল; একটি সরল রৈখিক স্কেল অঙ্কন করতে হবে।

ভূমিতে যখন দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব ৪ মাইল, তখন মানচিত্রের দূরত্ব ১ ইঞ্চি

ভূমিতে যখন দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব ১ মাইল, তখন মানচিত্রের দূরত্ব ১ ÷ ৪ ইঞ্চি

ভূমিতে যখন দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব ২০ মাইল, তখন মানচিত্রের দূরত্ব $\frac{১ \times ২০}{৪} = ৫$ ইঞ্চি

এই হিসাবটি উল্টাভাবেও করা যায়।

মনে করি আমি ৫ ইঞ্চি মাপের একটি স্কেল অঙ্কন করব

১ ইঞ্চি যখন মানচিত্র দূরত্ব, তখন ভূমি দূরত্ব ৪ মাইল

৫ ইঞ্চি যখন মানচিত্র দূরত্ব, তখন ভূমি দূরত্ব ৪ × ৫ = ২০ মাইল

অঙ্কন পদ্ধতি: স্কেলের ভাগগুলোর মান ৫, ১০, ১৫ হিসেবে বা ১০, ২০, ৩০ হিসেবে দেখাতে হয়; ৪, ৮, ১২ হিসেবে বা ৩, ৬, ৯ হিসেবে দেখানো যাবে না। এ জন্য হিসেবের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৫ ইঞ্চি মাপের একটি রেখা নিয়ে একে ৪ ভাগ করা হয়। বাম দিকে একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে ডান দিকে যথাক্রমে ০, ৫, ১০, ১৫ লেখা হল। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতি ভাগ বা বড় ভাগগুলোর ৫ মাইল করে হওয়ায় দ্বিতীয় পর্যায়ে বাম পাশের ঘরটিকে ৫ ভাগে ভাগ করা হল। স্কেলের ডান পাশে ও বাম পাশে মাইল লেখা হল। ১ ইঞ্চিতে ৪ মাইল দেওয়া আছে। ৪ মাইল = ৬৩৩৬০ × ৪ = ২৫৩৪৪০ ইঞ্চি। সুতরাং প্র. অ. ১ ঃ ২৫৩৪৪০। স্কেলে, নিচে মাঝামাঝি স্থানে প্র. অ. ১ ঃ ২৫৩৪৪০ লেখা হল।

ডিভাইডারের সাহায্যে এ স্কেল থেকে সহজেই ৭ মাইল, ১৩ মাইল, ১৯ মাইল প্রভৃতি দূরত্ব পরিমাপ করা যায় (চিত্র ১০০ গ)।
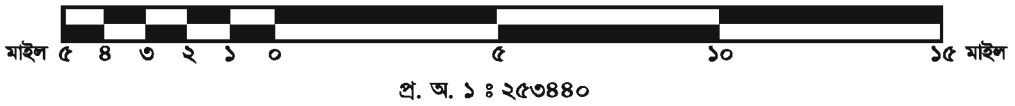
চিত্র ১০০ (গ) : রৈখিক স্কেল

উদাহরণ ৪ : ১ সেন্টিমিটারে ১ হেক্টোমিটার, একটি সরল স্কেল অঙ্কন করতে হবে।

১ সেন্টিমিটারে ১ হেক্টোমিটার; যেহেতু ১ হেক্টোমিটার = ১০০০০ সেন্টিমিটার

সুতরাং ১০ সেন্টিমিটারে ১০ হেক্টোমিটার ∴ প্র. অ. ১ ঃ ১০০০০

অঙ্কন পদ্ধতি: ১০ সেন্টিমিটার দীর্ঘ একটি রেখা অঙ্কন করে প্রথম পর্যায়ে ১০ ভাগ করা হল। বাম পাশে একটি ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য ভাগে যথাক্রমে ০, ১, ২, ৩, ... ৯ লেখা হল। যেহেতু ১ হেক্টোমিটার = ১০ ডেকামিটার, দ্বিতীয় পর্যায়ে সে জন্য বাম পাশের ঘরটিকে ১০ ভাগে ভাগ করা হল। স্কেলের ডান পাশে হেক্টোমিটার এবং বাম পাশে ডেকামিটার লেখা হল। সবশেষে স্কেলের নিচে মাঝামাঝি স্থানে প্র. অ. ১ ঃ ১০০০০ লেখা হল (চিত্র ১০০ ঘ)।
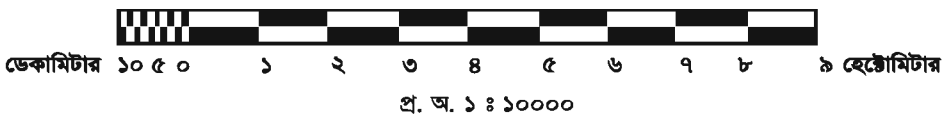
চিত্র ১০০ (ঘ) : রৈখিক স্কেল

উদাহরণ ৫ : ৩ ইঞ্চিতে ১৫ গজ; একটি সরল স্কেল অঙ্কন কর।

৩ ইঞ্চিতে ১৫ গজ

$\therefore$ ১ ইঞ্চিতে $\frac{১৫}{৩}$ = ৫ গজ

আমরা জানি ৩৬ ইঞ্চি = ১ গজ

$\therefore$ ৫ গজ = ৩৬ × ৫ = ১৮০

$\therefore$ প্র. অ. ১ : ১৮০

৫ গজ ভূমি দূরত্ব হলে মানচিত্র দূরত্ব ১ ইঞ্চি

$\therefore$ ১ গজ ভূমি দূরত্ব হলে মানচিত্র দূরত্ব $\frac{১}{৫}$ ইঞ্চি

$\therefore$ ২৫ গজ ভূমি দূরত্ব হলে মানচিত্র দূরত্ব $\frac{১ \times ২৫}{৫}$ = ৫ ইঞ্চি

অঙ্কন পদ্ধতি: ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ একটি রেখা অঙ্কন করা হল। এ রেখাকে ৫ ভাগ করা হলে প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি ঘর ৫ গজ করে হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাম পাশের ঘরটিকে ৫ ভাগ করা হলে প্রতিটি ছোট ভাগ ১ গজ করে হবে (চিত্র ১০০ ঙ)।
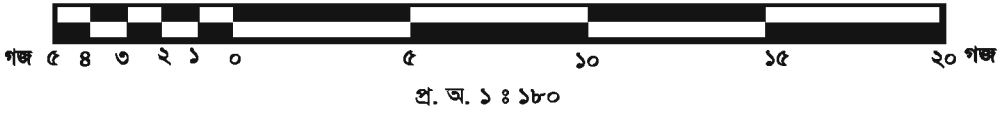
চিত্র ১০০ (ঙ) : রৈখিক স্কেল

স্কেলের ব্যবহার

১। মানচিত্রের দুইটি স্থানের দূরত্ব সঠিকভাবে মাপার জন্য স্কেল ব্যবহার করা হয়।

২। জরিপ কাজের সময় স্কেল ব্যবহার করা হয়।

৩। মানচিত্রের বা নকশার আয়তন নির্ধারণ করার জন্য স্কেল ব্যবহার করা হয়।

৪। মানচিত্রে অঙ্কিত রেলপথ ও রাস্তার দৈর্ঘ্য নির্ণয়ের জন্য স্কেল ব্যবহার করা হয়।

৫। মানচিত্র অঙ্কন ও পঠনের সময় স্কেল ব্যবহার করা হয়।

স্কেল ব্যবহারের সুবিধা

১। স্কেল ব্যবহার করে মানচিত্রের উপরিস্থিত দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব জানা যায়।

২। রৈখিক স্কেল সাধারণ মানুষের বুঝবার জন্য সহজ পদ্ধতি।

৩। রৈখিক স্কেল বিশিষ্ট মানচিত্র ফটোস্ট্যাট মেশিন বা ক্যামেরার সাহায্যে ছোট বা বড় করলে স্কেলটিও আনুপাতিক হারে ছোট বা বড় হয়। এ সুবিধা অন্য কোনো পদ্ধতিতে নেই।

৪। যে কোনো দেশের মানচিত্রে (ভাষা যদি বোঝা না যায়) প্র. অ. দেওয়া থাকলে তা আমরা সহজেই আমাদের দেশে প্রচলিত একক হিসেবে ব্যবহার করতে পারি।

স্কেল ব্যবহারের অসুবিধা

১। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন এককে দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয়। এক দেশের মানচিত্রে দেওয়া স্কেল সকল ক্ষেত্রে অন্য দেশে ব্যবহার করা যায় না।

২। অঙ্কনের ত্রুটির জন্য স্কেল ত্রুটিপূর্ণ হলে ঐ স্কেল ব্যবহারে ভুল ফলাফল পাওয়া যায়।

৩। বিভিন্ন দেশে স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত। এক দেশের ভাষায় লেখা মানচিত্র অন্য দেশের লোক বুঝতে পারে না। ফলে এরূপ মানচিত্রে ব্যবহৃত স্কেলের এককগুলোও অন্য ভাষা ব্যবহারকারীরা বুঝতে পারে না।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

স্কেলঃ মানচিত্রে দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব এবং ভূমিতে ঐ দুইটি স্থানের মধ্যবর্তী প্রকৃত দূরত্বের অনুপাতকে স্কেল বলে। স্কেল প্রধানত পাঁচ প্রকার। যথা- সরল স্কেল, কর্ণীয় স্কেল, তুলনামূলক স্কেল, সময় নির্দেশ স্কেল ও ভার্নিয়ার স্কেল।

মানচিত্রে স্কেল নির্দেশের পদ্ধতিঃ মানচিত্রে তিন প্রকার পদ্ধতিতে স্কেল নির্দেশ করা হয় : (ক) বর্ণনার সাহায্যে, (খ) রেখাচিত্র অঙ্কনের সাহায্যে, (গ) প্রতিভূ অনুপাতের (প্র. অ.) সাহায্যে।

স্কেলের দৈর্ঘ্যঃ খাতায় একটি সরল স্কেল ৪.৫ ইঞ্চি থেকে ৬ ইঞ্চির মধ্যে অঙ্কন করা উচিত।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আনিস তার আপার সঙ্গে স্কুলের লাইব্রেরিতে গিয়ে বাংলাদেশের মানচিত্র দেখে কীভাবে সেটা অঙ্কন করা হল জানতে চাইলে আপা তাকে স্কেলের কথা বললেন। এরপর স্কেলের ব্যবহার গুণাগুণসহ মানচিত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা করলেন।

ক. স্কেল কী?

খ. স্কেল প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা কেন?

গ. প্র. অ. ১ ঃ ৩৬ এর সাহায্যে গজ ও ফুট দেখিয়ে একটি সরল মাপনী অঙ্কন কর।

ঘ. মানচিত্র অঙ্কন ও ছোট বা বড় করার ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয় যুক্তিযুক্ত? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে মতামত দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নকশা অঙ্কন

DRAWING OF SKETCHES

নকশার সংজ্ঞা: ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ প্রভৃতি ছোট আয়তনের স্থানের প্রতিকৃতিকে নকশা বলা হয়। মানচিত্রের মতো নকশা অঙ্কন করার জন্যও স্কেল ব্যবহার করতে হয়। কোনো নির্দিষ্ট স্কেল অনুসারে দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও আয়তন কমিয়ে এনে একটি স্থানের ছোট প্রতিকৃতি অঙ্কন করলে ঐ স্থানের আকার ও অবস্থান সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

বাস্তবে ভূমির ওপর একটি বড় আকারের বিদ্যালয় ও এর আঙিনা অনেক বেশি জায়গা দখল করে। নির্দিষ্ট স্কেলে আঙিনাসহ সে বিদ্যালয়ের প্রতিকৃতি নকশায় আনুপাতিক হারে ছোট করে দেখানো যায়।

নকশা অঙ্কন পদ্ধতি: বিদ্যালয় বা বসতবাড়ির নকশা অঙ্কনের সময় ইঞ্চি ও ফুট অথবা মিটার চিহ্নিত ফিতা ব্যবহার করা হয়। যে স্থানের নকশা অঙ্কন করতে হবে প্রথমে এর একটি খসড়া চিত্র অঙ্কন করা হয়। ফিতার সাহায্যে সে স্থানের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বিভিন্ন কোণ, বিভিন্ন বস্তুর দূরত্ব মেপে ভূমিপুস্তিকা বা কাগজে লিখে রাখতে হয়। পরে ঘরে বসে নির্দিষ্ট স্কেলে ঐ স্থানের প্রতিকৃতি অঙ্কন করতে হয়। কোনো ঘর, বসতবাড়ি, বিদ্যালয় প্রভৃতির নকশা অঙ্কনের সময় জরিপকারক বা আমিনরা সাধারণত ১ ইঞ্চিতে ৮ ফুট বা ১ সেন্টিমিটারে ১০ মিটার স্কেল অনুসরণ করেন। নিচে একটি বিদ্যালয়ের নকশা অঙ্কন পদ্ধতি দেখানো হল (চিত্র ১০১)।
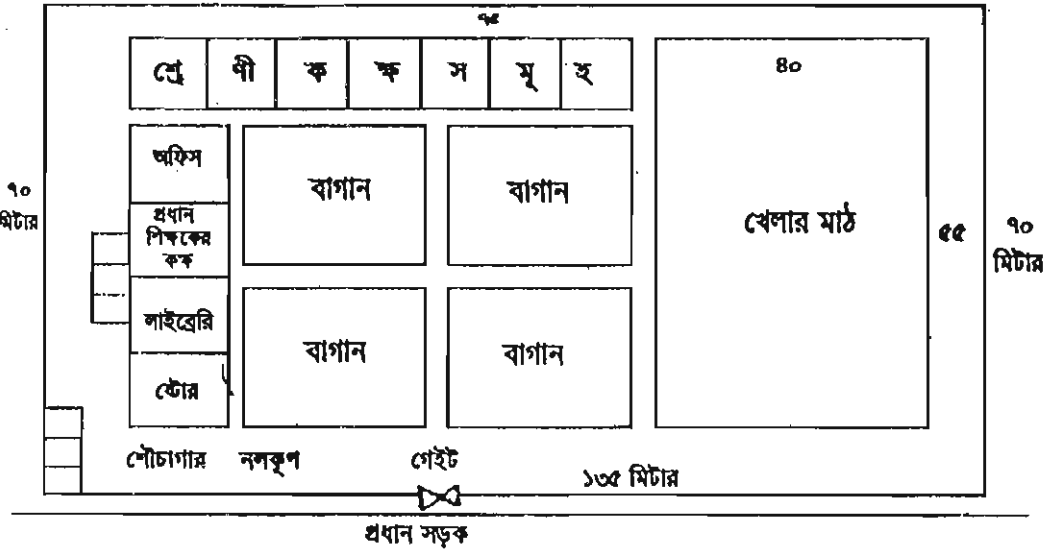
প্র. অ. ১ : ১০০০

চিত্র ১০১ : একটি বিদ্যালয়ের নকশা

বিদ্যালয়ের নকশা: ফিতার সাহায্যে পরিমাপ করে খেলার মাঠ, ফুলের বাগান ও বিদ্যালয় ভবন বেষ্টনকারী প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ১৩৫ মিটার, প্রস্থ ৭০ মিটার পাওয়া গেল। এ প্রাচীরের মধ্যে বিভিন্ন বস্তুর পরিমাপ নিচে দেখানো হল। ১ সেন্টিমিটারে ১০ মিটার স্কেল অনুসারে নকশাটি অঙ্কন করতে হবে। ১০ মিটার = ১০০০ সেন্টিমিটার ∴ প্র. অ. ১ : ১০০০।

বিদ্যালয় প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ১৩৫ মিটার, প্রস্থ ৭০ মিটার : ১৩৫ ÷ ১০ = ১৩.৫ সেন্টিমিটার
বিদ্যালয় ভবনের দৈর্ঘ্য ৭০ মিটার, প্রস্থ ৫৫ মিটার : ৭০ ÷ ১০ = ৭.০ সেন্টিমিটার

বিদ্যালয়ের খেলার মাঠের দৈর্ঘ্য ৫৫ মিটার, প্রস্থ ৪০ মিটার : ৫৫ ÷ ১০ = ৫.৫ সেন্টিমিটার
বিদ্যালয়ের বাগানের দৈর্ঘ্য ৫৫ মিটার, প্রস্থ ৪২ মিটার : ৪২ ÷ ১০ = ৪.২ সেন্টিমিটার
পশ্চিম প্রান্ত থেকে ৪০ মিটার পূর্বে কলেজ গেইট : ৪০ ÷ ১০ = ৪ সেন্টিমিটার

অঙ্কন পদ্ধতি: ১৩.৫ সেন্টিমিটার লম্বা একটি রেখা নিয়ে এর দুই প্রান্ত সমকোণে ৭ সেন্টিমিটার রেখা অঙ্কন করলে বিদ্যালয় প্রাচীর বেষ্টিত জায়গা পাওয়া যাবে। উত্তরে ০.৫ ও পূর্বে ০.৮ সেন্টিমিটার এবং পশ্চিমে ১.২ ও দক্ষিণে ১ সেন্টিমিটার জায়গা ছেড়ে দিয়ে পূর্বের পৃষ্ঠায় বিদ্যালয় ভবন, খেলার মাঠ ও বাগানের নকশা অঙ্কন করা হয়েছে।
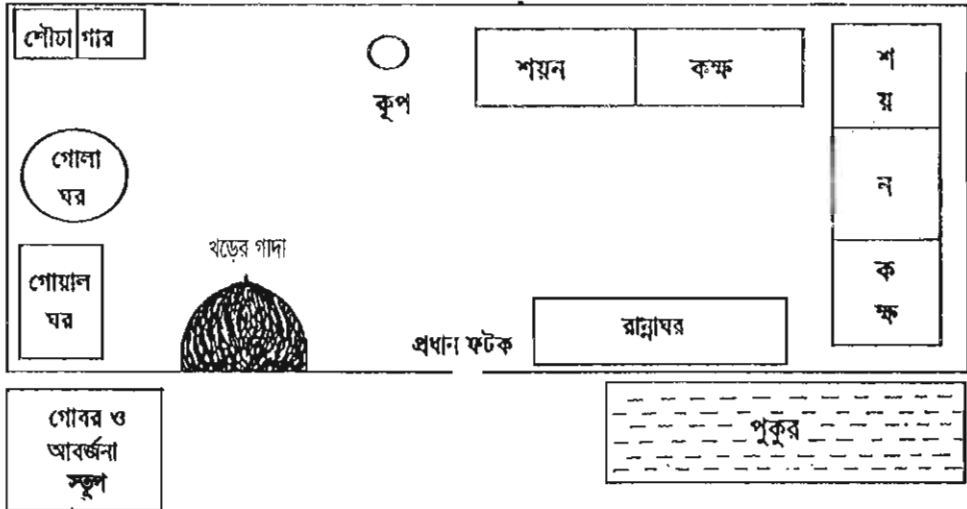
চিত্র ১০২ : একটি আদর্শ বাড়ির নকশা

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

নকশা: ঘরবাড়ি, বিদ্যালয়, খেলার মাঠ প্রভৃতি ছোট আয়তনের স্থানের প্রতিকৃতিকে নকশা বলে।

নকশা অঙ্কন পদ্ধতি: কোনো স্থানের নকশা অঙ্কনের আগে পরিমাপক ফিতার সাহায্যে জায়গাটি মেপে নিতে হবে। একটি খসড়া চিত্রে নকশার রূপরেখা তৈরি করতে হবে। নির্দিষ্ট স্কেল অনুসরণ করে খসড়া নকশার অনুকরণে দিক, কোণ ঠিক রেখে নকশা অঙ্কন করতে হবে। নকশার সঙ্গে উত্তর দিক ও স্কেল দিতে হবে।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিম্নের চিত্রের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
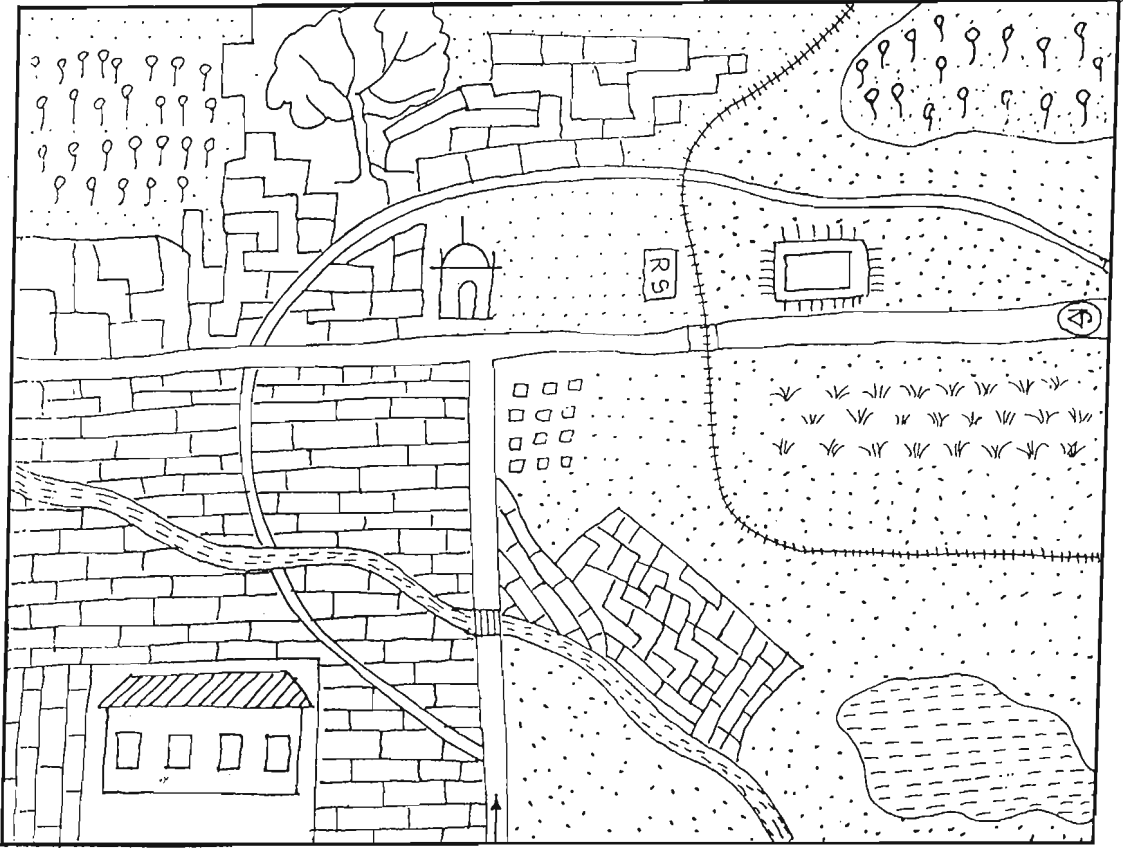
ক. উপরের চিত্রটি কীসের?

খ. নকশার প্রয়োজনীয়তা কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. চিত্রে তীর চিহ্নিত স্থান থেকে রওনা হয়ে তুমি যদি 'ক' চিহ্নিত স্থানে পৌঁছাও তখন কোনমুখী থাকবে এবং চলার পথে কোন বিষয়গুলো তোমার দৃশ্যপটে আসবে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'উপরের চিত্রটি একটি নকশা'। এর স্বপক্ষে মতামত দাও।'

তৃতীয় অধ্যায়

আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন

INTERNATIONAL CONVENTIONAL SIGNS

সাংকেতিক চিহ্নের সংজ্ঞা: নকশা ও মানচিত্রে কোনো স্থানের সীমানা, রাস্তা, রেলপথ, নদী, খাল, কূপ, পুকুর, হ্রদ, জলাভূমি, তৃণভূমি, বনভূমি, মরূদ্যানসহ মরুভূমি, পর্বত, গিরিশৃঙ্গ, ছোট ও বড় শহর, মসজিদ, ঈদগাহ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা, সমাধি, দুর্গ, বাতিঘর, তেলকূপ, যুদ্ধক্ষেত্র প্রভৃতির অবস্থান দেখার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যেসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন বলে। পৃথিবীর সব দেশে মানচিত্রাঙ্কনবিদরা মানচিত্র ও নকশা তৈরির সময় এসব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করেন। বিভিন্ন দেশে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন সম্বন্ধে নিচে ধারণা দেওয়া হল (চিত্র ১০৩ ও ১০৪)।

চিত্র ১০৩ : আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

সাংকেতিক চিহ্ন: যেসব নির্দিষ্ট বিশেষ চিত্র কোনো কিছুর প্রতিকৃতি হিসেবে নকশা ও মানচিত্র তৈরি করার সময় ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে সাংকেতিক চিহ্ন বলে।
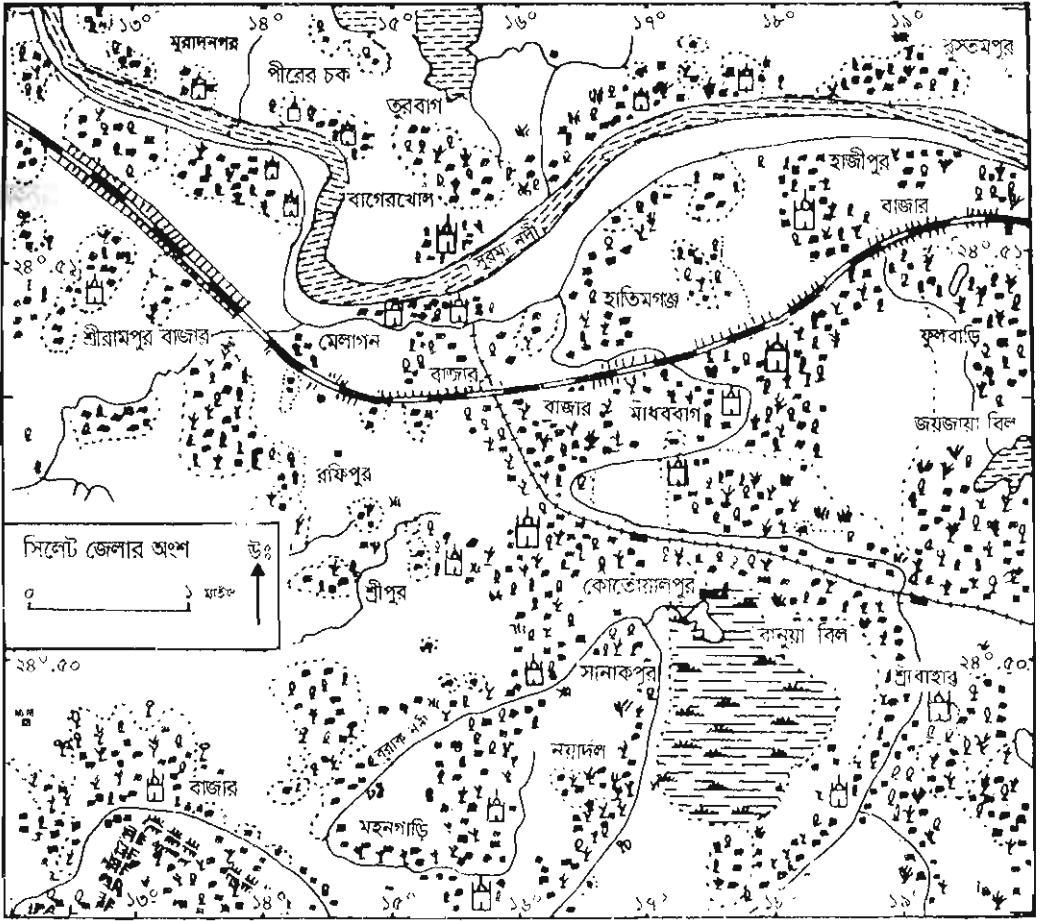
চিত্র ১০৪ : সাংকেতিক চিহ্ন বিশিষ্ট মানচিত্র

আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন: সারা পৃথিবীর মানচিত্রাঙ্কনবিদগণ নকশা ও মানচিত্র অঙ্কনের সময় যেসব বিশেষ প্রতিকৃতি চিত্র ব্যবহার করেন সেগুলোকে আন্তর্জাতিক সাংকেতিক চিহ্ন বলে।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। ঈশী তার বাবার সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে একটি রেলক্রসিং পার হয়। এ রেলক্রসিং পার হওয়ার সময় রাস্তার পাশের সাইনবোর্ডে বিভিন্ন চিহ্ন দেখে সেগুলো কীসের চিহ্ন তা জানতে চায়। উত্তরে তার বাবা তাকে নকশা ও মানচিত্রে বিভিন্ন ভৌগোলিক বিষয় দেখাতে যে সমস্ত প্রতিকৃতি চিত্র অঙ্কন আবশ্যক সেগুলোর কথা বললেন।

ক. সাংকেতিক চিহ্ন কাকে বলে?

খ. মানচিত্রে সাংকেতিক চিহ্ন কেন ব্যবহার করা হয়?

গ. বাংলাদেশের একটি মানচিত্র অঙ্কন কর এবং ঢাকা থেকে চট্টগ্রামের রেলপথ চিহ্নিত করে দেখাও।

ঘ. 'নকশা ও মানচিত্রে বিভিন্ন ভৌগোলিক বিষয় দেখাতে প্রতিকৃতি চিত্র আবশ্যক' ব্যাখ্যা কর।

চতুর্থ অধ্যায়

মানচিত্র পঠন

MAP READING

মানচিত্রের সংজ্ঞাঃ সমগ্র পৃথিবী অথবা এর কোনো অংশের প্রতিকৃতি নির্দিষ্ট স্কেলে, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাসহ সমতল কাগজের ওপর অঙ্কন করা হলে একে মানচিত্র বলে। ভূপৃষ্ঠের কোনো অংশের (মহাদেশ, দেশ, জেলা, থানা, উপজেলা, গ্রাম প্রভৃতি) মানচিত্র অঙ্কন করতে হলে সে এলাকা নিখুঁতভাবে জরিপ করে নিতে হয় অথবা ছোট এলাকা হলে এর আলোকচিত্র গ্রহণ করতে হয়।

মানচিত্রের শ্রেণীবিভাগঃ মানচিত্র অনেক প্রকার হতে পারে। সাধারণত মানচিত্রে ব্যবহৃত স্কেল এবং বিষয়বস্তু অনুসারে মানচিত্রগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। স্কেল অনুসারে মানচিত্র আবার দুই প্রকারের- (ক) বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র এবং (খ) ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র। নৌচলাচল সংক্রান্ত নাবিকদের চার্ট, বিমান চলাচল সংক্রান্ত বৈমানিকদের চার্ট, মৌজা মানচিত্র বা ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র প্রভৃতি বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র। একটি ছোট এলাকা অনেক বড় করে দেখানো হয় বলে মানচিত্রের মধ্যে অনেক জায়গা থাকে এবং অনেক কিছু তথ্য এরূপ মানচিত্রে ভালোভাবে দেখানো যায়। ভূচিত্রাবলীর মানচিত্র, দেওয়াল মানচিত্র প্রভৃতি ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র। সমগ্র পৃথিবী বা মহাদেশ বা দেশের মতো বড় অঞ্চলকে একটি ছোট কাগজে দেখানো হয় বলে এ প্রকার মানচিত্রে বেশি জায়গা থাকে না। ফলে এ মানচিত্রে বেশি কিছু দেখানো যায় না।

উপস্থাপিত বিষয়বস্তু হিসেবেও মানচিত্রগুলো দুই প্রকারের- (ক) গুণগত মানচিত্র এবং (খ) পরিমাণগত মানচিত্র।

(ক) গুণগত মানচিত্রঃ ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র, ভূসংস্থানিক মানচিত্র, ভূমিরূপের মানচিত্র, মৃত্তিকা মানচিত্র, দেওয়াল মানচিত্র, ভূচিত্রাবলীর মানচিত্র, স্থানীয় বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র এবং মৌজা মানচিত্র গুণগত মানচিত্রের অন্তর্গত।

(খ) পরিমাণগত মানচিত্রঃ বায়ুর উত্তাপ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, জনসংখ্যার বণ্টন, জনসংখ্যার ঘনত্ব, খনিজ উৎপাদন, বনজ উৎপাদন, কৃষিজ উৎপাদন, শিল্পজ উৎপাদন প্রভৃতি পরিসংখ্যান তথ্য যেসব মানচিত্রে দেখানো হয় সেগুলো পরিমাণগত মানচিত্রের অন্তর্গত।

মানচিত্র পঠন পদ্ধতিঃ আমরা কেবলমাত্র মানচিত্র দেখি না, মানচিত্র পাঠও করি। একটি মানচিত্রের কোন অংশে কী দেখানো হয়েছে তা বর্ণনা করতে হলে আগে মানচিত্র পাঠ করতে হয়। মানচিত্রের প্রভারভেদ ও প্রকৃতি অনুসারে সেগুলো পাঠ করার পদ্ধতিও স্বতন্ত্র। ভূপ্রাকৃতিক মানচিত্রে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নের সাহায্যে পর্বত, মালভূমি, পাহাড়, উপত্যকা, সমভূমি, নদী, হ্রদ, বদ্বীপ, সাগর, মহাসাগর প্রভৃতির অবস্থান দেখানো হয়। ৫৭ নম্বর চিত্রে এশিয়ার ভূপ্রকৃতি দেখানো হয়েছে। এ মানচিত্র দেখে পামীর গ্রন্থি থেকে কোন দিকে কোন পর্বত বিস্তৃত হয়েছে, কোন দুইটি পর্বতের মধ্যে কোন মালভূমি আছে, এশিয়ার কোন কোন স্থানে সমভূমি আছে প্রভৃতি পাঠ করা যায়। সমোন্নতি রেখার সাহায্যে ভূমি উচ্চতা ও বন্ধুরতা দেখানো হয়। এরূপ মানচিত্র পাঠ করতে হলে আগে সমোন্নতি রেখা কাকে বলে, এ রেখাগুলোর বৈশিষ্ট্য কী, কোথায় খাড়া এবং কোথায় স্বাভাবিক ঢাল রয়েছে প্রভৃতি সম্বন্ধে আগে ধারণা না থাকলে সমোন্নতি রেখা মানচিত্র পাঠ করা যায় না। ৫৪ নম্বর চিত্রে ইউরোপের জলবায়ু বিভাগ দেখানো হয়েছে। এ মানচিত্রের কোন অংশে কোন জলবায়ু বর্তমান তা পাঠ করে বলা যায়। আবহাওয়া মানচিত্র আবার ভিন্ন প্রকৃতির। এরূপ মানচিত্রে বিশেষ সময়ে উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ বিশিষ্ট এলাকা, বায়ুপ্রবাহের দিক, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, আকাশে মেঘাচ্ছন্নতার পরিমাণ, সমুদ্রের অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। মৌজা মানচিত্রে একটি মৌজার প্রতিটি জমির সীমানা নিখুঁতভাবে দেওয়া থাকে, ফলে দাগ নম্বর ধরে একটি জমির সীমানা নির্ধারণ করা যায় এবং সরকারের খাজনা আদায়ের জন্য এ মানচিত্রগুলো ব্যবহার করা হয়। পাশাপাশি অবস্থিত কয়েকটি গ্রাম বা একটি ছোট এলাকাকে বড় করে দেখিয়ে স্থানীয়

বৈচিত্র্যসূচক মানচিত্র তৈরি করা হয়। সাংকেতিক চিহ্নগুলো ব্যবহার করে পাহাড়, মালভূমি সমভূমি, বনভূমি, হ্রদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলি ছাড়াও এরূপ মানচিত্রে রাস্তা, রেলপথ, বিমানবন্দর, বসতি এলাকা, শহর, নগর, খাল, সেতু, খেয়াঘাট প্রভৃতি সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোও দেখানো হয়। এরূপ মানচিত্র পাঠ করতে হলে অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা, স্কেল, বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন প্রভৃতি সম্বন্ধে আগে থেকে ধারণা থাকা উচিত।

১০৫ নম্বর চিত্রে একটি গ্রামের নকশা দেওয়া হয়েছে। এ গ্রামের ওপর দিয়ে নদী, রেলপথ, রাস্তা অতিক্রম করেছে। নকশার বিভিন্ন স্থানে উত্তর পাড়া, দক্ষিণ পাড়া, পশ্চিম পাড়া, মসজিদ, মন্দির, ডাকঘর, বিদ্যালয়, বাজার, শস্যক্ষেত প্রভৃতি রয়েছে। এ নকশাটি পাঠ করতে হলে প্রথমে এর কোন পাশে কোন দিক তা জানতে হবে।
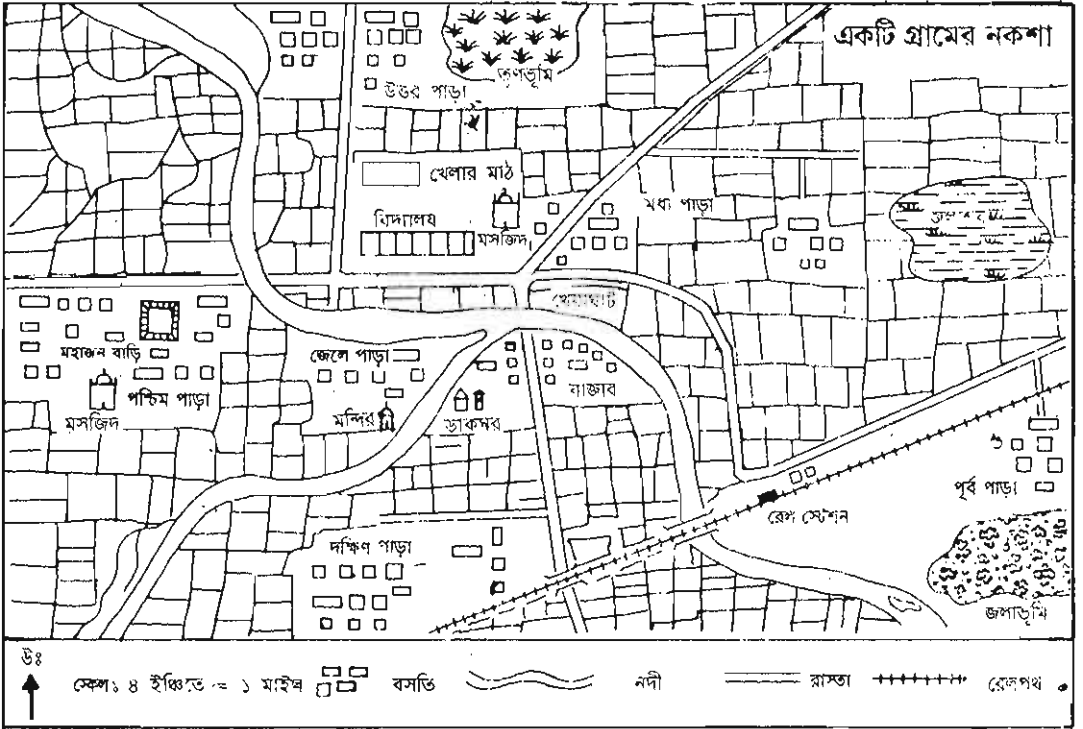
চিত্র ১০৫ : একটি গ্রামের নকশা

মানচিত্রের ওপর অংশ উত্তর, নিচের অংশ দক্ষিণ, পাঠকের ডান দিকের অংশ পূর্ব এবং বাম দিকের অংশ পশ্চিম। এরপর নকশার স্কেল বলতে হবে। পরে যথাক্রমে ভূপ্রকৃতি, স্বাভাবিক ঢাল, জলাশয়, নদী, রাস্তা, রেলপথ, খেয়াপথ, সেতু, বসতি, বাজার, ডাকঘর এর অবস্থান সম্বন্ধে পাঠ করতে হবে। পাঠকৃত বিষয়গুলো বিভিন্ন শিরোনামে লিখিত আকারে দেওয়া ভালো। ১০৫ নম্বর চিত্রে নকশাটি পাঠের পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হল।

প্রান্তিক তথ্য: নকশাটি ৪ ইঞ্চিতে ১ মাইল স্কেলে অঙ্কন করা হয়েছে। নকশায় কোনো অক্ষরেখা বা দ্রাঘিমারেখা থাকে না। এ চিত্রেও কোনো অক্ষরেখা, দ্রাঘিমারেখা দেখানো হয় নি (চিত্র ১০৫)।

ভূপ্রকৃতি: এ গ্রামে কোনো পাহাড় বা উঁচুভূমি নেই। পূর্ব প্রান্তে মাঝামাঝি জায়গায় একটি জলাশয় এবং দক্ষিণ-পূর্বে একটি জলাভূমি রয়েছে। ভূমির স্বাভাবিক ঢাল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে।

নিষ্কাশন ব্যবস্থা: গ্রামের মধ্য দিয়ে প্রধান নদীটি উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সর্পিল গতিতে প্রবাহিত হয়েছে। গ্রামের উত্তর-পশ্চিম অংশে একটি ছোট নদী উত্তর দিক থেকে এসে প্রধান নদীর সঙ্গে মিশেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে আর একটি অপেক্ষাকৃত বড় নদী এসে প্রধান নদীর সঙ্গে মিশেছে। প্রধান নদীতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে, ফলে এর প্রভাব অন্য নদীগুলোর ওপরও পড়ে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা: পশ্চিম দিক থেকে একটি কাঁচা রাস্তা এসে নদী অতিক্রম করেছে। পূর্ব-পশ্চিম এ রাস্তার নদীর তীরবর্তী কিছু অংশ পাকা পরে আবার কাঁচা রাস্তায় পরিণত হয়েছে। উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আরও দুইটি কাঁচা রাস্তা এসে পাকা রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। দক্ষিণের রেল স্টেশন থেকে একটি কাঁচা রাস্তা এসে নদীর পাশে শেষ হয়েছে। গ্রামের দক্ষিণ অংশে রেলপথটি উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে গেছে। নিত্যবহ প্রধান নদীতে স্টিমার চলাচল করে। অন্যান্য নদীপথে নৌকার সাহায্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। রেলপথ ও রাস্তা সেতুর ওপর দিয়ে নদী অতিক্রম করেছে। গ্রামটির যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত।

বসতি: উত্তর পাড়া, দক্ষিণ পাড়া, পূর্ব পাড়া, মধ্য পাড়া, পশ্চিম পাড়া ও জেলে পাড়া নামে ছয়টি বিক্ষিপ্ত বসতি এ এলাকায় রয়েছে। পশ্চিম পাড়ায় বিদ্যালয়ের পাশে একটি মসজিদ এবং জেলে পাড়ায় একটি মন্দির রয়েছে। একমাত্র পশ্চিম পাড়ায় ঘরের সংখ্যা বেশি। ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য একটি বিদ্যালয় গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে। নদীর ধারের বাজারটি অধিবাসীদের বেচাকেনার একমাত্র কেন্দ্র। এ গ্রামে একটি ডাকঘর আছে। গ্রামের উত্তর অংশের তৃণভূমিটি কৃষকদের পালিত গরু ও ছাগলের চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

কৃষিভূমি: গ্রামের শতকরা ৮০ ভাগ জমি চাষাবাদে নিয়োজিত। উত্তরাধিকার সূত্রে ভাগ হতে হতে জমিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত রয়ছে। শুষ্ক ঋতুতে নদী ও জলাশয় থেকে জমিতে পানিসেচ করা সম্ভব হয়। কৃষিকাজ অধিবাসীদের প্রধান উপজীবীকা।

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

মানচিত্রের সংজ্ঞা: সারা পৃথিবী অথবা এর কোনো অংশের প্রতিকৃতি নির্দিষ্ট স্কেলে, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার সাহায্যে সমতল কাগজের ওপর অঙ্কন করা হলে একে মানচিত্র বলে।

মানচিত্রের শ্রেণীবিভাগ: ব্যবহৃত স্কেল ও বিষয়বস্তু অনুসারে মানচিত্রগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়। স্কেল অনুসারে মানচিত্র আবার (ক) বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র এবং (খ) ক্ষুদ্র স্কলের মানচিত্র নামক দুই ভাগে বিভক্ত। উপস্থাপিত বিষয়বস্তু হিসেবে মানচিত্রগুলো (ক) গুণগত মানচিত্র এবং (খ) পরিমাণগত মানচিত্র নামে দুই ভাগে বিভক্ত।

মানচিত্র পাঠ: বিভিন্ন প্রকার মানচিত্র পাঠের পদ্ধতি ও কলাকৌশল আলাদা। প্রাকৃতিক মানচিত্রে সমোন্নতি রেখা বা বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। আবহাওয়া মানচিত্রে সমচাপ রেখার বিন্যাস স্বতন্ত্র, মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাত, সমুদ্রের অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রকার মানচিত্র স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে পাঠ করে এর বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। আশা মানচিত্র সম্পর্কে ভূগোলের শিক্ষক ফরিদ সাহেবকে প্রশ্ন করলে তিনি একটি চিত্র দেখিয়ে বলেন যে এটি মানচিত্র। এরপরে মানচিত্রের প্রকারভেদ, অঙ্কন পদ্ধতি এবং নকশার সঙ্গে এর পার্থক্যের বিবরণ দিলেন। আশা এতে উৎসাহিত হল এবং নিজে মানচিত্র অঙ্কন করতে শিখল।

ক. মানচিত্র কাকে বলে?

খ. গুণগত মানচিত্রের ব্যাখ্যা দাও।

গ. ১ ইঞ্চিতে ১০০ কিলোমিটার ধরে বাংলাদেশের একটি মানচিত্র অঙ্কন কর।

ঘ. তোমার নিজ এলাকার একটি নকশা মানচিত্র অঙ্কন করে এর পঠন বিবরণী বিশ্লেষণ কর।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন

DRAWING OF BANGLADESH MAP

বর্গ পদ্ধতিতে মানচিত্র অঙ্কন অনুশীলন করা সহজ এবং শিক্ষার্থীরা এ পদ্ধতি অতি দ্রুত ও সহজে আয়ত্ত করতে সমর্থ হবে। বাংলাদেশের মানচিত্র পূর্ব-পশ্চিম প্রস্থের চেয়ে উত্তর-দক্ষিণ দৈর্ঘ্য, ১.৪ গুণ বড় হওয়ায় কয়েকটি সমান আকৃতির বর্গ অঙ্কনের সময় অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখাগুলো ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলে মানচিত্র অঙ্কন অনুশীলনের পাশাপাশি বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য নগর, শহর, বন্দর, পাহাড়শ্রেণী, নদী, হাওর প্রভৃতির সঠিক অবস্থান সম্বন্ধে শিক্ষার্থীর মনে সঠিক ধারণা জন্মাবে।

অঙ্কন কৌশল: আমাদের দেশটি মোটামুটি ২০° উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৭° উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯৩° পূর্ব দ্রাঘিমারেখার মধ্যে অবস্থিত। ফলে ২০° থেকে ২৭° অক্ষরেখা পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে ৭টি এবং ৮৮° থেকে ৯৩° পূর্ব দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত পূর্ব-পশ্চিমে ৫টি বর্গক্ষেত্র হিসেবে মোট ৩৫টি বর্গক্ষেত্র পাশাপাশি অঙ্কন করতে হবে। পাশের কোনো বর্গক্ষেত্র ছোট আকারে অঙ্কন করলে সীমারেখা মানচিত্র অঙ্কনে ভুল হতে পারে। ১০৬ নম্বর চিত্রে উলম্ব রেখা ৫.৬ ইঞ্চি নিয়ে ৭ ভাগ এবং অনুভূমিক রেখা ৪.০ ইঞ্চি নিয়ে ৫ ভাগ করতে হবে। এরপর একটি আদর্শ মানচিত্রের অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার কোন পাশ দিয়ে কতটুকু দূর দিয়ে সীমারেখা গেছে তা দেখে এ ছকে মানচিত্র অঙ্কন করতে হবে (চিত্র ১০৬)।

২৭° উঃ
২৬°
২৫°
২৪°
২৩°
২২°
২১°
২০°

৮৮° পূঃ ৮৯° ৯০° ৯১° ৯২° ৯৩°

চিত্র ১০৬ : বাংলাদেশের সীমারেখা মানচিত্রের জন্য ছক তৈরি

প্রকৃতপক্ষে, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমা-রেখাগুলো সমব্যবধানে অবস্থিত না হলে ১০৭ নম্বর চিত্রে শিক্ষার্থীদের প্রথম অনুশীলনের সুবিধার জন্য এগুলো সমব্যবধানে অঙ্কন করতে হয়েছে। ছকবর্গের প্রত্যেকটির অনুভূমিক বাহু ১ ইঞ্চি এবং উলম্ব বাহু ১ ইঞ্চি হিসেবে নিয়ে ১০৭ নম্বর চিত্রে প্রথমে উত্তর-দক্ষিণে ৭টি এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৫টি হিসেবে মোট

৩৫টি বর্গক্ষেত্র পাশাপাশি অঙ্কন করা হয়েছে। কাগজের ওপর অঙ্কিত বর্গগুলোর ডান দিকের রেখার নিচে থেকে ওপরে (দক্ষিণ থেকে উত্তরে) যথাক্রমে ২০°, ২১°, ২২°, ২৩°, ২৪°, ২৫°, ২৬°, ২৭° এবং নিচের রেখার পাশে বাম থেকে ডানে (পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে) যথাক্রমে ৮৮°, ৮৯°, ৯০°, ৯১°, ৯২°, ৯৩° লেখা হয়েছে।

এরপর বাংলাদেশের কোনো আদর্শ মানচিত্রের প্রতি লক্ষ করতে হবে। এ মানচিত্রের সীমারেখা কোন অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখার কোন পাশে কত দূর দিয়ে কীভাবে এঁকেবেঁকে গেছে তা ভালোভাবে লক্ষ করে ঠিক একইভাবে এ ছক বর্গগুলোর প্রত্যেকটির পাশে সীমারেখা টানা হয়েছে। ১০৭ নম্বর মানচিত্রে এ সীমারেখা মানচিত্র দেখে শিক্ষার্থীরা বাড়িতে একইভাবে অনুশীলন করলে ৪ বা ৫ বারের প্রচেষ্টার পর নিজেরাই মানচিত্র না দেখে ছকবর্গের ওপর বাংলাদেশের সীমারেখা মানচিত্র অঙ্কন করতে সমর্থ হবে। ছকবর্গের বাহুর মাপ যত বড় বা ছোট করে নেওয়া হবে অঙ্কিত মানচিত্রটিও সে পরিমাণে বড় বা ছোট হবে (চিত্র ১০৭)।
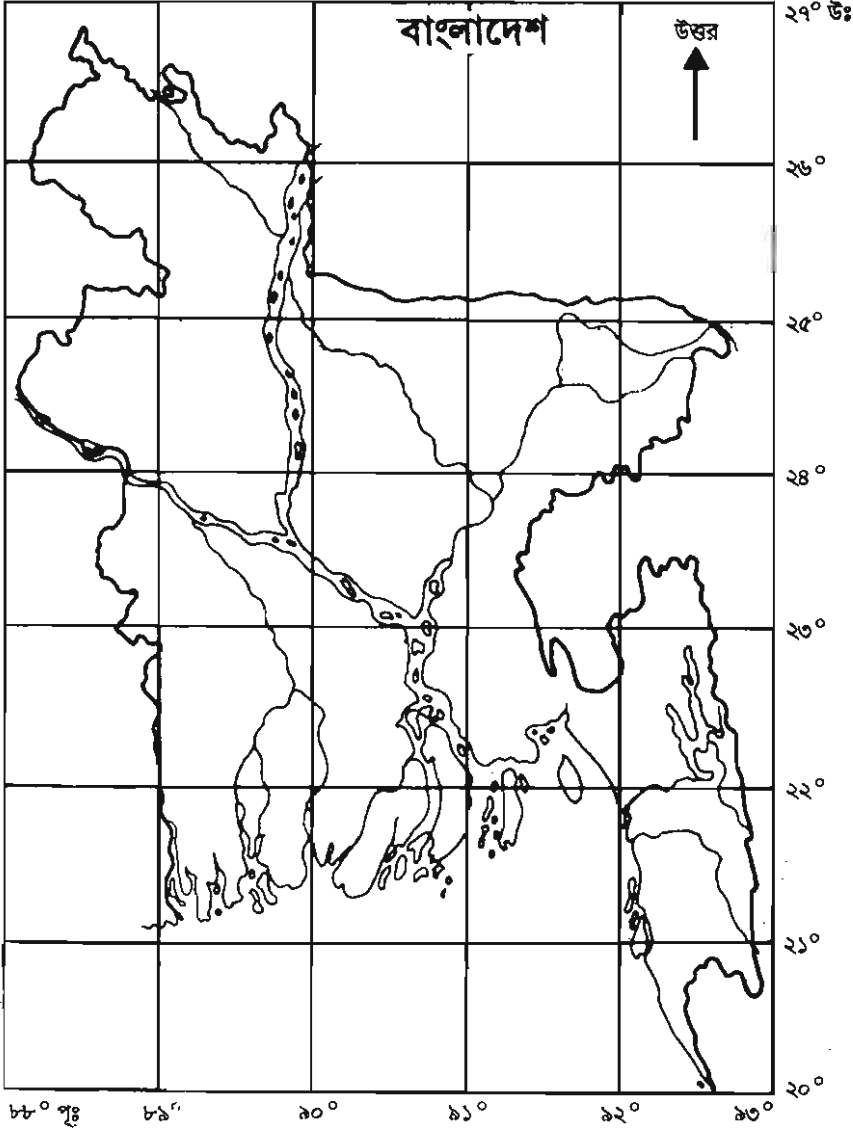
চিত্র ১০৭ : বাংলাদেশের সীমারেখা মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতি

নমুনা ১ : বাংলাদেশের একটি সীমারেখা মানচিত্র ছক পদ্ধতিতে অঙ্কন করে এর ওপর প্রধান নদীগুলো এবং প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলো দেখানো হল (চিত্র ১০৮ ক)।
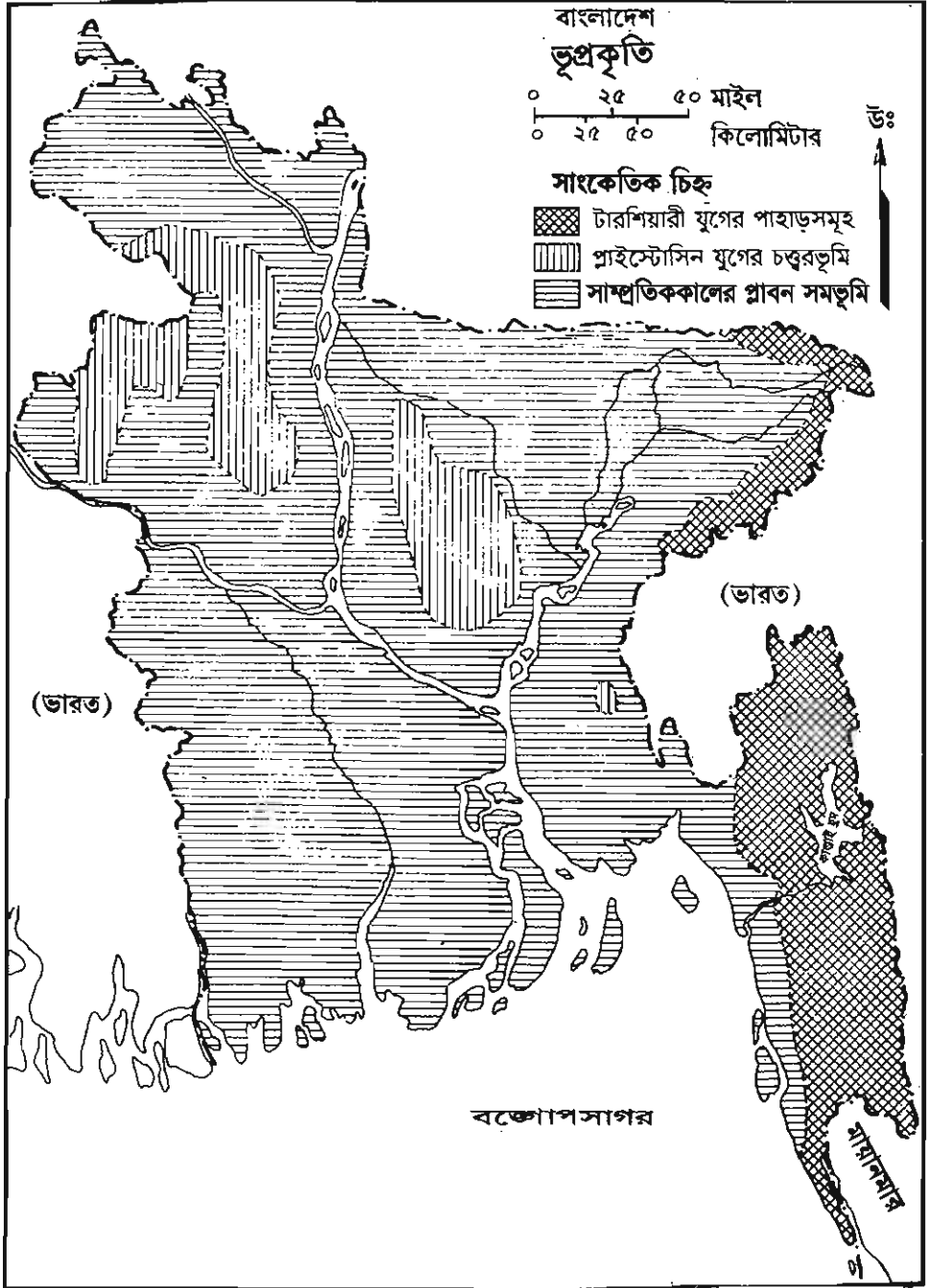
চিত্র ১০৮ (ক) : বাংলাদেশের মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতি

নমুনা ২ : বাংলাদেশের একটি সীমারেখা মানচিত্র অঙ্কন করে এর ওপর জেলা সীমানা, রাজধানী ঢাকাসহ প্রধান নগর, নদীবন্দর ও সমুদ্রবন্দরদ্বয় দেখানো হল (চিত্র ১০৮ খ)।

চিত্র ১০৮ (খ) : বাংলাদেশের মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতি

নমুনা ৩ : বাংলাদেশের একটি সীমারেখা মানচিত্র অঙ্কন করে এর ওপর বাংলাদেশ রেলপথের প্রধান ব্রডগেজ ও মিটারগেজ পথগুলো ও এর শাখা পথগুলো দেখানো হল (চিত্র ১০৮ গ)।
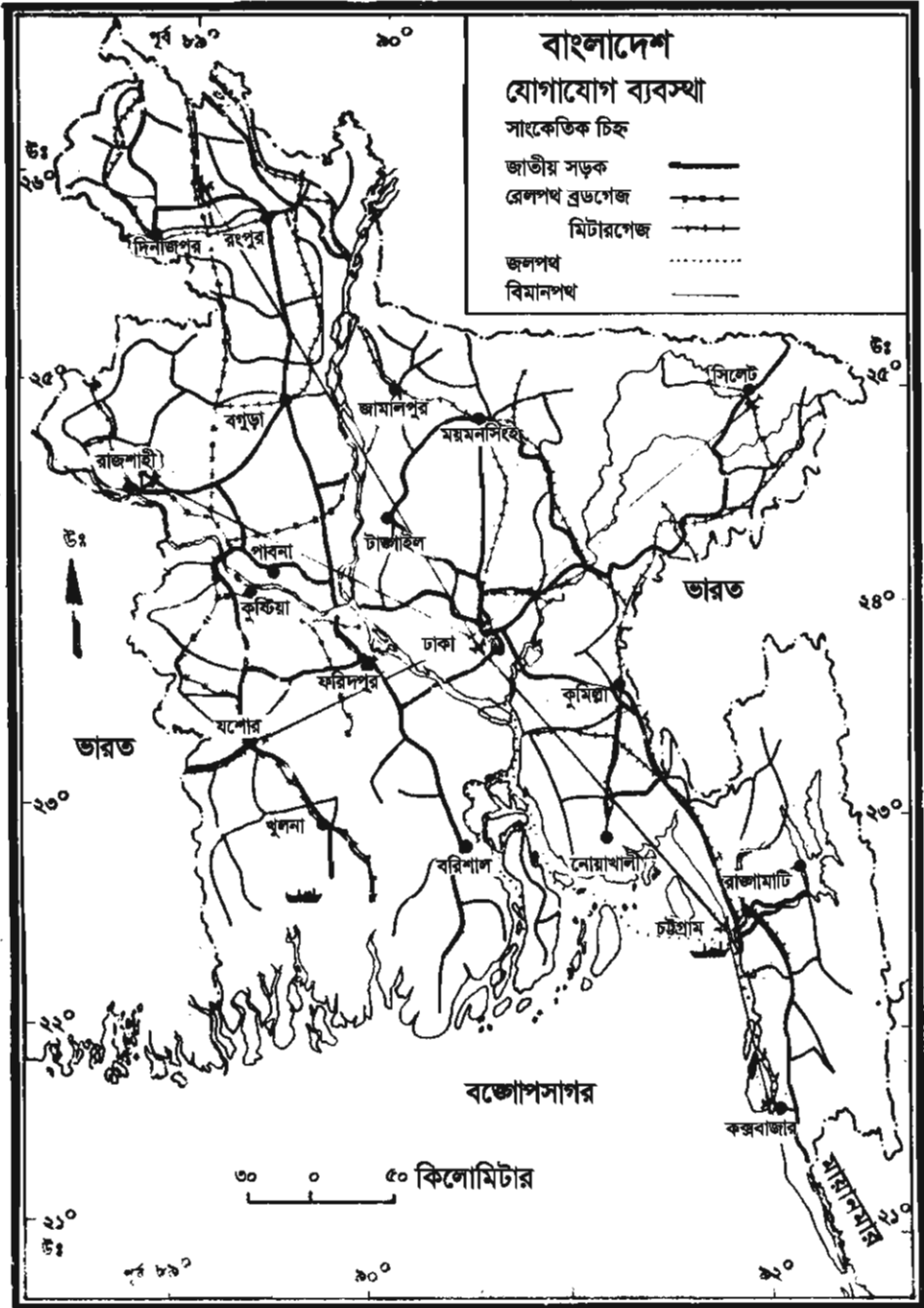
চিত্র ১০৮ (গ) : বাংলাদেশের মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতি

নমুনা ৪ : বাংলাদেশের একটি সীমারেখা মানচিত্র অঙ্কন করে এর ওপর দেশের বনভূমিগুলোর অবস্থান দেখানো হল (চিত্র ১০৮ ঘ)।
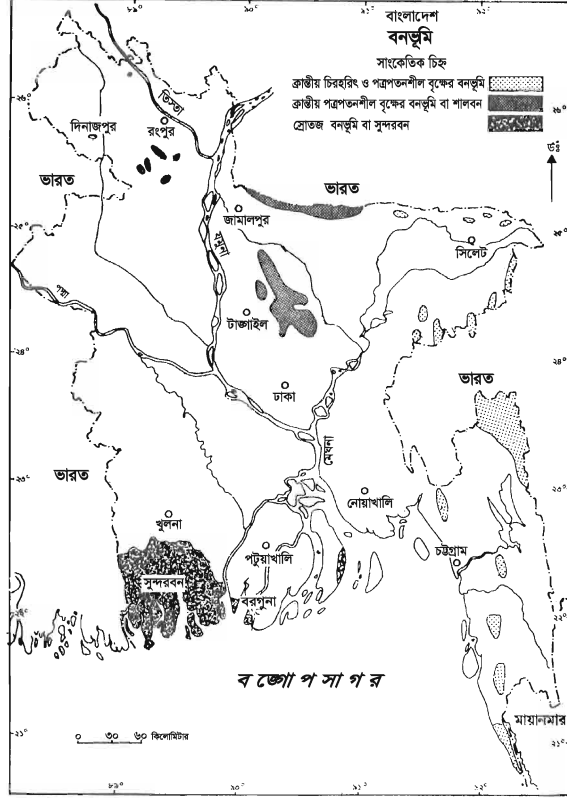
চিত্র ১০৮ (ঘ) : বাংলাদেশের মানচিত্রাঙ্কন পদ্ধতি

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

বর্গ পদ্ধতিতে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কনের সময় একটি আদর্শ মানচিত্র সামনে রাখতে হয়। আদর্শ মানচিত্রের কোন কোন বর্গের কোন অংশ দিয়ে দেশের সীমারেখা অতিক্রম করেছে তা দেখে নতুন আঁকা ছকের সেই বর্গগুলোর নির্দিষ্ট জায়গা দিয়ে রেখা অঙ্কন করলে সীমারেখা মানচিত্র পাওয়া যাবে। বর্গের আকৃতি ছোট বা বড় করলে মানচিত্রের আকৃতি ছোট বা বড় হবে।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিম্নের মানচিত্রের আলোকে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
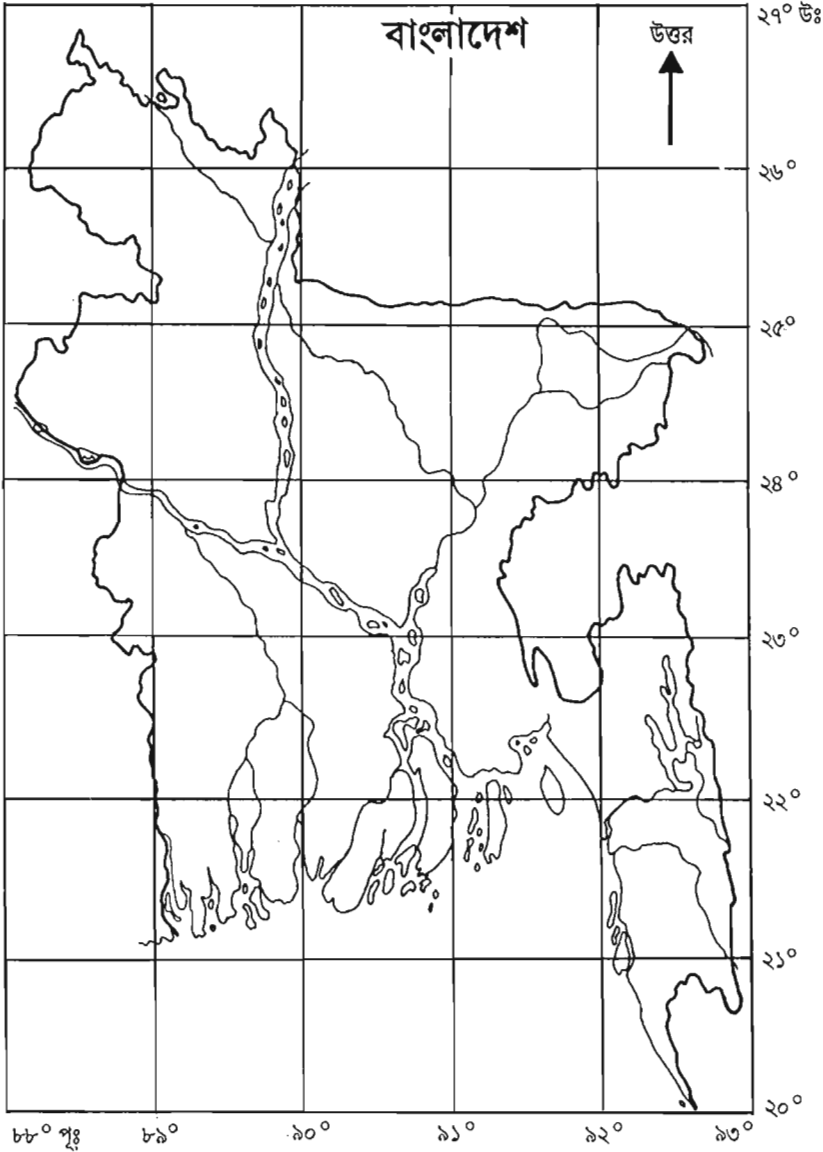
ক. কোন পদ্ধতিতে মানচিত্রটি অঙ্কন করা হয়েছে?

খ. কেন ছক পদ্ধতিতে মানচিত্র অঙ্কন করা হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. এ মানচিত্রটি দেড়গুণ সম্প্রসারণ করে পুনঃঅঙ্কন কর।

ঘ. 'মানচিত্র অঙ্কনে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা প্রয়োজন' ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপাত্তের চিত্ররূপদান

REPRESENTAION OF DATA

সংজ্ঞা: উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, কৃষি বা শিল্প উৎপাদন প্রভৃতি সম্বন্ধে সংখ্যার আকারে যে তথ্য পাওয়া যায় তাকে উপাত্ত বলে। প্রাপ্ত উপাত্তকে বিশেষ কৌশলে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে উপাত্তের চিত্ররূপদান বলে। বৃষ্টিপাত, তুষারপাত, উত্তাপ, বায়ুচাপ প্রভৃতি জলবায়ু সংক্রান্ত উপাত্ত এবং দেশের বা কোনো অঞ্চলের আয়তন, জনসংখ্যা, কৃষি উৎপাদনে নিয়োজিত জমির পরিমাণ, উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ, দেশের আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ অথবা আমদানিকৃত দ্রব্যের জন্য অর্থ ব্যয়, পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে আয়ের পরিমাণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক উপাত্ত। পরিসংখ্যানের আকারে প্রাপ্ত সব ধরনের উপাত্তকে ভৌগোলিক উপাত্ত বলে।

ব্যবহার: দেশের জনসাধারণকে জানানোর জন্য, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপণের জন্য, ঘরের বা অফিস ঘরের শোভা বর্ধনের জন্য বিভিন্ন উপাত্তভিত্তিক চিত্র প্রকাশ্যে টাঙিয়ে রাখা হয়। বিভিন্ন লেখচিত্রের মাধ্যমে উপাত্ত উপস্থাপন কৌশল শিক্ষার্থীদের জানা প্রয়োজন। প্রায় ক্ষেত্রে সাদা কাগজের ওপর লেখচিত্রের মাধ্যমে উপাত্ত পরিবেশন করা হলেও অনেক সময় মানচিত্রের ওপর উপাত্ত পরিবেশন করতে হয়। সমতাপ রেখা, সমচাপ রেখা, স্তম্ভলেখ, বৃত্তলেখ, চক্রলেখ, বিন্দু, ছায়াপাত প্রভৃতি চিত্রের মাধ্যমে সচরাচর উপাত্ত পরিবেশন করা হয়। উপাত্ত উপস্থাপনের কয়েকটি সহজ পদ্ধতি সম্বন্ধে নিচে বর্ণনা করা হল।

১। স্তম্ভ লেখচিত্র: শিক্ষার্থীদের চিত্রলেখ অঙ্কন অনুশীলনের জন্য প্রথম প্রথম ছক কাগজ বা গ্রাফ কাগজ ব্যবহার করা উত্তম। বেশ কয়েকটি নমুনা অনুশীলনের পর সাদা কাগজে স্কেল ও পেনসিলের সাহায্যে লেখচিত্র অঙ্কন করা সহজ হয়। অনেক সময় স্তম্ভ চিত্রকে দণ্ডচিত্রও বলা হয়। কোনো স্তম্ভলেখ উলম্বভাবে অঙ্কন করা হলে একে স্তম্ভ বা কলাম চিত্র এবং অনুভূমিকভাবে অঙ্কন করলে একে সারিচিত্র বলে।

নমুনা ১ : নিচের সারণিতে বাংলাদেশে বিভিন্ন সালে ধান উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। স্তম্ভ লেখচিত্র পদ্ধতিতে এ উপাত্ত উপস্থাপন করতে হবে (চিত্র ১০৯)।

সারণি ১৫ : বাংলাদেশে ধান উৎপাদন

সাল	উৎপাদন (হাজার টন হিসেবে)	সাল	উৎপাদন (হাজার টন হিসেবে)
১৯৮৭-৮৮	১৫,৪১৩	১৯৯০-৯১	১৭,৮৫২
১৯৮৮-৮৯	১৫,৫৪৪	১৯৯১-৯২	১৮,২৫১
১৯৮৯-৯০	১৭,৮৫৬	১৯৯২-৯৩	১৮,৩৪০

১ ইঞ্চিতে ৫,০০০ টন স্কেল ধরা হল :

১৫,৪১৩ ÷ ৫,০০০ = ৩.০৮ ইঞ্চি

১৫,৫৪৪ ÷ ৫,০০০ = ৩.১১ ইঞ্চি

১৭,৮৫৬ ÷ ৫,০০০ = ৩.৫৭ ইঞ্চি

১৭,৮৫২ ÷ ৫,০০০ = ৩.৫৭ ইঞ্চি

১৮,২৫১ ÷ ৫,০০০ = ৩.৬৫ ইঞ্চি

১৮,৩৪০ ÷ ৫,০০০ = ৩.৬৭ ইঞ্চি
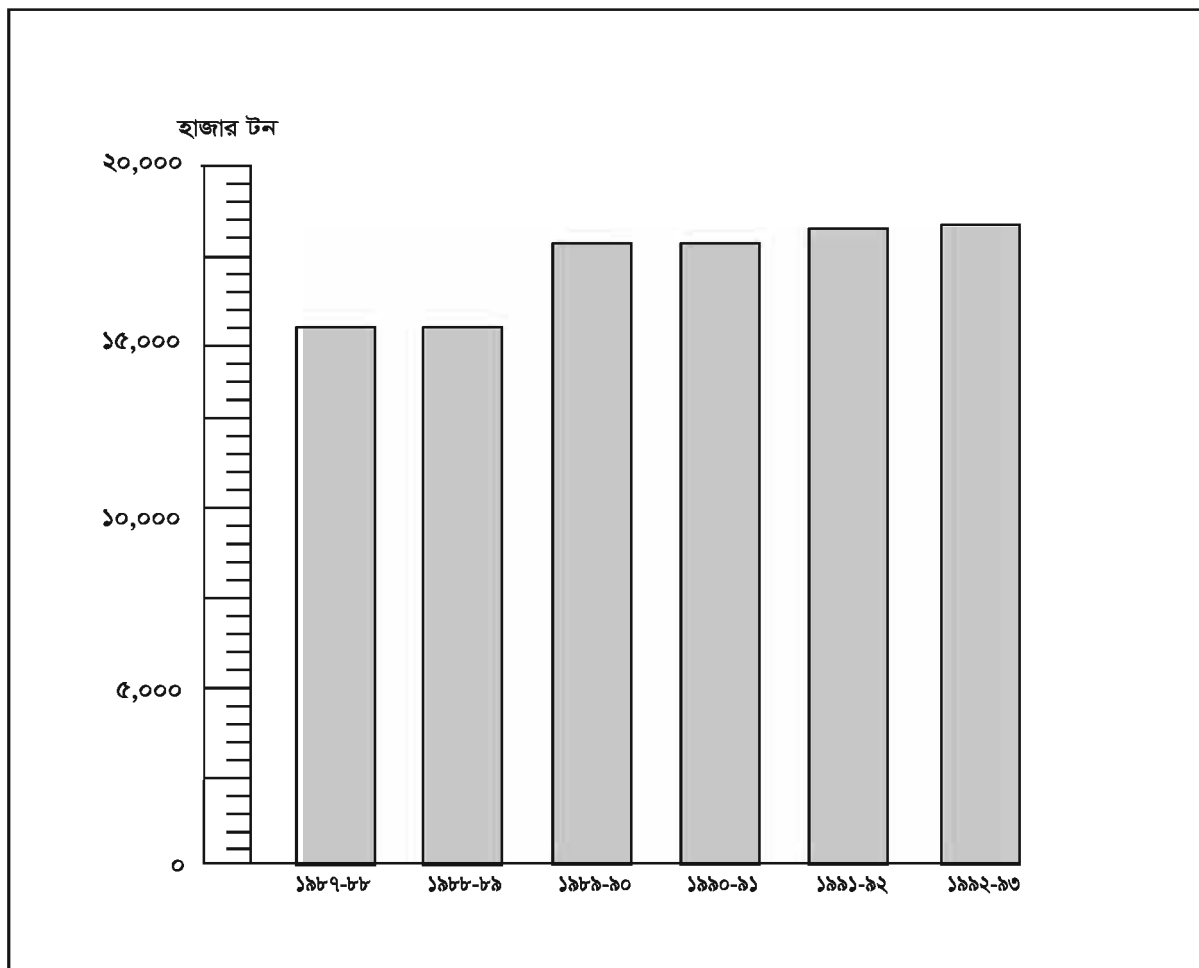
চিত্র ১০৯ : বাংলাদেশের ধান উৎপন্ন

নমুনা ২ : বাংলাদেশের ছয়টি জেলার আয়তন ও জনসংখ্যা (১৯৯১) নিচের সারণিতে দেওয়া হয়েছে। জোড় স্তম্ভ লেখচিত্রের মাধ্যমে উপাত্ত উপস্থাপন করতে হবে (চিত্র ১০৮)।

সারণি ১৬ : বাংলাদেশের ছয়টি জেলার আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনা

জেলার নাম	আয়তন (বর্গ কিলোমিটার)	স্কেল অনুসারে দৈর্ঘ্য (ইঞ্চিতে)	জনসংখ্যা (১৯৯১)	স্কেল অনুসারে দৈর্ঘ্য (ইঞ্চিতে)
ভোলা	৩,৪০০	৩.৪০	১৪,৭৬,৩২৮	০.৯৮
চাঁদপুর	১,৭০৪	১.৭০	২০,৩২,৪৪৯	১.৩৫
ঢাকা	১,৪৬৪	১.৪৬	৩৮,৩৯,৬৪২	৩.৮৯
সিলেট	৩,৪৯০	৩.৪৯	২১,৫৩,৩০১	১.৪৪
যশোর	২,৫৬৭	২.৫৭	২১,০৬,৯৯৬	১.৪০
লালমনিরহাট	১,২৪২	১.২৪	৯,৫৩,৪৬০	০.৬৩

আয়তনের জন্য ১ ইঞ্চিতে ১,০০০ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যার জন্য ১ ইঞ্চিতে ১৫,০০,০০০ জন লোক ধরা হয়েছে।

আয়তন	জনসংখ্যা
৩,৪০০ ÷ ১,০০০ = ৩.৪০ ইঞ্চি	১৪,৭৬,৩২৮ ÷ ১৫,০০,০০০ = ০.৯৮ ইঞ্চি
১,৭০০ ÷ ১,০০০ = ১.৭০ ইঞ্চি	২০,৩২,৪৪৯ ÷ ১৫,০০,০০০ = ১.৩৫ ইঞ্চি
১,৪৬৪ ÷ ১,০০০ = ১.৪৬ ইঞ্চি	৩৮,৩৯,৬৪২ ÷ ১৫,০০,০০০ = ৩.৮৯ ইঞ্চি
৩,৪৯০ ÷ ১,০০০ = ৩.৪৯ ইঞ্চি	২১,৫৩,৩০১ ÷ ১৫,০০,০০০ = ১.৪৪ ইঞ্চি
২,৫৬৭ ÷ ১,০০০ = ২.৫৭ ইঞ্চি	২১,০৬,৯৯৬ ÷ ১৫,০০,০০০ = ১.৪০ ইঞ্চি
১,২৪২ ÷ ১,০০০ = ১.২৪ ইঞ্চি	৯,৫৩,৪৬০ ÷ ১৫,০০,০০০ = ০.৬৩ ইঞ্চি
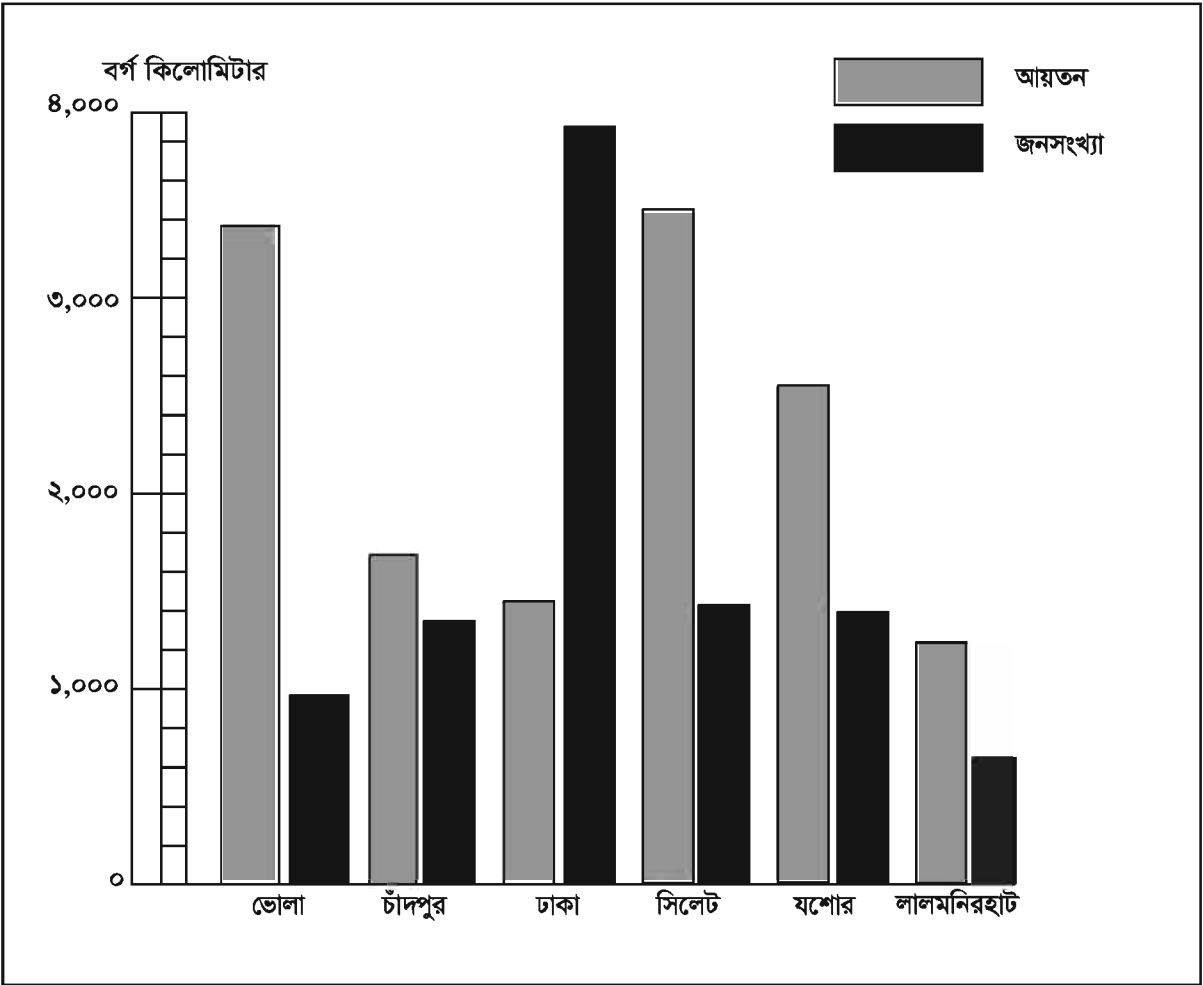
চিত্র ১১০ : স্তম্ভলেখে আয়তন ও জনসংখ্যার তুলনা

রৈখিক লেখচিত্র: পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট উপাত্তগুলোকে চিত্ররূপদান করার জন্য রৈখিকলেখ ব্যবহার করা হয়। রোগীর শরীরের উত্তাপ, বাতাসের উত্তাপ, বায়ুর চাপ, বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, কোনো দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানি রপ্তানির পরিমাণ, বীমা কোম্পানির উন্নতির ধারা, কোনো ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক লাভ লোকসানের পরিমাণ প্রভৃতি দেখানোর জন্য রৈখিক লেখচিত্র ব্যবহার করা হয়। ১১২নম্বর চিত্রে বগুড়া শহরের উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের লেখচিত্র দেখানো হয়েছে।

নমুনা ১ : নিচের সারণিতে বাংলাদেশে বিগত ৫ বছরে বস্ত্রকলগুলোর সুতা ও কাপড় উৎপাদনের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। রৈখিক লেখচিত্রের মাধ্যমে এ তথ্য পরিবেশন করতে হবে (চিত্র ১১১)।

সারণি ১৭ : বাংলাদেশের বস্ত্রকলগুলোর উৎপাদন

সাল	সুতা উৎপাদন (লক্ষ কেজি)	কাপড় উৎপাদন (লক্ষ মিটার)
১৯৮৯-৯০	৪২৮	৫১৯
১৯৯০-৯১	৪২৫	৪৭৪
১৯৯১-৯২	৪২১	৪৭৮
১৯৯২-৯৩	৪৪০	৩৩৮
১৯৯৩-৯৪	৪৩০	৩২০
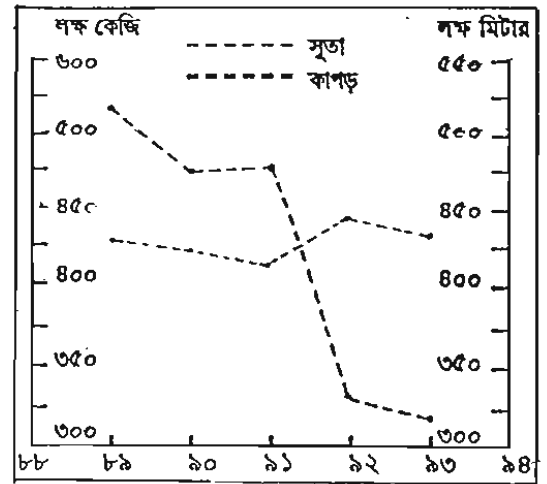
চিত্র ১১১ : সুতা ও কাপড় উৎপাদনের লেখচিত্র

পর্যবেক্ষণ	একক	জা.	ফে.	মা.	এ.	মে.	জু.	জু.	আ.	সে.	অ.	ন.	ডি.
উত্তাপ	সে.	১৭.৭২	১৯.৭৮	২৪.৮৯	২৮.৬১	২৮.৫০	২৮.৬১	২৮.৭৮	২৮.৭২	২৮.৬১	২৬.৮৯	২২.৫৬	১৮.৬৭
বৃষ্টিপাত	সে.মি.	১.২৬	২.৩০	২.৯০	১০.২১	২১.২৪	৩৩.৯৪	৩২.৬৪	৩৩.০২	২৮.৭০	১৩.০৬	১.৯৬	০.২৫

নমুনা ২ : বগুড়া শহরের উত্তাপ (সেলসিয়াস) এবং বৃষ্টিপাত (সেন্টিমিটার) লেখচিত্রে দেখানোর জন্য এখানে ১ ইঞ্চিতে ১০° সেলসিয়াস উত্তাপ এবং ১ ইঞ্চিতে ১০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত ধরে নেওয়া হয়েছে। অনুভূমিক রেখায় ১২ মাসের নাম এবং উলম্ব রেখার বাম দিকে উত্তাপ এবং ডান দিকে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখানো হয়েছে (চিত্র ১১২)।
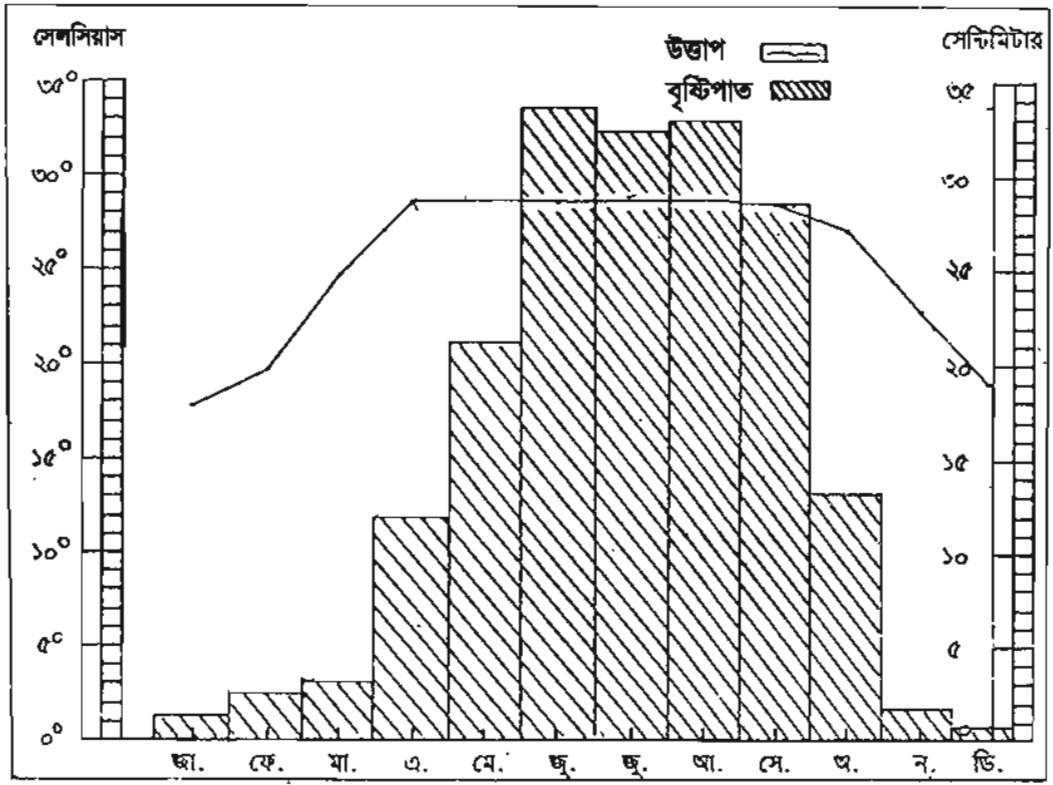
চিত্র ১২ : বগুড়া শহরের উত্তাপ ও বৃষ্টিপাতের লেখচিত্র

এ অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম :

উপাত্তঃ উত্তাপ, বৃষ্টিপাত, কৃষি উৎপাদন, শিল্প উৎপাদন প্রভৃতি সম্বন্ধে সংখ্যার আকারে যে তথ্য পাওয়া যায় তাকে উপাত্ত বলে।

উপাত্তের চিত্ররূপদানঃ প্রাপ্ত উপাত্তকে বিশেষ কৌশলে চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করাকে উপাত্তের চিত্ররূপদান বলে। উপাত্তের চিত্ররূপদানের সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি স্তম্ভলেখ ও রৈখিকলেখ।

স্তম্ভলেখঃ প্রাপ্ত উপাত্তকে বিভিন্ন স্তম্ভের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে তাকে স্তম্ভলেখ বলে। ফসল উৎপাদন, শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন প্রভৃতি এ পদ্ধতিতে দেখানো হয়। এ চিত্র অঙ্কন সহজ এবং যে কোনো লোক তা সহজে বুঝতে পারে।

রৈখিকলেখঃ রেখার মাধ্যমে যে উপাত্ত চিত্রায়িত করা হয় তাকে রৈখিকলেখ বলে। পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট উপাত্ত চিত্ররূপদান করার জন্য রৈখিকলেখ ব্যবহার করা হয়। রোগীর শরীরের উত্তাপ, বাতাসের উত্তাপ, বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ, বৈদেশিক বাণিজ্যের আমদানি রপ্তানির পরিমাণ, বীমা কোম্পানির উন্নয়নের ধারা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক লাভ লোকসানের পরিমাণ প্রভৃতি দেখানোর জন্য এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এই চিত্র অঙ্কন ও বোঝা সহজ।

অনুশীলনী

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। সাতক্ষীরা শহরের গত বছরের মাসিক তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত নিম্নে দেখানো হল।

পর্যবেক্ষণ	জানু	ফেব্রু	মার্চ	এপ্রিল	মে	জুন	জুলাই	আগস্ট	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর	ডিসেম্বর
উত্তাপ (সেন্টিগ্রেড)	১৫	২০	২৫	৩১	৩৩	৩৪	৩৩	৩১	৩২	২৮	২৩	১৮
বৃষ্টিপাত (সেন্টিমিটার)	১.৫	২.৫	৫	১২	২২	৩৫	৩৩	৩৪	২৯	২২	১২	২

ক. বৃষ্টিপাত দেখাতে তুমি কী ধরনের লেখচিত্র অঙ্কন করবে?

খ. কী কী উপায়ে লেখচিত্র অঙ্কন করা যায় ব্যাখ্যা কর।

গ. প্রদত্ত সারণির তথ্য উপাত্ত ব্যবহার করে তাপমাত্রার জন্য একটি লেখচিত্র অঙ্কন কর।

ঘ. স্তম্ভলেখ ও রৈখিকলেখের সঙ্গে তুলনামূলক সম্পর্কের ব্যাখ্যা দাও।